নূর মোহাম্মদ

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা



বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা | নূর মোহাম্মদ

ISBN 984-70000-0276-1

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা

নূর মোহাম্মদ

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

উৎসর্গ

বদরুদ্দীন উমর

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা

নূর মোহাম্মদ

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট রুম # ৫৫, কনকর্ড এ্যাম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু। বর্ণবিন্যাস : মেঘদূত, কনকর্ড এ্যাম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। মুদ্রণে : মহব্বত প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

মূল্য : ৩৭৫.০০ টাকা।

BONGIO MUSSALMAN SAMAJ OUPONIBESHIK SHIKSHABABOSTHA O SHAMPRODAIKOTA by Nur Mohammad. Published by : Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, Basement Room # 55, Concord Emporium Shopping Complex, 253-254 Elephant Road, Kantabon, Dhaka-1205. Cover design : Charu Pintu. First Published : February 2015.

Price: Tk. 375.00 US $ 15.00

ISBN 984-70000-0276-1

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৯
ভূমিকা	১৩
আবুল হুসেন : তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা	২১
ইতিহাসের দর্শন	৬৯
সিভিল সোসাইটি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি বিকাশ ও আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে	১২৫
ইতিহাসের আলোকে 'সিভিল সোসাইটি' এবং এর এনজিও ভাষ্য প্রসঙ্গে	১৪৩
বাঙালী মুসলমান – শ্রেণীসমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতা	১৭৭

মুখবন্ধ

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশের প্রধান কমলকান্তি দাস-এর আগ্রহে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ নিয়ে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হলো। তাঁর পরিকল্পনা ছাড়া সংকলনটি তৈরি ও প্রকাশিত হতো না। 'ইতিহাসের আলোকে 'সিভিল সোসাইটি' এবং এর এনজিও ভাষ্য প্রসঙ্গে' শ্রদ্ধাভাজন বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত *সংস্কৃতি*-তে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। ২০০৭ সালে প্রবন্ধটিকে হালনাগাদ করে পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়। সিভিল সোসাইটির সঙ্গে বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের ক্রমাগত বেশি বেশি প্রকল্প ভিত্তিক যৌথ কার্যক্রমের তথ্য সন্নিবেশিত করি। এই অধ্যায়ের নামকরণ করা হলো, 'সিভিল সোসাইটি, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে'। অনুবাদে ড. সলিমুল্লাহ খান বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। 'আবুল হুসেন : তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বেনজিন খান সম্পাদিত *'বুদ্ধির মুক্তি শিখা ও আবুল হুসেন'* নামে সম্পাদনা গ্রন্থে—২০০৬ সালে। লেখাটি হাতে পেয়ে স্নেহভাজন বেনজিন খান দ্রুতই আমাকে ফোন করে বলে, 'এ আপনি কি করেছেন—আবুল হুসেন ও আব্দুল ওদুদকে তো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' সে খুব বিস্মিত ও বিব্রত হয়েছে। বললাম—লেখাটি বাদ দিয়ে দাও। তুমি তো জান আমি লেখক নই; কয়েকটি প্রবন্ধ কয়েক জনের চাপে লিখেছি ঠিকই কিন্তু আর নয়! যা হোক, বেনজিন খান লেখাটি পুরো ছাপিয়ে দিল। বেনজিন খানের প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল। কেননা দশকের পর দশক ধরে যে ধারায় 'শিখাগোষ্ঠী' সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছিল ও প্রথাগত আলোচনা পদ্ধতির যে একটা পরিধি নির্মিত হয়েছিল আমি তার বাইরে বিষয়টাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। উমর ভাই মূল তাৎপর্য ঠিকই ধরছেন এবং ভূমিকাতে তার উল্লেখ আছে।

'ইতিহাসের দর্শন' লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা *হালখাতা*-তে। স্নেহভাজন সম্পাদক শওকত হোসেন লেখাটি যেন বেশি বড় না হয় এ ব্যাপারে একাধিকবার হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেও লেখাটি ২৮ পৃষ্ঠা হয়ে গেল। ২০০৯ সালে অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত।

এর দু'বছর পর মহসিন শস্ত্রপাণি সম্পাদিত *কাগমারী সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ*-তে 'পলাশী যুদ্ধের কারণ : ইতিহাসের পুনরপাঠ' নামের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থটির ওপর আলোচনা হয়। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ওই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু আমি তখন ঢাকার বাইরে, কিছুদিন পর ওনার কাছ থেকে একটি ফোন পেলাম; বললেন, পলাশীর ওপর লেখাটি *নতুন দিগন্তে* ছাপাবেন এবং

আমার অন্যান্য লেখা ওনাকে পাঠাতে বললেন। *নতুন দিগন্তে* পলাশীর ওপর লেখাটি শুধু যে ছাপানো হলো তাই নয়—শেষ পর্যন্ত তা একটি বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমার যাবতীয় অত্যাচারকে সানন্দে প্রশ্রয় দিয়েছেন—উৎসাহ দিয়েছেন এবং বইটিতে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

উনি 'ইতিহাসের দর্শন' লেখাটি বড় হওয়া সত্ত্বেও আরো ঘষেমেঝে দিতে বললেন। আগে ছিল ২৮ পৃষ্ঠা—হয়ে গেল ৫০ পৃষ্ঠা। 'ইতিহাসের দর্শন' নতুন কলেবরে *নতুন দিগন্তে* প্রকাশিত হলো এপ্রিল-জুন, ২০১৩ সংখ্যায়।

পলাশীর যুদ্ধ ইতিহাসের পুনর্পাঠ বইটির প্রকাশক কমল কান্তি দাস। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আশাতীত যত্ন নিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রবন্ধ লেখার ব্যাপার ড. সলিমুল্লাহ খান ও জিয়াউর রহমানের কৌশলী চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে আনন্দের সঙ্গে বিব্রতবোধ করেছি। সলিমুল্লাহ খান তামাশা করতেন : গল্প বলা শুরু করলে তো হবে না, কোথায় থামতে হবে সেটাও জানতে হবে। খুবই ন্যায্য কথা। সত্যি সত্যিই আমি তাঁর সম্পাদনায় ছোট ছোট কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। তিনি সবগুলো লেখাই প্রকাশ করেন।

আমি লেখক নই—নিয়মিত লেখা চালিয়ে যাবো তা প্রায় ভাবতেই পারি না। ফলে নিজস্ব ভাষাশৈলী নির্মাণ বা লেখার মান নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। এই প্রশ্নে আমার ওপর শওকত হোসেন খুবই বিরক্ত—নিয়মিত বকাবকি করে এবং লেখাও আদায় করে ছাড়ে।

২০১৪ সালের মে মাসে বর্তমান পর্বের *সংস্কৃতি* প্রকাশনা আবার শুরু হয়। সম্ভবত মার্চ-এপ্রিলে উমর ভাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। আমি দেখা করি। তিনি বললেন, তাঁর আশা যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন অন্তত ততদিন যেন *সংস্কৃতি* নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। আমাকে লেখাসহ আরো কিছু দায়িত্বপালনের কথা বলেন। আমি পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করি। নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় দুই কিস্তিতে আমার প্রবন্ধ 'বাঙালী মুসলমান—শ্রেণী সমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতা' প্রকাশিত হয়। তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হলেও পরিসরের কারণে যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় নি।

এই প্রবন্ধ সংকলনে একটা ভূমিকা দরকার ছিল বলে মনে হলো। উমর ভাইকে বললাম। তাঁর সানন্দ সম্মতির জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ। তিনি অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে প্রতিটি লেখাই মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। প্রতিটা লেখার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। মনে করি, উমর ভাইয়ের এই ভূমিকা প্রবন্ধ সংকলনটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে—উমর ভাই যে বিতর্কের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এবং আহ্বান করেছেন অন্যেরা যেন প্রয়োজনে অংশ গ্রহণ করেধ—যদি সত্যিই এই আহ্বানে সাড়া পাওয়া যায় তা হলে উমর ভাইয়ের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিশ্রম কিছুটা স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। ১৯৯১ সাল থেকে উমর ভাইয়ের তাগিদে *সংস্কৃতি* পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ লেখা শুরু করি।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। অনুবাদ নিয়ে আমি শঙ্কিত থাকি। 'ইতিহাসের দর্শন' ইংরেজি উদ্ধৃতিতে ভারাক্রান্ত। অনুবাদ করেছেন *প্রতি বুদ্ধিজীবী* পত্রিকার সম্পাদক সাদাত উল্লাহ খান; তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে কম্পিউটার কর্তার অধীনে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করেই অনাকাঙ্ক্ষিত গভীর খাদে পুরো প্রক্রিয়াটি পড়ে যায়। সেখান থেকে ফিরোজ আহসান ও মিজানুর রহমান সরকার দিনের পর দিন কঠিন পরিশ্রম করে প্রক্রিয়াটিকে সচল করে তোলে এবং সংকলনটি প্রকাশ করার মূল ভূমিকা পালন করে। এরা দু'জন আমার এতোটাই ঘনিষ্ঠ এবং আমি তাদের দু'জনের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, ধন্যবাদ দিলেও অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে।

নূর মোহাম্মদ

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ভূমিকা

নূর মোহাম্মদ রচিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য, কিন্তু এগুলির মধ্যে আবার একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্রও আছে। কোন বইয়ের ভূমিকা তার ওপর বিস্তারিত আলোচনার জায়গা নয়। এই হিসেবে সে ধরনের কোন আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করে বইটির গুরুত্ব নির্দেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

প্রথমেই বলা দরকার যে, ঊনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিদ্যাচর্চার দিক দিয়ে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার বিষয়টি সামনে আনার জন্য লেখক ঢাকা কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের ওপর আলোচনা করেছেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, ব্রিটিশ আমলে এসব ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল সেটা শুধু বাঙলা নয়, সারা ভারতের ইতিহাসের দিক নির্ণয় করেছিল। আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও তাঁদের দ্বারা এই সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকা হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা এবং সেই সমাজের ওপর তলার লোকদের চিন্তাগত দারিদ্র্য ও কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল এবং সেটা সমগ্র মুসলমান সমাজকে যে সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল সে বিষয়ে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ক্ষুদ্র আকারে হলেও অবদান রেখেছিল। তাঁদের আগেও বিচ্ছিন্নভাবে ঊনিশ ও বিশ শতকে এ ধরনের চেষ্টা যে হয় নি এমন নয়। কিন্তু সংগঠিতভাবে ও সুস্পষ্ট কর্মসূচী হিসেবে এ ধরনের উদ্যোগ বাঙলায় ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

'আবুল হুসেন : তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটিতে নূর মোহাম্মদ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা' পত্রিকার প্রধান পুরুষ আবুল হোসেনের রচনা ও মতামতকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চৎপদতাকেই যে আবুল হোসেন তাদের দুরবস্থার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এটা নূর মোহাম্মদ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের দুরবস্থা প্রসঙ্গে তিনি যে শুধু মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অবস্থাই বর্ণনা করেছেন এমন নয়। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাংলার বলশী' তে তিনি কৃষকদের অবস্থা বিষয়ে যা বলেছেন সেটা থেকে মনে হয়, মুসলমান সমাজ বলতে তিনি শুধু মধ্যবিত্ত সমাজকেই বোঝান নি। তিনি দেশবাসীকে

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন : কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধনী। কৃষককে প্রকৃত উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করে জমিদারদেরকে তিনি একেবারেই অনুৎপাদক শ্রেণী হিসেবে দেখেছিলেন। তাদেরকেই দায়ী করেছিলেন কৃষকের দুর্দশার জন্য। কিন্তু সেই সাথে এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জমিদারদের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "জমিদাররা কর্তব্যচ্যুত হয়েছে– তাদের উৎপাদক হতে হবে, বিলাস-ভোগ-তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে।" কৃষকদের প্রতি তাঁর দরদ ও তাদের দুর্দশা লাঘব এবং অবসানের জন্য তাঁর চিন্তা থাকলেও সেটা কিভাবে সম্ভব এ ব্যাপারে তাঁর যে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না এটা এর থেকে বোঝা যায়। কিন্তু সমাজ বলতে যে কৃষকরাও তার অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়টি তিনি যেভাবে সামনে এনেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান বাঙালীর পশ্চাৎপদতা ও দুর্দশার জন্য প্রধানতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতার বিষয়টি তিনি সামনে এনেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে আটকে থাকাই যে মুসলমানদের অনগ্রসরতা এবং অধঃপতনের জন্য দায়ী একথা বলে হিন্দুরা যে পথে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে সেই পথই যে মুসলমানদের শুধু বুদ্ধির মুক্তির পথ নয়, সার্বিক মুক্তির জন্য অপরিহার্য, এ বিষয়ের ওপর তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিক দিয়ে তাঁরা রামমোহন রায়কে পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন। এটা এখানে বলা দরকার যে, হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ এবং মুসলমানরা তা বর্জন করা ঊনিশ শতকে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এবং দুর্দশার মূল কারণ হলেও বিশ শতকের তৃতীয় দশকে রামমোহন প্রদর্শিত পথ কোন অনুসরণযোগ্য পথ ছিল না। এসব কথা মুসলমান সমাজে কেউ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দশক বা তার পরেও বললে ও সেই অনুযায়ী পথ চললে মুসলমানরা হিন্দুদের মতই শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। কিন্তু যে সময়ে আবুল হোসেনরা শিক্ষা সম্পর্কিত এ কথাগুলি বলছেন তখন মুসলমানরা আর ঊনিশ শতকের অবস্থায় নেই। তাঁরা অনেকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে আগের থেকে এগিয়ে এসেছেন এবং হিন্দুদের সাথে সর্বক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তাই মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার ব্যাখ্যা হিসেবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জনকে মূল কারণ বলে চিহ্নিত করা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক হলেও, বিশ শতকের তিরিশের দশকে সেটা নিয়ে মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেওয়া অথবা তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার কিছু ছিল না। তাছাড়া শুধু ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করাই নয়, ইংরেজ শাসনকে হিন্দুরা যেভাবে আবাহন করে তাকে সমর্থন করেছিলেন তাকেও তাঁরা মনে করেছিলেন অনুসরণযোগ্য! এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নূর মোহাম্মদ সঠিকভাবে তার সমালোচনা করেছেন। কিভাবে আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদের মত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিরা নিজেদের যুগ পরিস্থিতির হিসাব না করে এবং ঊনিশ শতকে মুসলমানরা কেন ইংরেজের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর বাস্তব

দিকগুলির দিকে না তাকিয়ে ও তাকে উপেক্ষা করে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার ওপর আলোচনা করেছেন সেটাও ভাবলে অবাক লাগে।

ইংরেজ আমলে মুসলমানরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন হিন্দুরা সেভাবে হন নি। মোগল আমলে এবং তার পর বাঙলায় সিরাজউদ্দৌলার সময় পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকরাই রাজকার্য ও সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকতেন, যদিও এ দুই ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল। জমিদারদের মধ্যে হিন্দুদের ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্য। বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব বৃহৎ জমিদার। তাঁরা সে জমিদারী পেয়েছিলেন আকবরের থেকে। আলীবর্দ্দী সিরাজউদ্দৌলার সময় বাঙলায় ১৯ জন বড় জমিদারের মধ্যে ১৮ জন ছিলেন হিন্দু। জগৎ শেঠদের মত মহাজনরা ছিলেন তৎকালীন ভারতের সব থেকে বড় ব্যাংকার। তাঁদের মহাজনী ব্যবসা সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল। অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানা, কৃষির সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা এবং মহাজনী কারবার ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া। এদিক দিয়ে দেখা মুসলমান শাসনের অবসানে এবং ইংরেজদের শাসনে রাজকার্য ও সেনাবাহিনীর উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া হিন্দুদের অন্য কোন ক্ষতি হয় নি। মুসলমানদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল মারাত্মক সংকটজনক। রাজকার্য ও সেনাবাহিনীর চাকরী থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণেই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা ও ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানরা বর্জন করেছিলেন। এই বর্জন পরবর্তী সময়ে তাঁদের পশ্চাৎপদতার কারণ বটে, তবে এর জন্য মুসলমানদের সমালোচনা তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই করা দরকার। দেশের স্বাধীনতা যেভাবে বিলুপ্ত হয়ে ইংরেজের বিদেশী শাসন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুসলমানদের জন্য এক অন্ধকার ভবিষ্যতের সূচনা।

অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হিন্দুদের জন্য কি ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে ইংরেজ শাসনের সূচনাকে তিনি বলেছেন : 'এ দেশের ইতিহাসে এক 'গৌরবময় সকাল'। ২৩ শে জুন ১৯৫৭, ভারতে মধ্য যুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের শুরু'। আসলে ২৩ শে জুন তিনি দেশে স্বাধীনতার অবসান দেখেন নি। কারণ মুসলমান শাসকরাও ছিল ইংরেজদের মতই বিদেশী এবং তাদের শাসনেও হিন্দুদের কোন স্বাধীনতা থাকে নি। ইংরেজ শাসকরা এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাঁদেরকে এটাই বুঝিয়েছিল। তাকেই শিরোধার্য করে তাঁরা দেশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে অনেক বিখ্যাত ও সুযোগ্য হিন্দু ঐতিহাসিক এই মতের বিরোধিতা করলেও যদুনাথ সরকারের মত ঐতিহাসিকরা ইংরেজ আমলে ভারতীয়দের ইতিহাস রচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। জেমস মিল ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ যুগে বিভক্ত করে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বপন করেছিলেন সে বীজই পত্রপল্লবে বিকশিত হয়েছিল।

মুসলমানরা ভারতে বিদেশী ছিল এবং মুসলমান শাসন বিদেশী শাসন ছিল এটা এক বড় মিথ্যা। কারণ যে তুর্কী, পাঠান, মোগল ইত্যাদি মুসলমানরা এ দেশে এসেছিলেন তাঁরা আর নিজেদের দেশে ফিরে না গিয়ে এ দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। এ দেশকেই তাঁরা স্বদেশ মনে করে তাঁদের পূর্ব আবাসভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ, নাদীর শাহ, আহমদ শাহ আবদালীর মতো লুণ্ঠনকারীদের সাথে তাঁদের পার্থক্য ছিল। বিদেশ থেকে এসেও কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে যে তারা চিরকাল বিদেশী হয়, এই তত্ত্ব এক মতলববাজী। যে আর্যরা এদেশে এসে বেদ-উপনিষদ রচনা করে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিল তারা কি বহিরাগত বা বিদেশী ছিল না? তার পর থেকে দলে দলে হাজার হাজার বছর ধরে যারা ভারতে এসে বসবাস করেছিল তার কি বিদেশী হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য? মধ্য যুগ ও মোগল পাঠন আমলে যারা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা এদেশে এসে এখানকার বিশেষ পরিবেশে ভারতের সভ্যতাকে কি সমৃদ্ধ করে নি? সেটা যদি না হতো তাহলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষ' কবিতায় কি লিখতে পারতেন,

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন–
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

এই হলো ভারতবর্ষের চেহারা, এই তার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতকে এক সমুদ্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন কিভাবে আর্য থেকে মোগল পাঠানসহ অজস্র জাতির স্রোতধারা এই সমুদ্রে বিলীন হয়ে তাদের পূর্ব পরিচয় বিসর্জন দিয়ে ভারতবর্ষ গঠন করেছিল। এক্ষেত্রে আর্যদের সাথে তুর্কী, মোগল, পাঠানের পার্থক্য কি? পার্থক্য কি এই যে, আর্যরা এসেছিল মোগল পাঠানের আগে?

ইংরেজদের শাসন নীতিই যে মুসলমানদেরকে ভারতে বিদেশী আখ্যা দিয়ে হিন্দুদেরকেই এদেশের প্রকৃত অধিবাসী হিসেবে উপস্থিত করে ইতিহাস রচনা করেছিল এবং হিন্দু ঐতিহাসিকদেরকে একই ধারায় ইতিহাস চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। এসব বিষয়ে নূর মোহাম্মদ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর এ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। সে দেশটি এখন যারা শাসন করে এবং যারা শাসিত হয় তারা কি বহিরাগত নয়? সে দেশও কি ভারতবর্ষের মত এক সমুদ্র নয়? সেখানে কি ইউরোপ, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আসা এবং আফ্রিকা থেকে আমদানী করা বিভিন্ন জাতির বসবাস নয়? তাদেরকে কি আমেরিকায় কেউ বিদেশী মনে করে?

আবুল হোসেন মুসলমান সমাজের অনেক সীমাবদ্ধতা, ক্ষুদ্রতা, কূপমণ্ডূকতা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বিষয়ে যে সব আলোচনা করেছেন তা মূল্যবান।

মুসলমানদেরকে আত্ম জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করতে সেটা যে কিছুটা সহায়ক হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যে সঠিক ও সমর্থনযোগ্য নয়, এটা বলেছেন নূর মোহাম্মদ। আসলে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তি সত্ত্বেও আবুল হোসেনের মধ্যে ইতিহাস চেতনার যে অভাব দেখা যায় তাঁর কাজের সামগ্রিক মূল্যায়নে তা হিসেবযোগ্য। তিরিশের দশকে তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে একথা বললেই চলবে যে ইংরেজদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা যখন আপাতত আমাদের পক্ষে কঠিন এবং যুক্তিসঙ্গত নয় তখন তাদের জ্ঞানগুণ অর্জন করবার জন্য তাদের আদর্শ আমাদের অনুসরণ করাই শ্রেয়।" এটা এক বিস্ময়কর বক্তব্য। তিরিশের দশকে ইংরেজের সংস্পর্শ ত্যাগ করা কঠিন মনে করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু সংস্পর্শ ত্যাগ যুক্তিসঙ্গত নয়, একথা যখন বলা হচ্ছে তখন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন রীতিমত জোরদার হয়েছে এবং ভারতীয়রা ইংরেজের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন তার দশ বারো বছরের মাথায়! যে হিন্দু সমাজের অগ্রগতির কথা আবুল হোসেন বার বার বলেছেন এবং মুসলমানদেরকে সেই পথ অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন তারা কি সে সময় ইংরেজের সংস্পর্শ ত্যাগের জন্য ব্যাপকভাবে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে নি?

আবুল হোসেন যথার্থভাবেই মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ কোন উল্লেখ বা সমালোচনা পাওয়া যায় না। ভারতে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে ইংরেজের ভেদবুদ্ধির কোন কথাও নেই। সাম্প্রদায়িকতাকে এইভাবে উপস্থিত করা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। কারণ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই এক জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়েছিল। চল্লিশের দশকে জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের অনেক অনেক আগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ নারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, কিভাবে হিন্দু সম্মেলন, হিন্দু মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে ঊনিশ শতকের ষাট সত্তর দশকে এক জাতিতত্ত্বের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছিলেন তার ওপর নূর মোহাম্মদ আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানই সব থেকে উল্লেখযোগ্য। তাঁর *আনন্দমঠ* উপন্যাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের সংগঠনে মুসলমানের কোন স্থান ছিল না। কালীর বন্দনা গীত তাঁদেরকে গাইতে হতো।

মুসলমান শাসনের সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে মুসলমান সমাজের উচ্চ ও মধ্য স্তরের লোকদের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। আদি পর্বের তুর্কী, আরব, ইরানী, মোগল পাঠানরা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে হিন্দুস্তানকেই নিজেদের দেশ বলে গণ্য করলেও ইংরেজ শাসনে মুসলমানরা এদেশে বিপদগ্রস্ত হয়ে অনেকে ভারতের পরিবর্তে তুর্কী, ইরান, আরবকে নিজেদের দেশ মনে করে এক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। এ দেশের সংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার এক প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বীজ তার মধ্যেও নিহিত ছিল যা

প্রস্ফুটিত হয়েছিল ঊনিশ শতকের হিন্দু লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের অনেকের এক জাতি তত্ত্বের ধাক্কায়। এ বিষয়ে আমি ষাটের দশকে কিছু আলোচনা করেছিলাম। তবে তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এ দিকটি উপেক্ষা না করলেও তা নিয়ে বেশী আলোচনা আমি সঙ্গত মনে করি নি। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিকর দিকগুলির মধ্যেই আমার আলোচনায় জোর দিয়েছিলাম।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, দ্বিজাতি তত্ত্ব হলো, এক জাতি তত্ত্বেরই প্রতিক্রিয়া। নূর মোহাম্মদ এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে এক ঐক্য চেতনার সৃষ্টি ইংরেজ আমলে। আওরঙ্গজেবের সময়েই মুসলমান শাসন হিন্দুস্তানের প্রায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। তার পূর্বে কোন হিন্দু শাসনে তার কাছাকাছিও কিছু দেখা যায় নি। কিন্তু সে শাসন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে নি। ইংরেজ তার ব্যবসা বাণিজ্য, রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা, প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হিন্দু ঐতিহাসিকরা রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দকে জাতীয় বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে ইতিহাস চর্চাকে বিষাক্ত করেছিলেন। ইতিহাসের যে পর্যায়ে ভারতে জাতীয়তাবাদ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না, সে পর্যায়ে উপরোক্ত আঞ্চলিক রাজা ও ধর্মনেতাদেরকে জাতীয়তাবাদী বীর হিসেবে উপস্থিত করার মত অনৈতিহাসিক কাজ ঐতিহাসিকরাই করেছিলেন। এভাবে ইতিহাস চর্চা করতে নিযুক্ত হয়ে তাঁরা অতীতকে টেনে এনে বর্তমানের খুঁটিতে বাঁধার যে চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কি ছিল?

ঊনিশ শতকে যার শুরু, ওপর তলার বর্ণ হিন্দুরা জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধর্ম থেকে পৃথক করে প্রায় কোন সময়েই দেখেন নি। এটা রাজনারায়ণ বসু, নব গোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নব্বুই এর দশকে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ, মদনমোহন মালব্য, গান্ধী পর্যন্ত এটা সত্য। কংগ্রেসের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই গান্ধী রাম রাজত্বের কথা বলে রাজনীতিতে ধর্ম আমদানী করেছিলেন জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের অনেক আগে। এসবের প্রতিক্রিয়াতেই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলন। যে জিন্নাহ বরাবর ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা ধর্ম ও জাতি পরিচয়কে অবিচ্ছেদ্য ঘোষণা করলেন। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে, মূলতঃ কংগ্রেসের রাজনীতিতে, সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রাধান্যই শেষ পর্যন্ত জিন্নাহকে ধর্মবিযুক্ততা থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, হিন্দু পুঁজি মালিকদের এবং ওপর তলার লোকদের এক জাতি তত্ত্ব এবং জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বই ছিল না। উপরন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা জিন্নাহ হিন্দুদের জাতি তত্ত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

হিন্দুরা এক জাতি তত্ত্ব খাড়া করে মুসলমানদেরকে জাতি হিসাবে বাইরে ফেলার পর জিন্নাহ সেই বাইরে পড়াদেরকেই একটি পৃথক জাতি বলে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন। এভাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব খাড়া করবার কারণে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে জিন্নাহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে নিজেদের অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে চল্লিশের দশকে মাতামাতি করেছিলেন সেটা রীতিমত বিস্ময়কর। নিজেদের জাতিতত্ত্ব খাড়া করে ভারতকে হিন্দুদের দেশ এবং মুসলমানদেরকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভাবনা ঊনিশ শতক থেকে অগ্রসর হিন্দু সমাজে বিকশিত হয়েছিল পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক অবস্থান জোরদার করে তার মোকাবেলা করতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ওপর অনেক আলোচনা হয়েছে, আমি নিজেও ষাটের দশক থেকে তার ওপর অনেক লিখেছি। কিন্তু পাকিস্তানী আমলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করবে, এই বিচেনায় তা করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি নি, যদিও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং ঊনিশ শতকে রাজ নারায়ণ বসু, নব গোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রদের সাম্প্রদায়িকতার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এবং তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিৎ নিয়ে আলোচনার কোন অসুবিধা বর্তমান পরিস্থিতিতে নেই। এদিক দিয়ে নূর মোহাম্মদ তাঁর এই বইটিতে সাম্প্রদায়িকতার ওপর যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার যৌক্তিকতা ও গ্রাহ্যতা নিয়ে কেউ বিতর্ক করলেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে।

বর্তমান ভারতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আরএসএস সঙ্ঘ পরিবারভুক্ত কট্টর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বিজেপি ক্ষমতায় এসে যেভাবে ভারতকে হিন্দুদের দেশ, মুসলমানদেরকে বহিরাগত আখ্যা দিয়ে তাদের 'ঘর ওয়াপাসি' (গৃহে প্রত্যাবর্তন) আন্দোলন করছে, জোর করে গরীব মুসলমান ও খ্রীস্টানদের ধর্মান্তকরণ শুরু করেছে, গীতাকে ভারতের জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণা করেছে, এটা কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ছিল এবং বিজেপি হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে ভারতের নির্বাচনে জয়জয়কার করে ক্ষমতা দখল করেছে, এর থেকে বড় ঐতিহাসিক মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। বর্তমানে বিজেপির সাম্প্রদায়িক শেকড় ভারতের বর্ণ হিন্দুদের রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রকৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। তারা যেভাবে ভারতকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এতদিন শাসন করে এসেছে তাতে ভারতীয় মুসলমানরা ভারতীয় নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মতই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ১৯৪৭ সাল থেকেই নির্যাতিত হয়ে এসেছে। বর্ণ হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ওপরও শোষণ নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে স্বাধীনতার দীর্ঘ দিন পর কি অবস্থায় রেখেছে তার পরিচয় ভারত সরকারের মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের মধ্যে দেখা গেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কংগ্রেস বিরোধী ভিপি সিংহ এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়

কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পরই তাদের সরকারের শরীক বিজেপি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সরকার থেকে বের হয়ে এসে বর্ণ হিন্দু স্বার্থের পক্ষে আন্দোলন শুরুর পর থেকেই তাদের দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। বর্ণ হিন্দুদের দল হিসেবে তারা কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে পরিণত হয় ভারতের সব থেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে। ভারতের বড় পুঁজি মালিকরাও কংগ্রেসকে বাতিল করে বিজেপির পেছনে দাঁড়ায়।

আশীর দশকের শেষ দিকে মণ্ডল কমিশন রিপোর্টে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের অবস্থা যা দেখা গিয়েছিল তার অনেক পরে একুশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানদের অবস্থার ওপর 'সাচার কমিশন'-এর রিপোর্টে মুসলমানদের যে দুর্দশা ও পিছিয়ে পড়া দেখা যায় সেটা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের থেকেও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ। শুধু কংগ্রেস নয়, পশ্চিমবঙ্গে অসাম্প্রদায়িক সিপিএম এর শাসন কালেও এটা দেখা যায়। সেখানকার মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০/৩৫% হলেও চাকরীতে তাদের অংশ ২% এরও কম! এদিক দিয়ে ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা ইংরেজ আমলের থেকেও খারাপ। স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের এই অবস্থা কেন হলো এবং সে দেশে স্বাধীনতার ৬৭ বছর পর একটি ঘোষিত হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলের নির্বাচনী জয়জয়কার কিভাবে ঘটলো এটা কি ভারতে ইংরেজ আমল এবং স্বাধীনতা-উত্তর কংগ্রেসের আমলে যা ঘটেছে সেই ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে বোঝার উপায় আছে?

আমি এই ভূমিকায় নূর মোহাম্মদের প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটির ওপর পৃথকভাবে কোন আলোচনা না করে তিনি মূলতঃ যে ভাবে উপনিবেশিক শাসন, সেই শাসনে মুসলমান সমাজের অবস্থা এবং ইংরেজ শাসনে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আলোচনার সূত্রপাত করে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন তার ওপরেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলাম। বিষয়টি যে বিতর্কমূলক এতে সন্দেহ নেই। এই বিতর্কের প্রয়োজন আজ ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বিশেষতঃ বাঙলাদেশে, যেখানে স্কুলের পাঠ্য বিষয় হিসেবে ইতিহাসকে উচ্ছেদ করে দিয়ে কূপমণ্ডূকতার রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে, ইতিহাস চর্চাকে মূর্খ রাজনৈতিক মতলববাজদের প্রচার ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে, সেখানে ইতিহাস চর্চাকে বিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টার গুরুত্ব অপরিসীম।

নূর মোহাম্মদের লিখিত প্রবন্ধগুলির পাঠ যে কোন পাঠকের চিন্তাকে, বিশেষতঃ নোতুন প্রজন্মের পাঠকদের চিন্তাকে, যে সমৃদ্ধ করবে এবং ইতিহাস বিষয়ে তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরী করবে এটা মনে করি। এই কাজের জন্য তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

বদরুদ্দীন উমর
৭.২.২০১৫

আবুল হোসেন : তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা

১

আবুল হুসেনের জীবন ও রচনাবলী (প্রথম খণ্ড সহ) কে কেন্দ্র করে একটি লেখার জন্য প্রকাশিতব্য আবুল হোসেন স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক বললে আমি রাজী হয়ে যাই—কি সুবাদে রাজি হলাম বুঝতে পারছি না। কারণটি অজানা ছিল না তবে লিখতে গিয়েই আমার আশঙ্কা সত্যি হল। কোন বিষয়ে অল্পবিদ্যের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা লিখতে গেলেই বড় বেশি উলঙ্গ হয়ে যায়।

অনেক আগেই প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা হুসেনের কর্মকাণ্ড ও রচনাসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, মন্তব্য ও মূল্যায়ন করেছেন। ফলে প্রাপ্ত রচনাসমূহ ও মূল্যায়ন-এর কম বেশি একটা ফিরিস্তি সামনে থাকলে সুবিধে হবে বলে ধারণা। প্রধান কারণ আবুল হুসেনের রচনাবলী বলতে প্রথম খণ্ড (সম্পাদক; আবুল কাশেম ফজলুল হক, বাংলা একাডেমী; ইং-২০০৩) ছাড়া একটি অভিভাষণ সহ মোট চারটি লেখা পাচ্ছি।

এছাড়া আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'নির্বাচিত শিখা' 'একুশে' কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রকাশিত হয়েছে এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'শিখা সমগ্র' বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে জুন ২০০৩।

নির্বাচিত শিখায় বর্ষ ভিত্তিক প্রকাশ
১৯২৭ – বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা–সমস্যা
১৯৩০ – ব্রিটিশ ভারতের মুসলমান আইন
১৯৩১ – আমাদের রাজনীতি
শিখা সমগ্র-তে বিষয় ভিত্তিক প্রকাশ
১৯২৭ – বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা–সমস্যা
১৯২৭ – সম্পাদক হিসেবে বার্ষিকী বিবরণী
১৯২৯ – স্যার সৈয়দ আহমেদ
১৯৩০ – ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান আইন
১৯৩১ – আমাদের রাজনীতি

হুসেনের যে সমস্ত লেখাসমূহ *রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড) তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার প্রধান অংশ *শিখা*তে প্রকাশিত হয় নি। সম্পাদক সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে হুসেনের অনেকগুলি প্রবন্ধ ও বই এর তালিকা দিয়েছেন যা হয়তো ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে। তবে *শিখা*তে প্রকাশিত মোট পাঁচটি লেখা থেকে মাত্র একটি *রচনাবলী*তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফল হল এই যে, হুসেনের সমগ্র লেখার মধ্যে মাত্র একটা অংশের উপর ভিত্তি করেই আলোচনার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। যা হুসেনের মতো একজন লেখক, সংগঠক ও ক্লান্তিহীন লড়াকু ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচারই করা হয়। এসব কথা মনে হলে আফসোস লাগে। বুঝি আবরু রক্ষা হয় না। তখলিফ এই যে, যথার্থ আবাদ হল না।

আবুল হুসেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও এই সমাজের বার্ষিক পত্রিকা *শিখা* প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পুরুষ। সংগঠন ও তাঁর পত্রিকার মূল মন্ত্রই ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। কাজী আবদুল ওদুদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। জানা যাচ্ছে, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূল মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'।[১]

বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধসংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান।[২] এর অর্থ দাঁড়াল তা হলো : 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠন ও তার প্রকাশনা হাতিয়ার *শিখা* ছিল একেবারেই উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে (১৩৩৮/১৯৩২) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে আবুল হুসেন বলেছিলেন, 'এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তা-চর্চা'।...বাংলার মুসলিম সমাজে জীবন স্রোত রুদ্ধ। সেই জীবন সক্রিয় ও গতিশীল করতে হলে চিন্তাচর্চার প্রয়োজন।[৩] কিন্তু তবুও দেখি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'বুদ্ধির মুক্তি' আওয়াজটি তাহলে তো এ ভাবেও বলা যায়, বুদ্ধির মুক্তির জন্য 'চিন্তা চর্চা'। *শিখা* পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হত : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" আবুল হুসেন রচিত এই বাক্যটি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মর্মবাণী রূপে পরিচিত।[৪] এবং কাজী আবদুল ওদুদের 'কোরআনের আল্লাহ', 'সম্মোহিত মুসলমান', 'ইসলাম রাষ্ট্রের ভিত্তি', আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা', 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ;, 'শতকরা পঁয়তাল্লিশের জের' এবং কাজী মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' এই কয়টি লেখার মমার্থ সন্ধান করলেই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মর্মবাণীর সন্ধান পাওয়া যাবে।[৫]

এটাতো নিশ্চিত করেই বলা গেছে ও যায় যে, আবুল হুসেনের সহযাত্রী ও সহকর্মী লেখকদের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড এতই ওতপ্রোত যে সামগ্রিক অনুসন্ধান অপরিহার্য। হুসেনের একজন সহযাত্রী আব্দুর রহমান খাঁ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম জানাচ্ছেন, তিনি এঁদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে শনাক্ত করেছেন আবুল হুসেন, কাজি মোতাহার হোসেন ও আবদুল ওদুদকে।[৬]

আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে বলতেই হবে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বটি নিঃসন্দেহে আবুল হুসেন। শুধু বেশি লেখা বা বয়স দিয়ে এর বিচার অন্যায্য। কিন্তু কথা হচ্ছে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বুঝতে আবুল হুসেনের লেখার যে ফিরিস্তি পেলাম তার মধ্যে শুধু 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ছাড়া আর তো কোন লেখা পাচ্ছি না। অবশ্যই সেই সময়ের সমাজ ও ইতিহাস বুঝতে বিশেষ করে *শিখার* বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে প্রয়োজন হিসেবে *শিখা*তে মোট প্রকাশিত ৬৩টির মতো প্রবন্ধের মধ্য থেকে এর সম্পাদক ১৫টি লেখাকে নির্বাচিত করেছেন। এর মধ্যে আবুল হুসেনের আছে একটি এবং তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু আনোয়ারুল কাদিরের লেখা আছে একটি। কিন্তু আনোয়ারুল কাদিরের প্রধান লেখাটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর রচিত *আমাদের দুঃখ* গ্রন্থটিতে তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আছে। কাজী আনোয়ারুল কাদিরের চিন্তা ও সমাজসংস্কার প্রবণতা আবুল হুসেনের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করেছিল।[৭]

কাজী আবুল ওদুদের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-এর ভূমিকাতে আবুল কাশেম ফজলুল হক ঢাকার নবাববাড়ি ও বলিয়াদির জমিদার আবুল হুসেনের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও জোরপূর্বক দুঃসহ অপমানের যে বোঝা চাপিয়েছিল তার একটি বর্ণনা তুলে ধরেছেন ড. সিদ্দিকুর রহমান ও অধ্যাপক ইদ্রিস আলীর অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র ও লেখা থেকে। লেখা দুটি আমি দেখিনি। তাছাড়া *শিখা সমগ্র*-এর সম্পাদক আব্দুর রহমান খাঁ'র রচনা থেকে ঢাকার ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম সমাজনেতাদের কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই রচনাটিও আমি দেখিনি।

তবে আবুল হুসেন সম্পর্কে যে সব মন্তব্য-মূল্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরে ফিরে আসছে যে সব লেখা যা সেই সময় ও সেই সময়কার হিন্দুদের থেকে বহু গুণে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের কেন্দ্র করে লিখিত। পশ্চাৎপদ মুসলমান বাঙালিকে অগ্রসর হিন্দু বাঙালির সমপর্যায়ে উন্নীত করে শক্তিশালী আধুনিক 'বাঙালি জাতি' গঠন করতে অন্যান্যদের সাথে তিনিও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছেন। এই জন্যই তাঁদের ঐ সময়কার অধিকাংশ লেখাই ইসলাম ও বাংলার পশ্চাৎবর্তী মুসলমানকে কেন্দ্র করে। ...ইউরোপের রেনেসাঁর এবং বাংলার উনিশ শতকের জাগরণের ভাবধরাকে তাঁরা আত্মস্থ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। (ফজলুল হক, ১৯৮৯) এই প্রচেষ্টা তাঁদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল যে, আসলে বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা ও দুর্দশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা যা তাঁদের বিবেচনায় বিশ্ব মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যর্থতার ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত এবং এর পিছনে অন্যতম কারণটিই সম্ভবত তাঁদের ধর্ম 'ইসলাম' এর মূল ভিত্তিসমূহ সংশোধনের অতীত—এই দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত। সুতরাং 'ইসলাম' সম্পর্কে তাঁদের প্রশ্ন উত্থাপন অনিবার্য হয়ে উঠে। এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা সেসব প্রশ্ন তুলেও ধরেন। ইসলামের যুগোপযোগিতার প্রশ্নটিকে তাঁরা নানাদিক দিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা

করেছেন। যতোদূর সম্ভব নির্ভীক অবস্থান গ্রহণ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করাকে বলিষ্ঠভাবে সংগত মনে করেছেন। কিন্তু ইসলামকে 'আধুনিকতা'-র সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা কখনো কখনো স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে গেলেও ধর্মের পরলোকের প্রভাবকে অস্বীকার করে ইহলৌকিক ও মানবিক অবস্থানে দেখতেই তাঁরা দৃঢ় থাকায় মুসলিম রক্ষণশীল সমাজে আবুল হুসেনকে 'ইসলামের শত্রু' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হন। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে পরে দেলোয়ার হোসেন আহমদ ও আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যে ইসলাম ধর্মের তাঁরা মুখোমুখি তাকেই পরাস্ত তাদের লক্ষ্য বলে মনে হয় না। ধর্মীয় শ্রেয়োবোধকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাদীদের মোকাবেলার মধ্য দিয়ে তাঁরা ইসলামের সংস্কার দাবি করলেন, এটা এমনও যে, স্বার্থবাদীরা নিজেদের মতো করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে সমাজকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। এক্ষেত্রে প্রধানতঃ কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন অধিক তৎপর বিবেচিত হয়। "প্রয়োজনে ইসলামকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে।" (ফজলুল হক, ১৯৮৯)

তবে কথা আছে। প্রথমত, কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের এই ধরনের লেখাগুলি পর্যালোচনা করলে পার্থক্য ধরা পড়ে। দ্বিতীয়ত, আবুল হুসেনকে ঠিক বর্ণিত কাজেই মাত্র লিপ্ত এবং সেই জন্যেই সব লেখালেখি—এইভাবে নির্দিষ্ট সীমানায় আটকে দিলে তাঁকে বরং খাটো করা হয়। শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে তিনি আবদ্ধ হয়ে যান। অথচ তাঁর ক্ষেত্র ছিল বিরাট। হুসেনের মতো বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ও প্রচণ্ড সাহসী মানুষ কখনো কখনো মাত্র কয়েকটি লেখা ও দু'একটি ঘটনার জন্য বিশাল এক অভিযাত্রীর পরিচয় হারিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে ক্রমাগত মূল্যায়িত হতে থাকেন—বড় সময়ের কোন এক ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য চিহ্নিত হন—ফলে বড় ক্যানভাসটা চোখে পড়ে না।

তবে এক্ষেত্রে সান্ত্বনা এই যে, এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য যেমন বিশেষ করে একটি লেখার উপর নির্ভর করে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মর্মার্থ উদ্ধার করা নয় তেমনি হুসেনের প্রাপ্ত লেখালেখি ও কর্মকাণ্ডের কোন পূর্ণাংগ মূল্যায়নও নয় বরং আমি চেষ্টা করেছি হুসেনের যে প্রবল অনুপ্রেরণা ও প্রত্যাশা বার বার বিভিন্ন আলোচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার স্বরূপ সন্ধানকে কেন্দ্রে রেখে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনতে। প্রধান জোর দেয়া হয়েছে তাঁর সময়কালকে অনুধাবনে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে যতোদূর সম্ভব নির্মোহ দৃষ্টিতে কিছুটা হলেও পর্যবেক্ষণ করা—পুনর্মূল্যায়িত প্রাপ্ত তথ্য হাজির করা।

২

১৯২৬ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ১৯২৭ সমাজের বার্ষিকী *শিখা*।

আবুল হুসেনের *বাংলার বলশী* প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। এতে যে প্রবন্ধের সমাহার তা তো আগেই পত্রিকায় প্রকাশিত। হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে গ্রন্থ প্রকাশকাল

বাংলা ১৩৩২ এবং পত্রিকার প্রকাশকাল ১৩২৮-২৯। আবুল হুসেনের জন্ম বাংলা ১৩০৩। অর্থাৎ বলা যায় বলশীর প্রবন্ধ রচিত হয়েছে পঁচিশ বছর বয়সের সময়। বিস্ময়কর বলতে বাধ্য। সত্যি কথা বলতে কি সাদামাঠা অর্থে বিস্ময়কর নয়। এই কথাটা তো প্রমাণিত হয়েই গেল যে, যখন কয়টি প্রবন্ধ নিয়ে ঢাকার নবাব সাহেবরা আবুল হুসেনকে হত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত তার বেশ আগেই তিনি বাংলার ভূমিসমস্যা-কৃষক সমস্যা নিয়ে যে দরদ, ভালবাসা, আবেগ ও দৃঢ় প্রগতিশীল পাণ্ডিত্য ও মনোভাব দেখিয়েছেন তার বিবরণ ও পর্যালোচনা এই স্মারকগ্রন্থেই অন্য লেখক দিয়েছেন। *রচনাবলীর* সম্পাদক কৃষক সম্পর্কে বলশীর আগে লেখা অক্ষয় কুমার দত্ত ও বঙ্কিম এবং মাত্র এক বছর পরে লেখা প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করেছেন। একটা তুলনামূলক বিচারও আছে। প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা মূলত জমিদারদের সমস্যা নিয়ে, আর দুজনের চিন্তা মূলতঃ জমিদারি ব্যবস্থার নির্মম শোষণ পীড়ন ও নির্যাতিত কৃষকদের নিয়ে। আবুল হুসেনের চিন্তা সম্পূর্ণই কৃষকদের মুক্তি ও কৃষির উন্নতি নিয়ে।[৮]

ঠিক এভাবেই *বাংলার বলশী* সম্পর্কে সমাপ্তিরেখা টানা যায় না। আবার আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে এই প্রবন্ধে একেবারেই তার ক্ষুদ্র সংশ্লিষ্টতা। তবুও বাংলার বলশীর প্রবন্ধমালা থেকে মাত্র কিছু শব্দ ও বাক্য পেশ করছি। অন্ততঃ আমার উপলব্ধির আংশিক প্রকাশ ঘটাতে :

চাষা, জমিদার, নিষ্ঠুর জমিদার, জমির উৎপাদিত শক্তির ক্রমহ্রাস সাধন (Diminising Productivity), নিষ্ঠুর জমিতৃষ্ণা, ঘনচাষ (intensive cultivation), জমি থেকে উচ্ছেদ, 'বাবু', জমির উন্নতি সাধন, মাটির উর্বরতা, সার দেওয়া (Manuring), চাষার ঋণ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট, চাষার ঋণ, মহাজন, চাষা মহাজনের নাম শুনে আতঙ্কে কাঁপে, দারিদ্র্য ও ধনোন্নতি, ধনী নির্ধনের পার্থক্যরেখা ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে উঠছে, চাষার মৃত্যু অর্থে জাতির মৃত্যু, চাষার কাছে জমিদার ও সরকারের প্রাপ্য অনেক (৭টির তালিকা)। দেশবাসীকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে; কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধনী। অকৃষকশ্রেণী, অনুৎপাদক, শিল্পরাজ্যে বিপ্লব, চরকা ও তাঁত, কৃষি বিপ্লবের সূচনা, জমিদাররা একেবারেই অনুৎপাদক সম্প্রদায়, ভারতের চাষা প্রকৃত উৎপাদক ইত্যাদি। শেষে হুসেন বলেছেন, যদি কোন দিন বিপ্লব (Bolshevism) উপস্থিত হয় তবে জমিদারদের জন্যই হবে। জমিদাররা কর্তব্যচ্যুত হয়েছে—তাদের উৎপাদক হতে হবে, বিলাস-ভোগ-তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে।

এবং এও বললেন, সেজন্য ইউরোপের শ্রমী সম্প্রদায়ের জাগরণে আমরা সতত কৃষক জাগরণ (Peasant Revolution) প্রতীক্ষা করি।[৯]

স্বীকার করতে বাধ্য, একমাত্র অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চাষীদের জন্য (তিনি অবশ্য সর্বত্র 'চাষা' ব্যবহার করেছেন) সুগভীর ভালবাসা ও শ্রেণী সচেতনতার লক্ষণ—এই ধরনের প্রবন্ধসমূহের মান ও অবস্থান নির্ণয় করে।

এর আগে আর কোন বাঙালি মুসলমান লেখক এই ধরনের প্রবন্ধসমূহ রচনা

করেছেন বলে জানি না। বলতে কি কোন হিন্দু লেখকও এইভাবে কৃষকদের মুক্তির প্রশ্ন বা অনেকটা অস্পষ্ট হলেও কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব (Bolshevism) ও কৃষকের জাগরণ (Peasant Revolution)-এর কথা বলেন নি। কর্তব্যপরায়ন, উৎপাদক ও সাধু জমিদারদের জন্য লেখকের প্রত্যাশা কালের সীমায় সীমাবদ্ধ।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জমিদার ইত্যাদি ধরনের মৌলিক সমস্যা প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি—হয়ত সম্ভবও ছিল না।

আবুল হুসেনের *বাংলার বলশী* প্রকাশের চৌদ্দ বছর পরে স্যার এস. আজিজুল হক-এর বিখ্যাত *Man Behind the Plough* (1939) প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী এর প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। সম্পাদক বলেন, স্যার আজিজুল হক বাংলার কৃষক সমাজের শোচনীয় অবস্থার যে চিত্র এঁকেছেন তা পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা প্রথমত এতে ভূমিহীন কৃষকদের কথা উল্লেখিত হয় নি। দ্বিতীয়ত কৃষি ও কৃষকদের সমস্যাবলীর ঔপনিবেশিক পটভূমিও আলোচিত হয় নি।

আবুল হুসেন সমকালীন সময়ের সীমনা বিপুলভাবে অতিক্রম করেছিলেন তবুও সেই সময় ও সেই সময়ের পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজ ও ইসলাম পর্যালোচনার কেন্দ্রভূমিতেই থেকে গেছে অর্থাৎ অন্ততঃ এইভাবেই তার মূল্যায়ন হয়েছে।

এটা আগেই দেখেছি হুসেনের যে লেখাগুলি *শিখা*তে প্রকাশিত হয় নি অথচ 'তুমুল বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ' হয়েছে এবং দুটি লেখাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ঢাকার নবাববাড়ী ও বলিয়াদীর জমিদারবাড়িতে হত্যার উদ্দেশ্য নীত হয়ে শেষে মুচলেকার পরিবর্তে জীবন রক্ষা পেয়েছেন, এর বাইরেও তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে। এই সব লেখাসমূহ মূলধারায় থেকেও স্বতন্ত্র গুরুত্বের সাথে সম্মানিত হওয়ার দাবি রাখে। যদিও এটাও ঠিক যে, যে কোন নিবন্ধেই ইসলাম মুসলমান-বিশেষণ করে বাঙালি মুসলমান সম্পর্কিত হয়েছে সেখানে অবধারিতভাবেই হুসেন তাঁর/কখনো কখনো তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনায় সমকালীন সমস্যা হাজির করেছেন, বিতর্ক মূলক ও তীর্যক করেছেন।

যেমন ধরা যাক, প্রথম বর্ষ *শিখা*তে প্রকাশিত 'বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' লেখাটি।

৩

১৯২৭ সালে প্রথম সংখ্যা *শিখা*তে 'বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' প্রকাশিত হয়। এটি হুসেনের অন্যতম প্রধান রচনা। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যাই যে তাদের অধঃপতিত হওয়ার প্রধান কারণ এবং অগ্রগতির জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ছাড়া অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না—সেটাই হুসেন তাঁর এই নিবন্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং ভবিষ্যতে হুসেনের লেখা-লেখি সহ যাবতীয়

কর্মকাণ্ডের গতিমুখ এই লেখাতেই প্রকাশিত। হুসেন মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিকেই মুসলমানদের বিরাট পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ বলে শনাক্ত করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে, চরম প্রতিক্রিয়াশীল উচু-তলার মুসলমান মাতব্বররা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিকভাবে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের পদানত রাখতে পেরেছে, হিন্দুদের থেকে সর্বদিক দিয়ে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

সুতরাং এই শিক্ষা পদ্ধতির কোন সংস্কার নয়—ওল্ড স্কীম বা নিউ স্কীম বা নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কাজেই আসবেনা—ফলে একে উলটিয়ে দেয়া দরকার—একেবারেই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা। এর জন্যে হুসেন হাজির করেছেন তাঁর সুচিন্তিত 'আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ্যতালিকা'। এই প্রবন্ধে হুসেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, কিছু মন্তব্য করেছেন—যা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা হয়েছে বলা যায়। তিনি বলেছেন, সাধারণত, বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ হতে যুগধর্মকে অবজ্ঞা করে এসেছে। ফলে আজ তার সঙ্গে পড়শী হিন্দু জাতির Cultural পার্থক্য এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভবপর হচ্ছে না বরং একে অপরের গলা কাটতে প্রস্তুত হয়েছেন। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি চিত-বিকাশে ও মস্তিষ্ক সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই মনোভাব দূর করতে হলে উভয়ের শিক্ষা অনেকটা একমুখী হওয়া চাই।[১০]

অর্থাৎ হিন্দুরা যে শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে আজ এত এগিয়ে গেল সেই পথেই অগ্রসর হওয়ার বিকল্প নেই। এবং 'যুগধর্ম' কে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে গেলে 'ইংরেজী ভাষার সাথে ইংরেজী দর্শন বিজ্ঞান কাব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে, তার উপর ধর্মশাস্ত্রের যুগধর্ম সম্মত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে।' মুসলমান সমাজ এই আরদ্ধ কাজকে অবজ্ঞা করেছে, যার জন্যে, আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি—অন্ধবিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা।

এই সব আড়ষ্টবুদ্ধি অবিশ্বাস ইত্যাদি তা তিনি গভীর বেদনায় লক্ষ্য করেছেন। বাঙালি মুসলমানের জীবন হচ্ছে 'নিতান্ত হীন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত সঙ্গীন। অর্থ বলুন, রুচি বলুন, আনন্দ বলুন কিছুই সে জীবনে নাই' আজ বাঙালি মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, কোনটিতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে সেই পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। কেবল ভিক্ষুক, কারা-নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, পরাশ্রয় ভিখারির দল বেড়ে চলেছে।

যেহেতু কেন্দ্রীয় সমস্যা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সেই জন্য এর সবিশেষ গুরুত্ব বুঝাতে হুসেন পরিষ্কার করেই উল্লেখ করলেন, 'এজন্য আমি বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা বলতে চাই।' এর পরে তিনি বললেন 'শুধু মোল্লা তৈরিই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে তা বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ

হত না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙালি মুসলমান এই প্রণালীকে তার একমাত্র শিক্ষা প্রণালী মনে করে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ বর্জন করে ছেলেপুলে সব মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন।'

এর ফলে 'বাড়ছে ধর্মান্ধতা আত্মপ্রবঞ্চনা, সত্য অনুসন্ধিৎসা না জেগে জাগছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য আকুল আগ্রহ' ইত্যাদি। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাপদ্ধতি তাকে 'সাম্প্রদায়িক' হতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। পরবর্তী লেখা থেকেও দেখা যাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হুসেনের কি প্রবল বিতৃষ্ণা—তিনি 'প্রস্তাবিত পাঠ্য তালিকা' সহ নানাভাবে উত্তরণের জন্য বিধান বাৎলেছেন।

সুতরাং 'যুগধর্ম' অস্বীকার করে ভ্রান্ত পথে চলতে চলতে বাঙালী মুসলমান ধ্বংসপ্রাপ্ত—নিতান্তই প্রাণীসূলভ-স্তরে তাদের অবনতি।

তাহলে 'যুগধর্ম' না ধারণ করা কি সেই ঐতিহাসিক ভুল—যার জন্য বাঙালি মুসলমানের এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়।

৪

আবুল হুসেন সরাসরি মনে করেছেন মহাপুরুষ রামমোহনকে নেতা মান্য করে ও উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য হিন্দু বিদ্বান ও নেতারা যে ভাবে হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য তাঁদের 'প্রকল্প' বাস্তবায়িত করেছেন সেটাই হওয়া উচিত বর্তমানে মুসলমানদের সম্ভাব্য প্রকল্প। দুঃখ করেছেন আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে রামমোহনের আবির্ভাব হয় নাই। কাজী আবদুল ওদুদের একটি প্রবন্ধের নামই হল 'নেতা রামমোহন'।[১১] হুসেন মনে করেছেন আসলে ইংরেজ শাসকদের অধীনস্থ হিসেবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই হিন্দুদের সর্বদিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার প্রধান শর্ত হিসেবে কাজ করেছে। এবং 'রামমোহনই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিলেন'।[১২] আর ব্রিটিশ শাসনকে আন্তরিক আবাহনের মধ্যেই স্বার্থকতার অপার দিগন্ত। অতএব এসে গেল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের সম্পর্কে হিন্দুদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মুসলমানদের নির্বোধ বেঠিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বয়ান।

হুসেন বড় বেদনায় লিখে চলছেন সেই বিবরণ। অনেকটা বিক্ষুব্ধ বিলাপের মতো। 'আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হতে চলল ব্রিটিশ পতাকা দেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্ব সনদ আহরণ করতে শুরু করেছে।' 'ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল আর আমরা সে আঘাত তো চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।... পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোন সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই।'

রামমোহনের সময় থেকে একশত বছর পর হুসেনদের বক্তব্য অনুযায়ী তো কোন পরিবর্তন হয় নি—বরং 'সে ভুলকে বর্তমানে আমরা আরও জোর করে আঁকড়ে ধরেছি।' তিনি আরো বললেন, 'আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে, 'ব্রিটিশ এদেশে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে।' 'রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে একথা বললেই চলবে যে ইংরেজদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা যখন আপাতত আমাদের পক্ষে কঠিন এবং যুক্তিসঙ্গত নয় তখন তাদের জ্ঞানগুণ অর্জন করবার জন্যে তাদের আদর্শ আমাদের অনুকরণ করাই শ্রেয়।'

হুসেন ও তাঁর বন্ধুরা যখন এই প্রত্যয়ে অটল তখন কিন্তু বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যার সাথে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক তো দূরের কথা এমনকি উনিশ শতকের শেষ দশকেরও কোন তুলনা হয় না—হুসেন যে ভাবে ১৯২৭ সালকে বর্তমান ধরে সেই আয়নার সমস্ত অতীতকে যেন একাকার দেখছেন, আসলে কি সেভাবে দেখা যায়?

এই নিবন্ধের গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে আমার পক্ষে এই নিয়ে আর বিশদ সম্ভব না।

৫

আসলে শিক্ষাপদ্ধতি বা ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার অনুসঙ্গী হয়ে থাকে—আর উপনিবেশিক শাসন উপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যই হুসেন বর্ণিত শিক্ষা পদ্ধতি জারি ছিল। তাছাড়া মুসলমানরা সবাই খুব নিচ ও কর্দমাক্ত পশুর পর্যায়ে ছিল তাতো মনে হয় না, এবং হিন্দুদের যে বড় একটা অংশ ইংরেজদের সর্বাঙ্গীন মিত্র হয়ে উনিশ শতক অতিক্রম করে এসেছিল তারা ইতোমধ্যেই বিবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। মুসলমান সমাজ থেকে অনেক গুণি লেখক, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সক্রিয় হয়ে গিয়েছিল—সেখান থেকে অন্যভাবে হলেও মুসলিম রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ বেশ (সর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে) তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করেছিলেন। এটাও দেখা খুব জরুরি যে, কথিত হিন্দু শিক্ষিতদের একাংশ তাদের পেয়ারের শিক্ষাদীক্ষার প্রভুদের সম্পর্কে তর্জনী উত্থাপন করেছেন—অনেকে বেশ দৃঢ়তার সাথেই। বরং তাদের অভিযোগ ছিল সরকারি সেন্সাস ও হান্টারের রিপোর্টের পর মুসলমানদের নেতারা ইংরেজদের দালাল হয়ে গেছে। তথ্যবিচারে যা সঠিক না। দুর্বল হলেও এ অভিযোগ প্রকৃত অর্থে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই তোলা যেতে পারতো—যদিও আজকের নিরিখে এ বক্তব্যটিও বিতর্কসাপেক্ষ।

শুধু শিক্ষা প্রসঙ্গেই আসা যাক। বাংলায় আধুনিক শিক্ষার জন্য যে প্রবল চাহিদার সৃষ্টি হয়েছিল তার পেছনে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি—অগ্রগতি, এক কথায় অর্থনৈতিক প্রয়োজন চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেনি। বরং এ ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা হল বাঙালি বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ) যারা সচরাচর 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত, তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করেই বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা তার তৎকালীন আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করেছে।[১৩]

এ ব্যাপারে যা দেখে নিতে হবে তা হল মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে উন-বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই বিতর্ক সামনে চলে এসেছে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, মুসলমানদের শিক্ষিত নেতারা খুব আন্তরিক ও সচেতন হয়েছিলেন, কারণ এটা যে ইংরেজ শাসকদের নিজেদের শাসন-স্বার্থে মুসলমান অধ্যায়কে আর আগের মতো দরজার বাহিরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। ১৮৫৭ ও ওহাবি ট্রায়াল-এর পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র যুদ্ধের অধ্যায়টি যখন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছিল তখন ব্রিটিশরা দীর্ঘস্থায়ী শাসনের লক্ষ্যে শাসনব্যবস্থায় মুসলমান অন্তর্ভুক্তি বিবেচনায় আনতে বাধ্য হলেন—তাছাড়া হিন্দুদের একচেটিয়া আনুগত্য ও সহযোগিতা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়েছিল।

শিখা গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে হুসেন ও ওদুদ নিঃসন্দেহে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ে খুবই বিব্রত হয়েছিলেন—তাঁরা কলম ধরে সেই কলমকে যুদ্ধ চালানোর উপযুক্ত বন্দুকে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ + হিন্দু + মুসলমান একটা একমুখী শিক্ষা অবস্থান বিবেচনায় অংকশাস্ত্রের নিয়ম প্রয়োগে সঠিক ফলাফল পাওয়ার আর কোন সুযোগ ইতোমধ্যেই ঐতিহাসিকভাবে বিনষ্ট হয়েছিল।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুলসমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা শিক্ষা নিয়ে পণ্ডিতী বিতর্কের বাইরে ছিল।

শিক্ষা কখনো সংস্কৃত নিরপেক্ষ হয় না। শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও জটিল। বাঙলাভাষী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক যে সাংস্কৃতিক প্রভেদ তার স্বীকৃতি ছাড়া এই মিলনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ বুঝি সম্ভব ছিল না। অথচ এই প্রভেদের স্বীকৃতি নিয়েই যত বিরোধ।[১৪]

হিন্দু সমাজের পুরোধারাই বাংলার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে প্রধান ভূমিকা পালন করলেন তবে তাকে ব্রিটিশ ভক্তির সাথে সাথে হিন্দু ঐতিহ্য ও হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হল। বাঙালি মানে হিন্দু আর হিন্দু মানে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যা প্রধানতঃ বাংলার বাইরে থেকে আমদানি করা হল। ভাবখানা বর্গী হলেও আপত্তি নেই।

বিশ শতকের গোড়ায় শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় যখন আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠতে লাগল, তখন তারা প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে হিন্দুর একাধিপত্যকে নিজেদের শিক্ষার পথে এক অন-

তিক্রম্য বাধা হিসাবে গণ্য করল।[১৫]

পুরো উনিশ শতক ধরে পাঠ্যপুস্তক ইংরেজ, হিন্দু-গৌরব ও মুসলিমবিদ্বেষ দিয়ে এমন ভাবে পরিপূর্ণ করে তোলা হয়েছিল যে, মুসলমানদের সেখানে ঠাঁই হওয়ার কথা হিন্দু সমাজনেতারা ভাবতেই পারতেন না—যদিও বিশ শতকের প্রথমদিকে বাস্তবতা তাদের বাধ্য করেছিল কিছু কিছু প্রশ্নে এক অনুদার কৌশলী আপোষের কাছাকাছি আসতে।

এ ব্যাপারে হুসেনের আলোচ্য লেখাটির আগে পরে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে। মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেছিলেন, পাঠ্যপুস্তক মুসলমান শিশুগণকে প্রথমেই রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড় ভাল ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লা কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখানে হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়।

১৯১৫ সালে সরকার মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সুপারিশমালায় অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যে Secular education কে (আবার তা হবে হিন্দুদের সাথে একদেশদর্শী) খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু পুরো উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে যে বিরাট বিরাট ঘটনা ভারতের ও বাংলার ইতিহাসে ঘটে গিয়েছিল সে সম্পর্কে সম্ভবত ইচ্ছাকৃত উদাসীন থেকে শুধু উঁচু মাপের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সাহস, সদিচ্ছা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা দিয়ে প্রত্যাশা পূরণ ইতোমধ্যেই অনেকটা কন্টাকাকীর্ণ হয়েছিল।

তিনি প্রথম মান (stadard) যাদের বয়স ছয় থেকে সাত বৎসর তাদের জন্য বিধান রাখলেন, 'বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের গল্প, যাতে প্রত্যেক জাতির কৃতিত্বে শ্রদ্ধা জাগে'। ... 'মুসলমান চিতে মুসলিম সভ্যতার স্মৃতি এবং হিন্দুদের চিতে হিন্দু সভ্যতার কাহিনী জাগরূক করার জন্য নানা প্রকার ঐতিহাসিক কাহিনী।...'

'যে সমস্ত গল্প বা কথায় এক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে চোট লাগে—তা একেবারে বর্জন করতে হবে। যেমন আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ—রানা প্রতাপের মুসলিম নিধন—অন্ধকূপ হত্যা ইত্যাদি। এ সমস্ত নব Curriculam এ কিছুতেই স্থান পাবে না। কারণ আমাদের এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে হিন্দু-মুসলিম (Culture) এয সমন্বয় (Synthesis) সাধন করে হৃদয়বান আধুনিক ভারতবাসী তৈরি করা।' আশঙ্কা যথার্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কয়েক দশক ধরে চলে আসা এই যে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া তার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তারিত সুগভীর চিন্তার যে পরম্পরা হিন্দু-মসুলমান সম্পর্ক অবনতির একটা বিশেষ কারণ হতে পারে তা কিন্তু হুসেন প্রায় স্পর্শই করতে চাননি। হতে পারে তিনি বিতর্কে না যেয়ে একটা নিষ্পত্তি চান।

পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ও বাংলার আইন সভায় শিক্ষা প্রণালী নিয়ে যে বাদানুবাদ, বিল উত্থাপন, কমিটি গঠন, রিপোর্ট ইত্যাদি কয়েক বছর ধরে অমীমাংসিত অবস্থা চলতে থাকে তা থেকেও ৪৭'র বঙ্গ-

বিভাগ এমনকি ভারত-বিভাগের বেশ তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান পাওয়া যেতে পারে।

যা হোক হুসেনের পুরো পাঠ্য তালিকায় আমরা দেখব যে, প্রতিটি মান (Standard) তৈরি করা হয়েছে ধর্ম ও ইতিহাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেই। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে ইংরেজ শাসক, হিন্দু ও মুসলমান সকলের স্বার্থ এবং সব ধর্মের মর্যাদাকে কেন্দ্র করেই যেন পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত।

সঙ্গত কারণেই হুসেন একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যাকুল। এ বড় বিরাট দায়। আর দায়বদ্ধতাই তো হুসেনের জীবনদর্শনের অন্যতম অঙ্গীকার। বিদ্যা-বুদ্ধি, মেধা ও মননে বিবেকী হুসেন একজন নিষ্ঠাবান যুক্তিনির্ভর অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। হুসেন তাই আগামী ভবিষ্যতেও এ ব্যাপারে আমাদের একজন অগ্রজ পথপ্রদর্শক থাকবেনই।

হুসেন সরাসরি পুরাতন মাদ্রাসার Curriculum একেবারেই তুলে দেবার পক্ষপাতি—তিনি এই Curriculum huge waste (মারাত্মক ক্ষতি) মনে করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, 'আমরা আলোচ্য curriculum অনুসরণ করলে যারা মোহাদেস হতে চান বা বড় মৌলানা হতে চান তাঁরা অনায়াসেই আধুনিক জ্ঞান গুণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা হাসিল করতে পারবেন।'[১৬]

অনেকেই উল্লেখ করেছেন ইসলাম ও মুসলমান (বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান) হুসেনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা ও অগ্রগতির জন্য এক ধরনের তীব্র আকুতি, আক্ষেপ ও আতঙ্ক বিভিন্ন আলোচনাতে কখন কখনও এত বিবর্ণ, নির্মম ও অভিযুক্ত-প্রধান যে, মনে হয় সর্বদাই এই সম্প্রদায় আসামীর কাঠগড়ারই শোভাবর্ধনে উপযুক্ত যা হুসেনকে প্রকৃত অর্থে নিয়ত মর্মাহত করে। আর এই মহা অপরাধের শুরু ইংরেজ শাসন ও হিন্দুদের সহযোগিতায় চালুরাখা শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম থেকেই হিন্দুদের অনুসরণে সাদরে গ্রহণ না করা থেকে। হুসেন এই ভূমিকাকে 'অপরাধ' বলে গণ্য করছেন।

'শিক্ষা-সমস্যা' অধ্যায়ে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হল এটা বুঝতে, অন্যত্র অন্য বিষয়ে লেখাতেও কি ভাবে প্রায় একই ধরনের অভিযুক্ত করার ধারাটি বহমান থেকেছে। অভিযোগ উত্থাপন কেন হচ্ছে অবশ্যই এটা প্রশ্ন নয়, উদ্বিগ্ন হওয়ার মত তো নয়ই। আসলে 'যুগধর্ম' কে অস্বীকার করে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া ও মোল্লাশাসিত একটা অধঃপতিত সমাজকে কিভাবে প্রয়োজনে কঠোর আঘাত করে জাগিয়ে তোলা যায় সেটাই প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করা সঙ্গত।

১৩৩৪ সালে 'তরুণ মুসলিম' বার্ষিক *সওগাতে* প্রকাশিত এবং *রচনাবলীতে* অন্তর্ভুক্ত। তিনি মনে করছেন হিন্দুরা মুসলমানদের স্বার্থ অপহরণ করে, অত্যাচার করে ও ঘৃণা করে এবং ইংরেজরা যে প্রভুত্ব করছে যা হৃদয়হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর জন্য মুসলমানদের অপরাধ বেশি 'আমাদের অপরাধের অন্ত নেই'। হুসেন

অতঃপর কি ধরনের বুদ্ধিমত্তার সাথে হিন্দুরা ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষা বরণ করল ও উন্নতির শিখরে উঠল তার আবারো বর্ণনা দিয়েছেন। 'এখন মুসলমানরা এত পিছনে যে তাদের অবস্থা হয়েছে ভিক্ষুকের মতো। এরা 'এটা দাও' 'ওটা দাও' বলে কাতর-ধ্বনি করে বেড়াচ্ছে। তিনি বললেন, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মূলত আধুনিক শিক্ষা অর্জনের জন্য সাধনা করা দরকার। 'সেজন্য সাধনা করতে, ত্যাগ করতে, পল্লীবাসীর জীবনে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোক পৌঁছে দিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য একাগ্রচিত্তে তপস্যা রত হও।' 'ইংরেজরা ও হিন্দু এই অবস্থার জন্য দায়ী না—মূলতঃ দায়ী হচ্ছে দেড় শত বৎসরের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যর্থতা।'

'এই দেড় শত বৎসর একেবারে ফাঁকা।' অর্থাৎ মুসলমানরা দাবি করছে না, ভিক্ষা করছে—তাই হিন্দুরা একে অন্যায় 'আবদার' বলে গালি দিচ্ছে।

মনে হয় পুরো ব্যাপারটা এত সহজ নয়। কিন্তু তিনি একটা 'নির্দিষ্ট' বিষয়ে সমস্ত বিশ্লেষণ কেন্দ্রীভূত করতে পারায় বেশ সহজ হতে পেরেছেন, সেজন্য তিনি যেমন easy to comment—তেমনি 'কমিটেড' নিঃসন্দেহে বলতে হবে।

ফলে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারছেন, 'পুনরায় বলি হিন্দু তোমাদের ঘৃণা করেন, কারণ তোমরা এমন কিছু করছ না—যাতে তাঁরা তোমাদের শ্রদ্ধা করতে পারেন।'

মুসলমানরা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিল, এক সময় তারা অসহযোগ আন্দোলন করেছিল—কিন্তু হুসেন তার নিন্দা করেছেন। নীতিগতভাবে ঐ সময় জিন্নাহসহ অনেকেই গান্ধী পলিসি গ্রহণ করেন নি—রাজনীতিতে ধর্মযোগ নিয়ে কথা উঠতেই পারে—উঠেছেও বারবার—আজো এর তীব্র বিরোধিতা বিশেষ করে আমাদের ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুতর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বহুবছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। তার ওপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও জ্বালানি নীতি যে ভয়াবহ আগ্রাসনের জন্ম দিয়েছে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলিতে তাতে বাংলাদেশেও মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদী সামরিক কর্মসূচি রুখে দিতে না পারলে আমরা ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছাতে বাধ্য হব।

কিন্তু হুসেন যেন অন্য সুরে বিরোধিতা করলেন। তিনি ইংরেজদের রূঢ় প্রভুত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'আমাদের অপরাধ বেশি বলে তাঁদের এই প্রভুত্ব এরূপ চেহারা নিয়েছে, যার সম্বন্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের যুবকগণ লম্বা লম্বা গলায় বক্তৃতা করে বেড়িয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে আজ দেশপূজ্য হয়েছে। তারা তখন ইংরেজকে গালি দিতে পারলেই বড় বক্তা বলে গণ্য হত। এই গালি দেওয়াটি তখন নৈতিক বলের পরিচায়ক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এটা বিদেশীর অপরাধকেই বড় করে দেখতে আর নিজের অপরাধ ঢাকতে শিখিয়েছে। এর চেয়ে বড় অশিক্ষা আর কিছু হতে পারে না। এজন্য এয ফল হয়েছে মারাত্মক।'

এবং 'আমাদের দেশের রাষ্ট্রসমস্যাই আজ দেশের নায়কগণকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। কিন্তু রাষ্ট্র সমস্যার পূর্বে আমাদের সমাজ-সমস্যার মীমাংসা হওয়া চাই।' রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে অনেকটা এভাবেই বলতে পছন্দ করতেন।

'আমাদের কর্তব্য কি' প্রবন্ধে (রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত) হুসেন মুসলমানদের সম্পর্কে মোটামুটি একই ধরনের অভিযোগ করেছেন এবং করণীয় প্রসঙ্গে মূলত একই ধরনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

হুসেনের যে লেখা দুটি নিয়ে দুইবার ঢাকার নবাবদের কর্তৃত্বাধীন তৎকালীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তাঁর বিচার হয়েছিল—নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল[১৭] তার একটি হল 'নিষেধের বিড়ম্বনা' (১৩৩৩); তুমুল বিতর্কের লেখাগুলির মধ্যে মাত্র এই একটিরই যে শুধু দেখা পাচ্ছি তা প্রথমেই বলে নিয়েছি। যদিও মাত্র এই একটি লেখা পর্যালোচনা করলে ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু নতুন মন্তব্য ছাড়া আগের লেখাগুলোর তুলনায় আজ আর গুণগতমানের বিচারে বিরাট অর্থপূর্ণ পার্থক্য কিছু হবে বলে মনে হয় না। তবুও লেখাটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে যাওয়ায় এর স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্ব এ কারণেও রয়েছে যে, সেই সময় ঢাকা তথা এই বাংলার অতি প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী মুসলমানদের নেতা বনে যাওয়া নবাবদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের যে বিষয়বস্তু তার মূল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে এক নির্দিষ্ট সময়কালের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার রূপটিও কিছুটা অনুধাবন সম্ভব হতে পারে।

হুসেন 'ধর্ম' কে আখ্যায়িত করেছেন 'নিষেধ' এর সমষ্টি হিসেবে। এই নিষেধ আরোপ করতে হচ্ছে কারণ মানুষ প্রকৃতগভাবে বা তার বৈশিষ্ট্যই হল স্বেচ্ছাচারিতা ও জন্তু ধর্মী।

মানুষের সমষ্টি 'সমাজ' হলেও মানুষের ভেতরে থাকা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজের মধ্যে জন্তুর উচ্ছৃংখলতা, উৎপীড়ন, অনাচার ও অত্যাচার রূপে প্রকাশিত হয়—মানুষের তৈরি সমাজ মানুষই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়।

এবং সমাজকে বাঁচাবার জন্য বিধাতা সমাজপতি, পয়গম্বর, অবতার পাঠিয়ে থাকেন। 'ইসলাম ধর্ম'ও মূলত কতকগুলি নিষেধের অস্ত্র যা দিয়ে সাধনার দ্বারা জন্তুধর্মী মানুষের অনাচার, ব্যভিচার ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বর্তমানে যাঁরা হযরত মুহম্মদের উম্মত বলে পরিচিত তাঁরা হযরত মুহম্মদের নিষেধগুলি মেনে চলছেন না।

কেন মেনে চলছেন না? হুসেনের মতে মানুষের অস্তিত্বে যে জন্তুধর্মিতা বিরাজিত ও প্রকাশিত তা দেশ-কাল ও আর্থিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এক সময়ের 'নিষেধ' পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকখানি অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।

অর্থাৎ রসুলের সময়ে আরবে যে 'নিষেধসমূহ' প্রবর্তিত হয়েছিল তা বাংলাদেশের পরিবর্তিত বাস্তবতায় অনেকখানিই অপ্রযোজ্য হয়ে উঠেছে।

মুসলমানদের যে অতিশয় 'কবর' আসক্তি—তা পৌত্তলিকাতা। দরগাপূজার বিকৃতি এরকম যে দরগায় মাথা ঠুকে জুয়াখেলায় ও ঘোড়দৌড়ে যায়। খোদার নাম

মুখে নিয়ে মদ্যপান করে। অর্থাৎ 'নিষেধ' মুসলমানকে অধঃপতন থেকে ঠেকাতে পারেনি।

প্রথমত, দেশকালের সমস্যা, দ্বিতীয়ত, মুসলমান সমাজ এত কঠোর বি-ধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে এর মধ্যে জন্তুধর্মীর চিত্তের বিবিধ ক্ষুধা নিবারণ করার মত বেশি উপকরণ নাই, সেজন্য মুসলমান চিত্ত আজ অন্য সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। সহস্র বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিধি-পীড়িত মুসলমানদের শুষ্ক নীরস চিত্ত আজ প্রতিবেশীর আনন্দের পানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে—সেটা চিত্তের স্বভাব-ধর্ম।

এই লেখাটিতেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তিনি উত্থাপন করেছেন তা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই লেখায় বরং অভিযোগসমূহ নিতান্তই উলঙ্গ এমনকি বক্তব্য সত্য হলেও উপস্থাপন যেন কিছুটা স্থূল।

'নিরানন্দ নারী হতে বিতৃষ্ণায় চিত্ত আপনা থেকে রুচি-বিলাসী হিন্দু নারীর মধ্যে আপনার খাদ্য অনুসন্ধান করতে ছুটে। সুতরাং আমার মনে হয়, দুটি জিনিস মুসলমানকে হিন্দু নারীর প্রতি প্রতিদিন আকৃষ্ট করে তুলছে—তার কর্মহীন অবকাশ ও বৈচিত্রবঞ্চিত নিরানন্দ চিত্ত।' ইত্যাদি।

হুসেন এখানে ঠিক কতখানি ইতিহাসাশ্রয়ী থাকতে চেয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বৈকি। সাহেব, সাহেবদের হিন্দু সহযোগী, হিন্দু জমিদার, হিন্দু আমলা, হিন্দু দারোগা ইত্যাদি—মুসলমান রমণীতে কখনোই রুচি হয় নি বলে ত মনে হয় না।

আমার কাছে এই লেখাটির প্রধান বাণীটি এরকম মনে হয়েছে, (ক) হযরত মুহম্মদ কর্তৃক আরোপিত 'নিষেধ' আজ অগ্রাহ্য হচ্ছে—যে 'নিষেধ' সমষ্টি হল ইসলাম। কিন্তু দেশ-কাল ও আর্থিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষের যে জন্তুধর্মিতা তা এক সময়ে 'নিষেধ' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও আজকের পরিস্থিতিতে অনেকাংশেই অকার্যকর। তাহলে যা দাঁড়ায় তা হল এর সংস্কার-যুগোপযোগী করে তোলা, (খ) মুসলমান সমাজ এত কঠোর বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে বর্তমানে মানুষের জন্তুধর্মী-চিত্তের ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ এতে থাকায় মুসলমানরা অন্য সমাজের আচার-ব্যবহার অবলম্বনে বাধ্য হচ্ছে।

হুসেনের কাছে সমস্যা আরো আছে। 'ধর্মের জন্য জুলুম করা অনেকটা মুসলমানদের স্বভাবগত হয়ে গেছে, সেকথা বললে সমাজ অতি মাত্রায় চটে উঠবেন।...আজ মুসলমান সমাজে এই অসহিষ্ণুতা চরম হয়ে উঠেছে। মুসলমান ইতিহাস যে ব্যর্থতার ইতিহাসে পূর্ণ, তার কারণে অনেকখানি এই অসহিষ্ণুতা যার জুলুম মুসলমান সমাজে প্রতিভার সৃষ্টির পথে বিরাট বিঘ্ন ঘটিয়েছে।...'

তাহলে দাঁড়াচ্ছে 'ইসলাম' সম্পর্কে হুসেন যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা অসহিষ্ণু-তায় পূর্ণ এবং মুসলমান ইতিহাস হচ্ছে মূলত ব্যর্থতার ইতিহাস।

লেখাটিতে তিনি যেভাবে মুসলমান সমাজকে অভিযুক্ত করেছেন তাতে সমগ্র মুসলিম সমাজই ধিক্কৃত হয়ে গেছে। তিনি সমগ্র সমাজকেই অনেকটা ফৌজদারী

ধারায় অভিযুক্ত করতে পারেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন, এবং এটাও একটা প্রশ্ন যে অন্য ধর্মের সমাজে বিশেষ করে পাশাপাশি হিন্দু ধর্মে কি কোন অভিযুক্ত হওয়ার মতো অপরাধ সংঘটিত হত না? এখানে যে বিষয়টি বেশি বিবেচ্য বলে মনে হয়েছে তা হল ইসলামের সংস্কার ও মুসলমানদের সমগ্র ইতিহাস ব্যর্থতার বলে দাবি করা। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও শিখা গোষ্ঠীর অনেক লেখকই দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়ে সংগত কারণেই উদ্বিগ্ন ছিলেন তবে তাদের মধ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য এবং হুসেন ও ওদুদের চিন্তা প্রকল্প বহুলাংশেই অনেকটা যেন একই পথে অগ্রসর হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

কাজী আবদুল ওদুদ ইসলামের যুগোপযোগী সংস্কার দাবি করেছেন ও ইসলামের ইতিহাসকে ব্যর্থতার ইতিহাস বলে মনে করেছেন। ফলে ইসলামের 'যুগধর্ম সম্মত ব্যবস্থা' নিয়ে তাঁরা উভয়েই লড়াই করেছেন।

ওদুদ বলেছেন, 'ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস।'[১৮]

তিনি মনে করেছেন, 'ইসলামের বিধি-বিধানও মানবসৃষ্ট এবং দেশ-কালের অধীন। চৌদ্দ'শ বছর আগের আরবে যে বিধিব্যবস্থা ছিল মহত্তম, চৌদ্দ'শ বছর পরের বাংলায় জীবনের সমস্যা সমাধানে সেগুলো আর উপযোগী নেই।'... 'সাধারণভাবে বলা যায়, ইসলামের এবং যে কোন ধর্মের অলৌকিক উপাদানের প্রতি তাঁদের সংশয় ও অনাস্থা ছিল এবং ধর্মবিধির চিরন্তনতা অস্বীকার করে সেগুলোকে তাঁরা বিচার করতে চাইতেন যুক্তিবুদ্ধির ও দেশকালের অধীনরূপে।'[১৯]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর লেখকবৃন্দের মধ্যে আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব আবুল হুসেন। তবুও সেই আন্দোলনের মধ্যে আরো অনেকে থাকলেও আবদুল ওদুদ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

লক্ষ্য করা গেছে ইসলাম ও সেই সময়কার বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়ে আবুল হুসেনের উদ্বিগ্নতা ও চিন্তা-চেতনার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজে অন্তত আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়া—যা ছাড়া অন্য কোনভাবেই অন্ধকার থেকে আলোর জগতে তাদের প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এবং এই প্রত্যয়ই বোধকরি হুসেনকে সমাজ বিকাশে পুরনোকালের রচিত ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে অনুপ্রাণিত করে।

বাঙালি শিক্ষিত সমাজে এর কয়েকদশক আগেই অনেকটা এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু হুসেন যে ভাবে সংগঠন, পত্রিকা ও নিজ বক্তব্য প্রচারে অটল থাকার জন্য অসহনীয় অপমানজনক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন সেই পরিস্থিতি অগ্রজ দেলোয়ার হোসেনের (১৮৪০-১৯১৩) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

দেলোয়ার হোসেন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম বাঙালি মুসলিম গ্রাজুয়েট। তিনি নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খাঁন, সৈয়দ আমীর আলী ও সৈয়দ আমির হোসেনের অল্পবিস্তর ফারাকে সমসাময়িক। উল্লেখিত ব্যক্তিরা মুসলিম-অমুসলিম সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত। এদের প্রায় সকলেই মুসলমানদের ইংরেজী

শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া বা কথিত আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষেই ছিলেন। এরা একটা বিশেষ সময়ের প্রতিনিধিও বটে।

৬

দেলোয়ার হোসেন বড় সরকারি চাকুরে ছিলেন। সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। তবুও তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ও প্রয়োজনে ইসলামের যুগোপযোগী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন ও লিখেছেন। দেলোয়ার হোসেনের বক্তব্যের সাথে 'বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় একমত হতে পারেনি এবং তিনি প্রক্রিয়াশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এর পরিণতিতে তিনি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট ও বাংলার পুনঃজাগরণের অগ্রদূত হয়েও মুসলমানদের নিকট বিস্মৃত হন।'...দেলোয়ার হোসেন বহু বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এতটাই গুরুত্ব দেন যে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কলেজ খোলার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত অন্ধ-ধর্মীয় বিধি-বিধান ও অনুশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সময়ের পরিবর্তনের ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট লেখালেখি করেছেন। দেলোয়ার হোসেন ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনও জরুরী বলে মনে করতেন। দেলোয়ার হোসেন বাংলা ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও তিনি নিজে লেখালেখি করেছেন সম্পূর্ণ ইংরেজীতে এবং বাংলা ভাষায় তাঁর কোন লেখা পাওয়া যায় নি। তিনি বাংলার হিন্দু মুসলমান সমাজ ও সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন ছিলেন।[২০]

আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ—চল্লিশের দশক থেকেই একজন সক্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন। অর্থাৎ আবুল হুসেনের ইন্তেকালের পরের অধ্যায়। '৪৭ এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর সক্রিয়তার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন—ভারতের বৃহত্তর জনসমাজের কাছে মুসলমানদের সমস্যার সত্য ব্যাখ্যা করা ও মুসলমানদের কাছে ভারতীয় জনসমাজের বিকাশের সমস্যা ব্যাখ্যা করা। দাঙ্গাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তর্গত সমস্যা হিসেবে। তিনি একদিকে যেমন ইসলামের শাস্ত্রীয় নির্দেশের মূল অর্থ সন্ধান করেছেন, অন্যদিকে মুসলমানদের দ্বারা শাসিত নানা দেশের সংস্কার চেষ্টা সম্পর্কে তথা সাজিয়েছেন—তিনি কয়েকখানি বিখ্যাত বইয়ের লেখক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামবিষয়ক গবেষক ও চিন্তাবিদ।

আসগর মনে করেন, 'কুরান ধর্মীয় বিভিন্নতাকে সমর্থন করেন এবং তা যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষাও করে প্রকারান্তরে তা দেখাই যাচ্ছে।'...

কুরানের বক্তব্য অনুধাবন খুব সহজ নয়, যদি না বিভিন্ন ভাষ্যকার এর ব্যাখ্যানে লিপ্ত থাকতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এর বাণীসমূহ উদঘাটিত হয়েছিল তার ভাষ্য

যদি না জোগাতেন তাঁরা। অনেককিছুই আরবের সেদিনকার সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিরূপিত ছিল। অনেক বাণীই সেই নির্দিষ্ট প্রজাতিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত, ঐশ্বরিক নির্দেশাবলী তন্মুহূর্তে তো বটেই, চিরন্তনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।...কিন্তু এই সব বিধান চিরন্তনভাবে প্রয়োগ করার কথা উঠে না পরিপ্রেক্ষিতের বিচারেই।...এরপর আসগর দেখিয়েছেন কি ভাবে পয়গম্বরের মৃত্যুর কয়েকবছরের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্ধারিত বিধিবিধান (যেমন 'অপরাধ' ও 'শাস্তি') ঠিক একই জায়গায় একইভাবে অবস্থান ও ক্রিয়াশীল থাকতে পারে না। যদি পয়গম্বরের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই এ সব পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে আজ ১৪০০ বছর পরে তাদের পুনঃপ্রবর্তন করার আর প্রয়োজন 'থাকেনা'। শাস্তি প্রসঙ্গে অভিমত হল, 'শাস্তি তো প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায়মাত্র। শাস্তির ধারণা বদলালেও কিন্তু অপরাধ তার সঙ্গে বদলে যাবে না।'[২১]

কুরআন ও আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে আসগর বললেন, 'আধুনিকীকরণের লক্ষ্য এই নয় যে, পবিত্র কুরানের প্রকৃত মূল্যবোধকে খারিজ করতে হবে। এই দিক দিয়ে আধুনিকতার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিকতা কখনোই পশ্চিমি জগতের পুঁজিবাদী সংস্কৃতির সেবনে সংঘটিত হবার নয়। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি অমিত ভোগবাদের নিরিখে অনুপ্রাণিত।

'...কুরান একদিকে যেমন ধনসম্পদের অত্যধিক সঞ্চয়ের ব্যাপারে প্রবল আপত্তি করেন, তেমনি আরেকদিকে অমিত ভোগের ব্যাপারে।...আধুনিকতা সেকুলারিজমের ভেতর দিয়েই ফলবান হয়ে উঠতে পারে প্রাচ্য দেশসমূহে।'[২২]

আসগর ইসলামের সাথে উদারনীতি, গণতন্ত্র, অমুসলমান, হিন্দু-মুসলমান ও স্বাধীনতার পর ভারতীয় মুসলমানের দুর্দশার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছে—অবশ্য একাধিক বই ও প্রবন্ধে। আসগর ভারতে মুসলমানরা যে প্রায়শঃ বিভিন্নভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত ও অপমানিতের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া সংগটিত দাঙ্গা ও বাবরি মসজিদ-সংক্রান্ত বিষয়ে হাজির করেছেন অকাট্য তথ্যসমূহ। তবে একথাও তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন যে, মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার জন্য রক্ষণশীলরা তাদের খাসিলত পরিত্যাগ করেনি। ভাবখানা, খুবই নীচ কাজ হিসেবে যা চিহ্নিত তাতে আপত্তি নেই কিন্তু ধর্মীয় অহমবোধ থাকুক। নির্বোধ ও ক্ষতিকর এই লোকগুলো যা দেখেও দেখেনা তা হল এই ধরনের অর্থনেতিক কাজে জড়িয়ে গেলে বরং তারা অনৈসলামিক কাজই বেশি পছন্দ করে।

কিন্তু তবুও বিচার করতে হবে এসবের ঐতিহাসিক কারণসমূহ ও সার্বিক অবস্থার একটা আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ।

যাহোক, এই নিবন্ধে এতসব অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয় জেনেও কেন কিছু কিছু বিষয়ে প্রাসঙ্গিক করা হল তার একটা ছোট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। এই ব্যাখ্যার প্রধান বিষয় হচ্ছে 'অতীত'।

কেন ভারতের ৫০টা বৃহৎশিল্প ঘরানার মধ্যে একটাও মুসলিম ঘরানা নেই। অন্যদিকে সূচকের একেবারে তলায় অবস্থানকরী বেশিরভাগ মুসলমানই গরিব এবং পশ্চাৎপদ। '...বহু বছর ধরে একটা দমবন্ধ করা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে মুসলমানদের থাকতে হচ্ছে' ইত্যাদি।[২৩] কিন্তু হস্তান্তরের পরও কথিত ধর্মনিরপেক্ষ বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারতে এসব ঘটছে কেন আসগর বলছেন এর কারণ রয়েছে 'অতীতে'। 'হিন্দু এবং মুসলমান ভারতের এই দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্নে অতীত যে কত প্রাসঙ্গিক এর যদি কোনো প্রমাণ দরকার হয়, তাহলে বহু রক্তপাতে কুলষিত রাম জন্মভূমি- বাবরি মসজিদ নিয়ে চলতে থাকা বিবাদ একটা বড় নজির।' (পূর্বোক্ত-পৃ:৫৯)।

আসগর আরো মনে করেছেন, 'The First systematic division brought about between the Hindu and Muslim elities in late nineteenth century India was on Question of linguistic identity.[২৪]

[উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে এই প্রথম উপর তলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাষার সতন্ত্র পরিচয়ের প্রশ্নে পরিকল্পিত বিভাজন ঘটে যায়।]

সম্ভবত আসগরের মনোযোগ উত্তর ভারতের দিকে বেশি থাকায় উল্লেখ্য যে, হিন্দু-উর্দু বিবাদ আসলেই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ভারত বিভাগে সাহায্য করেছিল। তিনি বিশেষভাবে যা উল্লেখ করেন নি তাহলো বাংলা এবং ইংরেজদের রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। শুধু ভাষা নয়, শিক্ষা, চাকরি, বাণিজ্য, ব্রিটিশদের সহযোগী হওয়া, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রথমে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

পলাশী থেকে কলকাতার দূরত্ব বেশি নয়—কলকাতা থেকেই পলাশী। আর সেজন্যই তো ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়নটি প্রকাশ করলেন, অনুপম ভাষায়,

When the sun dipped into the ganges behind the blood-red field of Plassy, on that fateful evening of June, did it symbolize the curtain dropping on the last scene of a tragic drama? ... Today the historian, looking backward over the two centuries that have passed since then, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the like of which the history of the world has not seen elsewhere. On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age hegan... Education, lierature, society, religion, man's hand work and political life, all felt the revivifying touch ot the new impetus from the west...

In this new Bengal originated every good and great thing of the modern world that passed on to the other provinces of India. From Bengal went forth the English educated teachers and the Europe-innspired thought that helped to modenise Bihar and Orissa, Hindustan and Deccan.

ঘোষণা করা হল, It was truly a Renaissance...[২৫]

[পলাশীর রক্তাক্ত যুদ্ধের ময়দান পিছনে ফেলে সূর্য যখন গঙ্গায় অস্ত গেল সেই সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটল এবং আধুনিক যুগের শুরু হল;
—আজো দু'শো বছর পর এটা পরিষ্কার শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, মানুষের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক জীবন—সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করেছে, এক পুনরুজ্জীবনের স্পর্শ যা বেগবান হয়েছে পশ্চিম থেকে।
এই নতুন বাংলা আধুনিক বিশ্বের প্রত্যেকটি ভালো এবং মহান যা কিছু তা ধারণ করেছে ও ছড়িয়ে দিয়েছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। এই বাংলা থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকরা তাদের ইউরোপ অনুপ্রাণিত ধ্যান-ধারণা—যা তাদের সাহায্য করে বিহার, উড়িষ্যা, হিন্দুস্তান এবং দক্ষিণকে আধুনিকায়ন করতে।
ঘোষণা করা হল, [এ ছিল সত্যিকার অর্থেই রেনেসাঁ... ।]

এখন আমি আরেকটি অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। তবে তার আগে একটা সূত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সেটা হল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ,' *শিখা* ও হুসেন পর্বটি এখন থেকে ৭৫ বছরেরও বেশি সময়ের আগের। আর A Gentleman of wide reading studious habits, and starling work holic, quite and unobstrussive in nature, he is respected by all classes of people.[২৬]

[একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক যার ছিল কঠোর পরিশ্রমী পাঠাভ্যাস—চমকপ্রদ কর্ম নিষ্ঠা, এবং তিনি ছিলেন একেবারেই প্রচারবিমুখ প্রকৃতির।]

অর্থাৎ দেলোয়ার হোসেনের সময় হুসেনদের কার্যক্রমের সময়কাল থেকে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের। আর গত পঞ্চাশ বছরের ব্যাপ্তিতে সক্রিয় কর্মী সংগঠক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ও একজন ঐতিহাসিক হিসেবে আজো বর্তমান আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার। তার শেষ লেখা পড়েছি ২০০২ এ। 'প্রসঙ্গ গুজরাত গণহত্যা' সংকলনে প্রকাশিত, 'না, গুজরাটের সব শেষ হয়ে যায় নি।' আমার পড়া আসগরের শেষ লেখাটি হল ভারত ইতিহাসের সব থেকে নির্মম ও ভয়াবহ ধর্মীয় সম্প্রদায়গত গণহত্যার উপর।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে অধ্যায়টি এইভাবে সাজানো যায়, একশত পঁচিশ বছরের (কমবেশী) সময় সীমায় আমরা হুসেন ও তাঁদের সংগ্রামকে বুঝবার সুবিধের জন্য তাঁদের আগের ও পরের দু'জনকে দুই পর্বে বেছে নিলাম—যা দুটি অধ্যায়ের সাথে যুক্ত। দু'জনই ইসলামের সংস্কার দাবি করেছেন। অথচ আসগর পর্বে আসগর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে গভীরে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন ও তথ্যনির্ভরতার ভিত্তিতে জটিল সমস্যাসমূহের একটা সুসংগত ব্যাখ্যা হাজির করে সম্ভাব্য সমাধানের দিকনির্দেশনা দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গে স্থাপিত হয় ১৯২১ সালে। হুসেন ও ওদুদ একেবারে প্রথম পর্বেই এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। ১৯২৫ সালে হুসেনের *বাংলার বলশী*, ১৯২৭ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ,' সমাজের পত্রিকা *শিখা* এবং একটি আন্দোলনের শুরু—আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বল ঘটনা।

কিন্তু এর পূর্বাপর রয়েছে।

হুসেনদের সংগঠন, পত্রিকা, লেখালেকি—সবটা মিলিয়ে যা একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন তার যথার্থ অনুধাবনের জন্যেই 'ধারাবাহিকতা' অনুসরণ অপরিহার্য। অর্থাৎ একটা শুরুর পর্ব আছে সেটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনায় আসবে এবং হুসেনদের আন্দোলনের বিষয়গুলি যেহেতু আজো অতি একান্তই প্রাসঙ্গিক সেহেতু যতদূর পরবর্তীতে আসা সম্ভব সে বিষয়ে চেষ্টা-করা বিশেষ করে এটা বুঝতে অনুসন্ধান যে, হুসেন প্রত্যাশিত 'আধুনিক শিক্ষা'র আয়োজন অন্তত গুরুত্ব দেবার মতো ব্যাপক পরিমাণগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রকৃত পশ্চাৎপদতা কেন এত ব্যাপক, গভীর ও আশঙ্কাজনক।

যদুনাথ সরকার প্রায় দুইশত বছরের 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতার' একটা ন্যায্যতা দান করেছেন—একটা ঐতিহাসিক সূত্রায়ন খাড়া করে পুরো ঔপনিবেশিক শাসনকে কার্যত একটা বৈধতা দান করেছেন—তিনি তাঁর পূর্বসূরিরা যে সঠিক কাজটিই করেছিলেন তার পক্ষে দাঁড়ানো যে 'একটা কর্তব্য' এটা বুঝিয়ে গেছেন। ইতিহাসের তত্ত্বায়ন।

ব্রিটিশ দখলদাররা ভালোই বুঝিয়েছিল তারা 'ভারত দখল করেনি ভারতকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে উদ্ধার করেছে মাত্র।' এই প্রচারের প্রসার যেমন 'দখল' জায়েজ করার সব থেকে বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল তেমনি ভারতে তাদের এই মহান বাণী সাদরে বরণ করে নেবার জন্য দরকার ছিল উপযুক্ত অনুসারী ও সহযোগীদের। এবং তা সহজেই জুটে গেল। হিন্দুদের মধ্য থেকেই দ্রুত গড়ে উঠল এক শক্তিশালী গোষ্ঠী—সৃষ্টি হল একটা আমলা মুৎসুদ্দী শ্রেণি এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক জমিদার শ্রেণি। আর একশত বছরের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে মুসলমানরা বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন-সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রাম চালালেন। আর ঠিক এই পর্বেই মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার যুগ আর হিন্দুরা গেল এগিয়ে। এগিয়ে যাওয়া হিন্দুরা একটা 'উপরতলা' গড়ে তুলতে পারল এরা 'শিক্ষিত' ও 'বড়লোক'। পরে দেখা গেল 'শিক্ষা'ও কাজে লাগছে বড়লোক হওয়া ও ওপরতলায় ওঠার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে।

মহানুভব ব্রিটিশরাজ ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে ভারতকে 'আধুনিক' করে ইতিহাসের দায় পালন করে চলেছে, ভারতকে আলোকিত করে চলেছে—তা গৃহীত হল এমনকি একুশদশক পর্যন্ত এই 'বয়ান' বহাল আছে।

ইংরেজরা ধর্মপ্রচার ও শাসন কাজের জন্য বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা গদ্যের উপর গুরুত্ব দিলেন। ইংরেজি ভাষার আধিপত্যে একটা বাংলা গদ্য তাদের ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠতে থাকল। শোষণের জন্য শাসন এবং শাসনের জন্য ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান—Rule of knowledge project. রাজকার্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ফারসিকে হটিয়ে দিল এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল এবং আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা হিন্দুরা দ্রুতই বুঝে গেল শিক্ষা তাদের জ্ঞান, অর্থ ও প্রতিপত্তি যোগাবে।

সাহেবদের আনুকূল্যে বাংলা গদ্যের যে আকার খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে তোলা হয় তাতে সংস্কৃতিনির্ভর হিন্দু সাম্প্রদায়িক আধিপত্য নতুন ছাপাখানার দৌলতে এমন গেড়ে বসে, যেন কারো মনেই থাকল না, এই সেদিনও ফারসি না জানলে তাকে কেউ গ্রাহ্য করতে না।...১৯ শতক জুড়ে বাংলা ভাষার উপর হিন্দু আধিপত্য যে শিকড়-বাকড় চারিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে আমরা ভাবিও নি, উদ্বেগও বোধ করিনি।[২৭]

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের 'সন্দেহ' কয়েক দশকের জন্য স্থায়ী 'অবিশ্বাস' নীতিতে পরিণত হল। হিন্দুরা ফিরে গেল ব্রিটিশ প্রচারিত মুসলমান কর্তৃক ধ্বংস করে দেয়া তাদের কথিত হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য উদ্ধারের জন্য 'মূলত: একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি' গড়ে তোলার কাজে। এটা পিছনের দিকে ফেরা নয়—এটা বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে ইতিহাস পুনর্গঠন করার কাজ। এটাতো সাম্প্রদায়িকতার আবহ ও পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া সম্ভব ছিল না।

'মুসলমান শাসকদের অত্যাচারী শাসক ও শোষক প্রমাণ করা ঔপনিবেশিক ইতিহাসবেত্তারা তাদের অবশ্য কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন, কারণ তাতে ব্রিটিশ শাসনের সুবিচার এবং ন্যায়ের সুনাম সমুজ্জ্বল হয়।' ...' ভারতীয় লেখকরা বিদেশি ঐতিহাসিকদের তথ্য ও বিশ্লেষণকে স্থানে স্থানে অস্বীকার করলেও উনিশ শতকে আমাদের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি যে মূলত ইয়োরোপ থেকেই গৃহীত ছিল একথা তর্কের অতীত।'...'হিন্দু গৌরবের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে ইংরেজ ইতিহাসবিদদের উদ্দেশ্যের একটা সাযুজ্য ছিল।'[২৮]

বিশেষ করে বাংলার কথিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দু এলিটদের শরিকানায় অগ্রসরমান। পরিণামে 'শিক্ষা-সংস্কৃতি' ঔপনিবেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার আধিপত্যে। আর এই নিবন্ধে ঘুরে ফিরে তো আমাদের 'আধুনিক হওয়া' ও তার মূলে 'আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি'র উৎপত্তি, বিকাশ, অগ্রগতি ও পরিণতি-বিষয়ক একটা ইতিহাস-দর্শনের ভেতরেই যাতায়াত।

জ্ঞানের উপর ইউরোপীয় আধিপত্যের প্রভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী রূপ নেয়। আজকাল উপনিবেশবাদ বা উত্তর-উপনিবেশবাদের চিন্তাবিদরা প্রায়ই বলে থাকেন যে 'জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অদৃশ্য কর্তৃত্বই ভারতীয়দের মানসিক পরাধীনতার মূল কারণ।'[২৯]

প্রথমত এই ধরনের ইতিহাস চেতনা যদি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বহাল থাকে যে, রাজত্ব চলে যাওয়া, ইংরেজদের বিরুদ্ধতা করা ও মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি আঁকড়ে থাকার কারণে মুসলমানরা 'আধুনিক ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির' প্রতি চরম উপেক্ষা ও বিরূপতা প্রদর্শন করে নিজেদের অধঃপতিত করেছে তবে তা 'তথ্য' ও 'সত্যে'র আংশিক চিত্র তুলে ধরে মাত্র। এই 'চালু ধারণা'তে সত্য আছে বটে তবে উদ্দেশ্যমূলক গালগল্প দিয়ে প্রকৃত সত্য ও ঘটনাসমূহের বিরাট অংশকে আড়াল করার কারসাজিও আছে। যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের দাবি পূরণে সাহায্য করলেও পরে ঝামেলা বাড়ে ছাড়া কমে না।

'ভারতবর্ষে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান আগ্রাসনের উত্তরে তাদের প্রতি ও তাদের প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিমুখতা স্বাভাবিক। একই সঙ্গে দেখা যায় যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের মানুষ আধুনিক শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত থাকে। পরিণামে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী উভয় বর্গের মুসলমান সামগ্রিকভাবে আধুনিক শিক্ষার জগৎ থেকে বহু দূরে পড়ে যায় আর এগিয়ে যায় হিন্দু সম্প্রদায়, সৃষ্টি হয় আধুনিকতায় আলোকিত হিন্দু ও আধুনিকতা থেকে নির্বাসিত মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

'এটা বলা ভুল হবে যে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় এই নির্বাসনদণ্ড নিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষাদানের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব সেই হিন্দু কলেজে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এটা উল্লেখযোগ্য যে শুধু মুসলমানরাই আধুনিক শিক্ষার প্রতি বিমুখ ছিলেন না, তাদের মুখের উপর আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ... বাংলার মুসলমানদের সামনে আধুনিক শিক্ষার জন্য হাজী মহম্মদ মহসীনের উদ্যোগে হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানেও হিন্দু প্রভাব ও প্রাধান্যই ছিল।'[৩০]

১৮৯৬ সালে কলিকাতার প্রভাবশালী ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তি হতে পারেনি, কারণ সেখানে মুসলমান মেয়েদের পড়ার অধিকার ছিল না।[৩১]

অথচ দেখা যাচ্ছে নবাব আবদুল লতিফের বিশেষ চেষ্টায় ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তিরত হয়। (ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতক*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৮), ধর্মমত নির্বিশেষ সকল সম্প্রদায়ের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবদুল লতিফ ও তার মুসলমান বন্ধুগণ নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। (সুরজিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১)।

'উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা-সংস্কারের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কারকরা enlightenment-এর আদর্শে আস্থাবান হলেও ঔপনিবেশিক শাসনের নায্যতা বা ঔপনিবেশিক শাসনের মতাদর্শের প্রতি কখনোই সন্দেহ পোষণ করেন নি। বরঞ্চ বারে বারে আস্থা প্রকাশ করেছেন। রাজদণ্ডের ভয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না এ যুক্তি অবান্তর। রামমোহন,

রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, লালবিহারী দে, কেশব সেন সকলেই শুধু যে রাজানুগত্য প্রকাশ করেছেন তাই নয়, তাঁরা বিশ্বাস করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। যদিও গ্রান্ট, মেকলে ইত্যাদি শাসকশ্রেণির প্রতিভূরা ঔপনিবেশিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন গোপনীয়তার আশ্রয় নেননি।...উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা-সংস্কার মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের মতাদর্শকেই জোরদার করেছে। বাঙালি ভদ্রলোক ঔপনিবেশিক শাসকের মতাদর্শের ছত্রছায়ায় নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করার চেষ্টা করেছে মাত্র।...সব চাইতে বড় কথা ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরেজি না জানাদের মধ্যে যে দুস্তর মানসিক ও সামাজিক ব্যবধান তৈরি হয়েছে তার বিষম ফল বংশ-পরম্পরায় আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আর এর জন্য গ্রান্ট-মেকলে এবং আমাদের 'নবজাগরণের' পুরোধারা সমান দায়ী।....বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।...বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রসারে শিক্ষা ও আধুনিক বাংলা ভাষার এক বিরাট ভূমিকা ছিল।'[৩২]

আবুল হুসেনের কাছে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে বিরাজমান সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কোন সন্দেহ ছিল বলে মনে হয় না। হুসেনের প্রস্তাবিত পাঠ্যতালিকার অংশবিশেষ নিয়ে আগেই আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি তিনি বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলে 'আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষ—রানা প্রতাপের মুসলিম নিধন—অন্ধকূপ হত্যা ইত্যাদি' নব Curriculum থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে চেয়েছেন। ধরে নিতে হবে কয়েকদশক ধরে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই সব মিথ্যা কাহিনী পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকায় হিন্দু ছেলেমেয়েদের কথিত আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমেই স্বতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এবং হুসেনের সময়কালের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গ সমাজের 'সমাজ' বলতে যদি অনুগ্রহ করে কৃষকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে অনস্বীকার্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একবারে তৃণমূল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিম ব্যাপারটা আগেই বুঝেছিলেন কিন্তু তিনি, 'আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।' তিনি ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যবস্থার প্রতি অনুগত থাকার পরামর্শ দেন এবং হুশিয়ার করে দেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হলে বাংলাদেশ ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।[৩৩]

৮

মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের সমাজের উচ্চবর্গ থেকে আগ্রহ প্রসঙ্গে আগে কিছুটা ইংগিত দেয়া হয়েছে।

উনিশ শতকের ৭০-৮০ দশক থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এক্ষেত্রে উত্তর ভারত ও বঙ্গ সমাজের চাহিদা ও চেহারা হুবহু একরকম ছিল না। তাছাড়া

ঐতিহাসিক ঘটনা ও উদ্যোগী পুরুষ বা প্রকৃত নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণে সমস্যার জটিলতা বুঝতে সাহায্য করবে ঠিকই কিন্তু এই নিবন্ধে একটা অসংলগ্ন কালপঞ্জী ধরনের বিবরণ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। উত্তর ভারতে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে উর্দু, ফারসি ও ইংরেজীকে নিয়ে আধুনিক শিক্ষা চালুর আন্দোলন যতটা একমুখী হতে পারতো বঙ্গে সেটা না হতে পারার কারণ অনেকটা এরকম যে, মক্তব-মাদ্রাসাকে বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষাপ্রসারে প্রধান ধারা বহাল ও বৃদ্ধির সাথে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হল। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার ভেতর ইংরেজি ঢুকিয়ে দেয়ার প্রস্তাবকে বেশ একটা অগ্রগতি মনে করা হতে থাকল। বাংলা অবহেলিতই রইল। আশরাফ উচ্চবর্গীয় মুসলমানরা সুন্নী বাঙালি আতরাফ মুসলমানদের প্রতি শুধু যে অনুদার ভূমিকা পালন করেছিলেন তাই নয় অনেকটা বিরূপতা অন্তত শিক্ষা ও অর্থনীতির ব্যাপারে প্রকট ছিল।

কৃষক অধ্যুষিত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দুর্দশার জন্য উচ্চবর্গের মুসলমানদের অবজ্ঞা ও শোষণ যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। এটা ঠিক যে, দিন গড়ানোর সাথে সাথে একটা মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠার শর্তসমূহ অবস্থা বদলের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ আকারে যত ছোটই হোক না কেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা, সরকারি আনুকূল্য, চাকরি অথবা অর্থ সমাগমের অন্য ব্যবস্থা না থাকলে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

সিপাহী অভ্যুত্থানের পর আধুনিকতার সঙ্গে—এবং ইংরেজ শাসনের সঙ্গে—মুসলমানের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা চলল। উত্তর-ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে নবাব আব্দুল লতিফ এই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। মুসলমানের এই পুনর্জাগরণের মুহূর্তে অগ্রসর হিন্দু আর অনগ্রসর মুসলমানের বাস্তব অবস্থার পার্থক্য, তার সঙ্গে উভয় পক্ষে নানারকম মানসিক কারণ যুক্ত হয়ে তাদের যাত্রাপথ পৃথক করে দিল।[৩৪]

প্রথম থেকেই মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা পরিহার করেছিলেন ধরে নিয়ে নানাবিধ কারণ দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু আনিসুজ্জামানের মতে, মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন—এ কথা প্রমাণ করা দুস্কর। ১৮৭০-এর শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটায় মুসলমানের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করা সহজ হয় এবং তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।[৩৫]

তবে The overwhelming Muslim majority districts of East and North Bengal did not receive the much needed attention of the Government till very late. (আনিসুজ্জামান কর্তৃক ড. মল্লিক থেকে উদ্ধৃত)।

> [পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জেলাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় যে গুরুত্ব তা সরকার একেবারেই শেষ মুহূর্তের আগে কখনো দেননি।]

আব্দুল লতিফ, কেরামত আলী জৌনপুরী, সৈয়দ আমীর আলী, সৈয়দ আমীর হোসেন, স্যার সৈয়দ আহমদ ইত্যাদির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদের কর্ম প্রচেষ্টাও বাস্তব সুযোগ-সুবিধার যোগে বাঙালি মুসলমানেরা আধুনিক শিক্ষা লাভে অগ্রসর হল।

বাস্তব সুযোগ-সুবিধা ছিল মূলত বাংলাদেশে পাটচাষ বৃদ্ধি ও পাটচাষ থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের হাতে যে নগদ পয়সা এসেছিল তা দিয়ে তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন, কেননা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই আধুনিক শিক্ষার দ্বার মুসলমানের পক্ষে রুদ্ধ ছিল।[৩৬]

এই যুক্তিটি পুরো ধারণার প্রক্রিয়ার উপর কতখানি প্রাধান্যে আসা উচিত লেখক তার ব্যাখ্যা দেননি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের অনগ্রসরতা সম্পর্কে সচেতন হবার ফলে মুসলমান নেতারা এ বিষয়ে যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তা বৃথা যায় নি। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সরকার এদিকে গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হলেন। ১৮৭১ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে যে-কটি সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার সবকটিতেই মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছিল।...

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সরকার সর্বত্রই মুসলমানের আনুকূল্য করতে চাইলেন। ১৮৮৫'র শিক্ষা প্রস্তাবে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয় যে, সরকরি চাকরির ক্ষেত্রে অনগ্রসর বলে মুসলমানেরা কোন বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করতে পারে না। লেখাপড়া শিখে হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই তারা ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট চাকরির অংশীভাগী হতে পারে মাত্র। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি প্রার্থী মুসলমান তাই হিন্দুকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য করল।[৩৭]

English education in India in nineteenth century was not nearly a means to acquire knowledge, or to develop one's moral and intellectual faculties. It was the key to government employment and a passport to literate professions. In Bengal the earliest beneficiaries of the system were mostly the high-Caste Hindus, who recognized the material advantages that it offered and flocked to the new institutions eager to grasp the new opportunities opened up by colonial rule...The Muslim lagged far behind. The movement in favour of western education started among them very late in the nineteenth century. By then a sizeable English-educated Hindu middle class had already developed. Hence the anxiety of the Muslim elite and their efforts to extracts at least some concessions from the government to counter balance the advantages gained by the educated Hindus. The growing rivalry between the two communities was further aggravated by all this.[৩৮]

[উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল জ্ঞান অর্জন বা আত্মশক্তির বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য নয়। সরকারি চাকরির জন্য এ ছিল চাবিকাঠি এবং শিক্ষাভিত্তিক পেশা জগতে প্রবেশের পাসপোর্ট। বঙ্গদেশে প্রথম থেকেই এই সুবিধা ভোগ করেছে প্রধানত উঁচুজাতের হিন্দুরা। যারা প্রথমেই বুঝে গিয়েছিল বস্তুগত সুবিধার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচিত করে দেয় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। এই সুবিধাদি গ্রহণে দলে দলে সেই দিকে ধাবিত হল।...

মুসলমানেরা পিছিয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন শুরু হলো উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা বড় ধরনের অবয়ব ধারণ করেছে এবং এক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় উদ্বিগ্ন উপরতলার মুসলিমরা চেষ্টা চালানো শুরু করে ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধে পেতে যাতে করে হিন্দুরা শিক্ষার মাধ্যমে যে সুবিধে গ্রহণ করেছে তার একটা পাল্টা ভারসাম্যের অবস্থার সৃষ্টি করা যায়।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা/প্রতিযোগিতা এইসব ঘটনার ফলে অবস্থার আরো তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে।]

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া শুরু হলেও শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যেই মতপার্থক্য ছিল। স্পষ্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিষয়টি সাধারণ তুচ্ছ কোন মতপার্থক্য ছিল না। But among the Muslims themselves there was a wide divergence of opinion on the subject of their education. ...It was indeed unfortunate that the two champions of Mahammedan education in Bengal, Nawab Abdul Latif and Syed Amir Ali, could not evolve on entente cordial for the achievement of one and the same purpose. VIZ, the cultural and educationl regeneration of their co-religionists. .. It was also unfortuante that is the sphere of Muslim mass education the wishes and grievances of the millions of Bengali speaking Muslim belonging for the most part ot the cultivating clases, were represented by an elite minority who were in Bengal but refused to be a part of it.[৩৯]

> [কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই বড় ধরনের মতভিন্নতা ছিল। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক, বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে প্রধান দু'জন, নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী একই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতার কোনো পথ বের করতে পারেন নি—অর্থাৎ সমধর্মের জন্য সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণ।...এটা আরো দুভার্গ্যজনক গণশিক্ষার প্রশ্নে যে তাগিদ ও ক্ষোভ জনসাধারণের স্তরে দেখা দেয় এবং যার প্রধান অংশই হলো কৃষকশ্রেণী তার প্রতি উচ্চশ্রেণীর মুষ্ঠিমেয় নেতারা কোন গুরুত্বই আরোপ করেন

নি। এবং এই ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বাংলা মুল্লুকে বাস করেও গরিব আম-জনতার সঙ্গে একাত্ম হতে চাননি।]

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের বাস্তবতা ও তাগিদ থাকলেও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে সাথে মুসলমানদের জন্য নতুন পাঠ্যতালিকার ভিত্তিতে পাঠক্রম চালু করার পথে নানাবিধ সমস্যা অতিক্রম করার প্রশ্নটি হুসেনদের সময় ও তার পরবর্তীতেও যথাযথভাবে সমাধান হয় নি তাতো একুশ শতাব্দীতে এসেও আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সেই বিতর্ককালীন সময়ে দেখা গেল, There were othe problems to be faced, notably the language problem, and old and difficult one, অন্তত পক্ষে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষা। Some Muslims would also wish to learn Arabic, the language of their religion. Abdul Latif put his point forcibly : unless a Muhammedan is a Persian and Arabic scholar, he can not attain a respectabale position in Muahomedan society i.e., he will not be regarded or respected as a scholar, and unles he has such a position, he can have no influence in Mahomedan communty.[৪০]

[আরো সব সমস্যা ছিল যার মুকাবিলা প্রয়োজন ছিল বিশেষত ভাষা সমস্যা—যা পুরনো এবং জটিল।
কিছু মুসলমান ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। আব্দুল লতিফ তাঁর যুক্তি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে পেশ করেন, যতক্ষণ একজন মহামেডান ফারসি এবং আরবি ভাষা সম্পর্কে সুপণ্ডিত না হবেন তিনি মুসলমান সমাজে কোন সম্মানজনক অবস্থানে যেতে পারবেন না—মুসলমান সমাজের উপর তাঁর কোন প্রভাবই পড়বে না।]

এখানেই ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হয় নি—আবদুল লতিফের অসামান্য অবদান সত্ত্বেও তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও উচ্চবর্গীয় একজন প্রধান মুসলমান নেতার অন্যায্য অহংবোধ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের চরম বিপদে ফেলেছিল। এই ধরনের মুসলিম নেতারা আরবি, ফারসি ও উর্দু ছাড়া নিজেদের পরিচয় অসম্পূর্ণ মনে করতেন—তাঁদের আভিজাত্য খোয়া যেত। এরা পরিবারে নিয়মিত ভাষা হিসেবে উর্দু চর্চা করতেন। বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বলে মনে হয় না।

প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত একেতো মোল্লাতন্ত্রের দাপট তার উপর যুগনির্দেশিত শিক্ষিত একটি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠার পথে আবদুল লতিফ এর মতো নেতাদের রক্ষণশীল অবস্থান সংগত কারণেই পরবর্তীতে আবুল হুসেন, ওদুদ ও তাদের বন্ধুদের প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করতেই পারে।

৯

১৮৯০ এর দশক থেকে শিক্ষা এবং চাকরিবাকরি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সচেতনতা দেখা দিতে আরম্ভ করলেও যা বিস্ময়ের কারণ তা হলো : সমাজের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মুসলমানরা সাধারণ শিক্ষার বদলে তখনো দাবি করেছেন মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা অর্থাৎ ইসলামি শিক্ষা।...

মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি বিশ শতকের প্রথম দিকে হয় নি।...আর যদিও বা কেউ সচেতন হয়ে থাকেন, তাহলে শহরে স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা নেওয়ার মতো সঙ্গতি তাদের ছিল না। (উল্লেখ্য সুফিয়া আহমেদও মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধার প্রসংগটি আলোচনা করেছেন।)...তদুপরি তাঁদের মধ্যে অনেকেই পিছিয়ে থাকার আত্মঘাতী অবস্থান নিয়েছিলেন। যেমন তাঁরা সহজেই বাংলা ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকার করতে চাননি অথবা বাংলা পড়তেও চান নি। এমন কি ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁরা তখনো তার বিরোধিতা করেছেন। শহরের অবাঙালি মুসলমানরাই যদি তার বিরোধিতা করতেন, তাহলে তার মান বোঝা যেত। কিন্তু যা বিস্ময়ের ব্যাপার তাহলো : ফজলুল হকের মতো বাংলাভাষী মুসলমান নেতারাও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরোধিতা করেছেন। ১৯২২ সালে ব্যবস্থাপক সভায় ফজলুল হক বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২৬ সালে ব্যবস্থাপক সভায় ফজলুল হক বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২৬ সালে ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষাবিদ স্যার আব্দুর রহিমও একই ভাবে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরোধিতা করেন।[৪১]

প্রভূত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানরা কথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চলছিলেন তারই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগ।[৪২]

মুসলমান লেখকেরা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের দ্বারা সংগত কারণেই প্রভাবিত হন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ অনেকের রচনায় স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হলেও ইসলামের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ ও হিন্দু লেখক কর্তৃক মুসলমনাদের হেয় করা ও প্রচুর অনৈতিহাসিক হিন্দু গৌরব কাহিনীর কয়েক দশকের যন্ত্রণা মুসলমান লেখকদের একটা ইসলামি অবস্থান গ্রহণ, মুসলমানদের গৌরব ও হিন্দুদের দীর্ঘদিনের মিথ্যা প্রচারণার জবাবে অনুপ্রাণিত করে।

যে সময়ে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, সেটা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের যুগ। হিন্দু ঐতিহ্যগর্বের একটা ফল দেখা দিয়েছিল মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব উদ্বোধনে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছিল মুসলমান সমাজে।

হিন্দু লেখকদের রচনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধী স্মৃতির চর্চা করা হয়েছিল। মুসলমান লেখকরাও তার জবাব দিয়েছিলেন। সম্পর্কের তিক্ততা এতে বৃদ্ধি পায়।...

বাঙালি মুসলমানের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হলো তার সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুভূতি। এক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুসলমান লেখকদের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। আমাদের সমাজে আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা সমাজের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। মাতৃভাষা সম্পর্কে ক্রমেই তাঁরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাও স্মরণীয়।[৪৩]

মুসলিম অভিজাত শ্রেণির বাংলাভাষার প্রতি বিরূপতা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা জানতেন ইংরেজি ও বাংলা রাজভাষা হওয়ায় তার বৈষয়িকমূল্য বা বাজারদর এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাকে আর এড়ানো যাবে না। হুসেন এই চাকরি করার জন্য ইংরেজি শিক্ষাকে সুনজরে দেখেননি। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পুরো জীবনধারা পরিবর্তন করার জন্যই ইংরেজি শিক্ষার জন্য লড়েছেন। তাছাড়া মুসলিম অভিজাত আশরাফদের ধর্মভাষণ নিম্নশ্রেণীর বাঙালি মুসলমানদের কাণ্ডজ্ঞানরহিত করে রাখার জন্য তেমন আর কার্যকর থাকতে পারে না। জীবন ও জীবিকা নিচু শ্রেণির মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পরও মুসলমান রক্ষণশীল সমাজপতিরা সমাজের উপর জোর করেই চাপিয়ে দিচ্ছিলেন কিছুটা পালিশ করে হলেও সেই মাদ্রাসা শিক্ষা। এই অচলায়তন ভাঙবার দরকার অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। চাকরির প্রয়োজনের সাথে সাথে সাহিত্যের প্রয়োজনেও বাংলা ভাষায় মুসলমানরা সাহিত্য চর্চা শুরু করে। পুস্তক লেখার সাথে সাথে পত্রিকা চালু হল। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য চর্চার প্রথমদিকের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য লেখক নিঃসন্দেহে মীর মশাররফ হোসেন। বড় জোতদার পরিবারের হলেও তিনি সাহিত্য চর্চায় নিজেদের পরিবারের গণ্ডী অনেকাংশেই অতিক্রম করেন। গদ্যে তিনিই মুসলমান লেখকদের মধ্যে পথিকৃৎ সম্রাট। পদ্যে যেমন কায়কোবাদ।

বাঙালি মুসলমান লেখকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে দেখা যায় এনট্রান্স পাস করেছেন অথবা এনট্রান্স পাস পর্যন্ত পড়েছেন এমন লেখকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।...যাদের 'প্রধান' লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাঁদের কুল-বৃত্তি-শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণাচিত্র পেশ করা হয়েছে। (পুরো চিত্র ও তালিকা দেয়া সম্ভব নয় বিধায় এখানে আংশিক চিত্র ও তালিকা দেয়া হল)।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), ইংরেজি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। বড় জোতদার জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার। কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন, পোস্ট মাস্টার। মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন, শিক্ষক। মোহাম্মদ নজিবর, নর্মাল পাস, শিক্ষক।

মুন্সী মেহেরুল্লা, পাঠশালা পর্যন্ত অধ্যয়ন, দর্জি ও ধর্মপ্রচারক। নওশের আলী খান (১৮৬৪-১৯২৪) এফএ পাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন, জমিদার, সাবরেজিস্ট্রার। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), এন্ট্রান্স পাস ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন, শিক্ষক ও কেরানি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), মাদ্রাসা পাস, শিক্ষক, সংবাদিক ও ধর্মপ্রচারক। সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬), এনট্রান্স পাস ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), গৃহশিক্ষা, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। কাজী ইমদাদুল হক, বিএ পাস ও এমএ পর্যন্ত অধ্যয়ন।[৪৪]

আমি তালিকা থেকে কয়েকজনের নাম বাদ দিয়েছি—কারণ এখানে শুধু নমুনা হিসেবে মূল চিত্রটি হাজির রাখার জন্যই তালিকাটির সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে মূল তালিকায় লুৎফর রহমানের নাম নেই, থাকা খুবই দরকার ছিল।

বাংলার তৎকালীন মুসলিম লেখকরা তাঁদের শিক্ষা ও সমাজজীবনের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত-ছিলেন কিন্তু নিজেদের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও নিদারুণ সঙ্কটে জর্জরিত নিজ সম্প্রদায় ও সমাজের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রত্যক্ষ করেও তাঁরা নিজেদের সমাজকেই রক্ষা করতে দাঁড়ালেন।

বাংলার লেখকগণ সমাজের সাধারণ শ্রেণির মধ্যে থেকে সমাজের এই দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁরা সমাজকে রক্ষা করাই প্রথম কর্তব্য মনে করেছিলেন। (ওয়াকিল, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৩)। এবং লেখালেখির ক্ষেত্রে পূর্বসূরি হিসেবে হিন্দু লেখকদের অনুসরণ করেছেন বেশ সময় ধরে। কিন্তু তবুও বাঙালি মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি উচ্চতর সাহিত্যিক মানদণ্ডে উপস্থিত না করতে পারলেও এই সব মুসলিম সাহিত্যিকরাই পরবর্তীকালের বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়গত শিক্ষক ছিলেন, তাছাড়া মুসলমান সমাজের চরিত্ররা হিন্দু দাবড়ানির বাইরে কিছুটা হলেও নিজেদের প্রকাশ করতে পেরেছে এটা মোটেও কম কথা নয়। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে অমুসলমান সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে।... বাংলার নবজাগৃতি রূপ নিল হিন্দু পুনর্জাগরণের।[৪৫]

এই পুনর্জাগরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় মুসলমানেরা। মধ্যযুগের হিন্দুদের প্রধানত কল্পিত অধোগতির জন্য মুসলমানদেরকেই দায়ী করা হলো। হিন্দু লেখকদের এই ধরনের রচনা নিয়ে মুসলমানদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ... বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশ দত্ত-ভূদেব মুখোপাধ্যায় কেবল নন, *নীলদর্পণ*-কার দীনবন্ধু মিত্রও মুসলমানের ক্ষোভের কারণ ছিলেন তাঁর 'জামাই বারিক' রচনার জন্য। অথচ দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা সহজ নয়। এইভাবে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের ছায়াপাত করল। কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কখনোবা পরিবেশের প্রভাবে। এর সঙ্গে ধর্মপ্রচারকদের প্রচার আর আধু-

নিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাবাহীদের ঐতিহ্যগর্ব মিশ্রিত হল। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল।[৪৬]

দু'চারজন লেখক ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বড় বেশি আর কেউ বলেন নি। যাঁরা বলেছিলেন, তাদের কণ্ঠস্বর খুব প্রবল ছিল না।...এই সময় স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়টিও খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। ... কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থার বদল হয়েছে। সিরাজী, ইমদাদুল হক, লুৎফর রহমান, ফজলল করিম এবং সর্বোপরি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, অবরোধ সম্পর্কে সমাজের মনোভাবকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন।[৪৭]

মোট কথা, আধুনিক জগৎ ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ও জটিলতা সম্পর্কে লেখকরা সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। পারিবারিক বা সামাজিক গণ্ডীর সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা তাঁরা স্পষ্টরূপে অনুভব করতে পারছিলেন বহির্বিশ্বের প্রতিতুলনায়। বাইরের জীবন তাঁদের অন্তরের তারে ক্রমাগত আঘাত করেছিল বলে এতে বেড়ে উঠছিল নতুন সুর। স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই উদার ও মহান পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন তাঁর এবং এই পৃথিবীতে নিরুদ্যম দর্শকের বদলে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ... বিষয়বস্তু ছাড়া আঙ্গিক ও ভাষার দিক দিয়ে একালের হিন্দু ও মুসলমান লেখকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।...বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনার ইতিহাস ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তীকালে মধ্যযুগের অনুবৃত্তি চলেছে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে তার আধুনিকতার প্রথম স্তর বলতে হয়। এই পঞ্চাশ বছর ধরে প্রস্তুতির পর সাহিত্য ও সমাজ ক্ষেত্রে রূপান্তর বা যুগান্তর ঘটেছে।

এই নতুন যুগের প্রবর্তনা দেখতে পাই নজরুল ইসলামের রচনায়। নজরুলের পূর্ববর্তীদের রচনায় শুধু সমসাময়িককালের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে বলে নয়, অনাগত পরিবর্তনের বীজ রোপিত হয়েছে বলে একালের সাহিত্যকর্মের ধারা ও প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুশীলনের যোগ্য।[৪৮]

১০

আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, 'রাজনৈতিক বিষয়ে এরা নিঃশব্দই ছিলেন',[৪৯] কিন্তু আবুল হুসেন অল্প লিখলেও রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। ওয়াকিল আহমদ লক্ষ্য করেছেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র লেখকদের প্রবন্ধের মধ্যে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংগীতের মতো বিষয়ের সাথে সাথে 'রাজ-নীতি' ও 'অর্থনীতি' বিষয়ক প্রবন্ধও ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। প্রকৃত অর্থে এ ছিল সংগঠন ও পত্রিকা মারফত একটা আন্দোলন। ওয়াকিল আহমদ তাঁর লেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাহমুদ হোসেনের (১৯৬০-৬৩) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। মাহমুদ হোসেন বলেছেন, It was in Dhaka University that 'Muslim Sahitya

Samaj' was formed with university teachere such as Abul Hussain and Kazi Motahar Hossain as leading geniouses. This movement... compelled the Muslims of Bengal to think about their own tradition and values and reconsider their efficacy and significance in the light of the life that was emerging in the Sub-Continent.[৫০]

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজ, গঠিত হয়েছিল নেতৃস্থানীয় প্রতিভাবান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দ্বারা—যেমন আবুল হুসেন এবং কাজী মোতাহার হোসেন। এই আন্দোলন বঙ্গে মুসলমানদের চিন্তা করতে বাধা করে নিজেদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে এবং উপমহাদেশের নবজীবনের উত্থানের আলোকে তাদের কর্মক্ষমতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে।]

আবদুল মান্নান সৈয়দ যখন বলেন, 'বাঙালি-মুসলমান তাঁদের প্রদর্শিত অবলম্বিত পথ ধরে এগিয়েছে। এখানেই তাদের অপ্রতর্ক্য সাফল্য। তাঁদের ক্ষেত্রভূমি ছিল সাহিত্য। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি ছিল সমাজের সর্বত্র।' তখন এটা উপলব্ধিতে আসতে বাধ্য যে, সেই সময় বাংলা ও ভারতের রাজনীতি এমন একটা পর্যায়ে সক্রিয় ছিল যে সমাজের প্রতি হুসেনের মতো কঠিনভাবে দায়বদ্ধ অত্যন্ত সচেতন ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন 'কর্মযোগী' একজন সাহসী মানুষ অবশ্যই রাজনীতি-সচেতন মানুষও বটে। তিনি রাজনীতিকে পাশ কাটাবেন কিভাবে?

ঔপনিবেশিক ভারতে তখন ভারতের জনগণ, ব্রিটিশ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিবেচনায় হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক মঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা পালন শুরু করেছে। বাংলার রাজনীতিতে 'বঙ্গভঙ্গ' বড় ধরনের ঝাঁকুনি দিয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমাজের মূলত একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। যদিও ১৯০৬ সালের আগেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে: Not withstanding these inherent contradictions, the ideological propaganda achieved its basic objective, that of creating in the mass mind an awareness of a distinct identity as expresed in their changed names, style of dress and increased aversion to whatever was considered local and Hindu. ... what ideological progaganda failed to accomplish was made possible by the clash of economic interests between the pridominantly Muslims peasantry and their oppressors, the high-caste landlords and moneylenders with whom the entire Hindu community came to the identified in Muslim mind... The mullah's effects to organise the peasantry, now with the full backing of the prosperous Muslims families, brought them further into direct conflict with Hindu interests as it affected the status quo rural society. ...the growth of extreme Hindu nationalism with symbol repugnent to Muslims casued great uneasyness in their minds. ...By 1905 the building blocks which eventually went into the making of Pakistan were already here.[৫১]

[অবিচল ভাবে টিকে থাকা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহ, আদর্শগত প্রচারের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য হাসিল যা জনগোষ্ঠীর মনে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল আলাদা আত্মপরিচয়ের, যার বহিঃপ্রকাশ ছিল পরিবর্তিত নাম, পোশাকের বিশিষ্টতা এবং যা কিছু স্থানীয় ও হিন্দু বিবেচনা করা হত তার প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরাগ; এই সবের অনুকূলে প্রচার যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে মুষ্টিমেয় উঁচুজাতের হিন্দু জমিদার ও মহাজন কর্তৃক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান চাষীদের ওপর নিপীড়ন যে সংঘাতের সৃষ্টি করে তা সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিচিতির ধারণা মুসলিম-মানসকে প্রভাবিত করে। এই রকম অবস্থায় মুসলমান কৃষকদের সংগঠিত করতে মোল্লাদের প্রচারকে সর্বতো মদত যোগায় অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারগুলো—এবং সামাজিক ভারসাম্যের প্রশ্নে তা আরো এগিয়ে গেল হিন্দু স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে। চরমপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রম-বৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে মুসলমানদের জন্য আপত্তিকর প্রতীকের ব্যবহার যা মুসলিম মানসকে বড় ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি করে।... ১৯০৫ সাল নাগাদ পরস্পরের মাঝে অপসারণ অযোগ্য প্রাচীর উঠে গিয়েছিল; ঘটনাক্রমে যা পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত চলে যায়—ইতিমধ্যেই এখানেই যার সন্ধান পাওয়া যাবে।]

'হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেকদিন ধরে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে দুধরনের বিভাজন তৈরি হয়ে গিয়েছিল—আড়াআড়ি (আনুভূমিক) আর খাড়াখাড়ি (উল্লম্ব)। আড়াআড়ি বিভাজন প্রধানত পূর্ব বাংলায় হিন্দু মহাজন-ব্যবসায়ী-জমিদার-তালুকদার এবং মুসলমান প্রজার মধ্যে। প্রথমদল শোষক ও দ্বিতীয় দল শোষিত। আর খাড়াখাড়ি বিভাজন হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও মুসলমান মধ্যশ্রেণীর মধ্যে। ইংরিজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ইংরেজ-অনুগত হিন্দু মধ্যশ্রেণী বা ভদ্রলোকরা তৈরি হয়ে উঠেছিল উনিশতকের প্রথমার্ধ থেকেই। সে তুলনায় মুসলমান মধ্যশ্রেণী অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে ছিল। যখন তারা মাথা তুলল উনিশতকের শেষের দিকে, তখন শিক্ষা-চাকরি-রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দু'দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। আড়াআড়ি বিভাজন থেকে তৈরি হয় 'popular communalism' (গণপর্যায়ের সাম্প্রদায়িকতা)। ও খাড়াখাড়ি বিভাজন থেকে 'elite communalism' (উপরতলার সাম্প্রদায়িকাতা)।[৫২]

বঙ্কিম বলেছিলেন, 'হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল-মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব।' (ভারত কলঙ্ক) ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতিতত্ত্ব যে পরবর্তীকালে রাজ-নীতির সাম্প্রদায়িকীকরণে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে, এ তত্ত্ব দ্বি-জাতি তত্ত্বেরই এক উনিশ শতকীয় সূত্রায়ন।[৫৩]

বঙ্কিমের কাছে ইংরেজ এক জাতি, বাঙালিরা বহু জাতি। 'বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালি পাই। এক

আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানায্য মিশ্রিত হিন্দু, আর চতুর্থ জাতি বাঙালি মুসলমান।' অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানরা এখানে আলাদা জাতি হয়ে গেল।

তেমনি শরৎচন্দ্রের 'ইস্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'-এ মুসলমানরা তাঁর কাছেও আলাদা জাতি।[৫৪]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, মিলন হয় সমানে সমানে।...হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই।...হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।[৫৫]

সম্ভবতঃ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভূদেব-ই প্রথম ভেবেছিলেন। ব্রাহ্মণত্বের গর্ব ভূদেবের জীবনের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয়টি হল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কর্মচারী রূপে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা।[৫৬]

এই রকম নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান ভূদেবের থাকতেই পারে। কিন্তু মুসলমানদের সাথে নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার একটা সম্মানজনক সম-াধান প্রয়োজনবোধ করলে বা এজেন্ডা হিসেবে রাখতে গেলে হিন্দু ভারতে মুসলমানদের অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করা যায়? ভূদেব আবিষ্কার করলেন 'পালিত পুত্র' তত্ত্ব। তিনি প্রশ্ন তুললেন, 'এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব হয় না?...সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সমস্যার তাহলে তো সমাধান হয়ে গেল।[৫৭]

আসলে ভদ্রলোকরা যখন দেখলেন যে একই ভূখণ্ডে মুসলমানদের সঙ্গে পাশাপাশি তাঁদের বাস ও প্রতিবেশিত্ব অনিবার্য, তখন তাঁদের মনে হল-মুসলমানরা জাতি-বহির্ভূত বটে এবং মধ্যযুগে তারা হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচারও করেছে, কিন্তু আজ তাদের ভারতীয় জাতিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এটা কোন বাধা হওয়া উচিত নয়,...হিন্দু জাতীয়তাবাদের জমিতে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের যতটা কাছে টানা যায় তা এঁরা টানতে চেয়েছেন। তবু কিন্তু এঁদের কাছে হিন্দুরা ছিল হিন্দু, আর মুসলমানরা ছিল মুসলমান,...। তাদের দুটি আলাদা জাত ও সংস্কৃতি, তবে তারা একই রাজনৈতিক ছাতার তলায় এসে মিলতে পারে—এইটুকু মাত্র তাঁরা ভাবতে পারলেন। এক জাতির মধ্যে একাধিক জাতি—এই ছিল তাঁদের জাতি-চিন্তা।[৫৮]

অর্থাৎ এক জাতিতত্ত্ব। হিন্দু জাতির নেতৃত্বে বা অধিপতিত্বে মুসলমানজাতি সহ অন্যান্য 'জাতি'রা বাস করতে পারে—এমনকি একটি 'রাষ্ট্র'ও গড়তে পারে।

মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রণয়নের ঢের আগেই ব্রিটিশ ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা তার একটি পূর্বতন সংস্করণ খাড়া করেছিলেন, যাকে বলে এক-জাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতির মানে হলো হিন্দু জাতি, ভারতীয় জনগণ বললে হিন্দু জনগণ বোঝায়, মুসলমান শাসন ছিল বিদেশী, সুতরাং ভারতে মুসলমানেরা বহিরাগত মাত্র ছিলেন।[৫৯]

আবুল হুসেনের প্রধান রাজনৈতিক প্রবন্ধ হিসেবে হাতে পেয়েছি *আমাদের রাজনীতি* (১৯৩১) ও *The Gandi-Irwin Truce and the Muslims* (1931).

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমাদের ইতিহাসেরই অংশ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দুই শতাব্দীর ইতিহাস চর্চা আমদের ঔপনিবেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস করার ব্যাপারে যথাযথভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে প্রকৃত সাহায্য করেনি—অনেক ক্ষেত্রেই সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত ও শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ঐতিহাসিকরা পরিচালিত হয়েছেন—আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তথ্য নিয়ে যেমন কৌশলী লুকোচুরি হয়েছে তেমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন সেই সময়কালে পাওয়া যায় নি—তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে এর প্রতি গুরুত্বও দেয়া হয় নি। গত তিরিশ বছর ধরে অক্লান্ত প্রিশ্রম করে বিভিন্ন ঘরানার বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক প্রাপ্ত নতুন নতুন তথ্য হাজির করে 'ইতিহাসের পুনর্লিখন'কে আবার ঘষে মেজে নতুন একটা পুনর্লিখন পর্বকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। বলতে কি একটা পুনর্লিখন প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত অনেক বর্ণনা পদ্ধতিও সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য ভ্রান্ত বিবেচিত হওয়ায় ইতিহাস চর্চার একটা দিক অন্ততঃ উন্মোচিত হচ্ছে।

আমি ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠক। আবুল হুসেনের রাজনীতি-সংক্রান্ত বক্তব্যে প্রবেশের আগে তাই প্রয়োজন হয়েছে প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের। আমি অন্তত এটুকু জানি কেন আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ হিসেবে রামমোহনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম নয়—সহযোগিতাই হল আমাদের গর্বের বিষয়। ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে চারভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েচিল। পলাশী থেকে টিপু সুলতান হয়ে বাহাদুর শাহ (১৮৫৭), ওয়াহাবী-ফরায়েজী—যার মধ্যে সৈয়দ আহমদ বেরেলভি, তিতুমির-হাজী শরীয়ত উল্লাহ-দুদু মিয়া ছিলেন। এবং কৃষক, সাঁওতাল তথা নিম্নশ্রেণীর মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম—যার মধ্যে রয়েছে বোম্বাই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা (১৮৯৭-১৯১৪), বঙ্গদেশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পাঞ্জাবে বিপ্লব প্রচেষ্টা ইত্যাদি। এর একটি অধ্যায় বাংলায় 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন হিসেবে সুপরিচিত—যার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মধ্যদিয়ে।

১১

১৮৫৭ সালে যখন প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হল—তখন তার চরিত্র অসাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সাধ্যমতো তার বিরোধিতা করে ইংরেজদের নেক নজরে পড়তে লজ্জাকর ভূমিকা পালন করেছে এবং এই ধারাটিই হল বাংলার নব জাগরণের ধারা। আগে যা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা এক-জাতিতত্ত্ব এই সময়কালেই তার দীপ্তযাত্রা শুরু করে। উনিশ

শতকের তৃতীয় দশক থেকে আবুল হুসেন পর্যন্ত এই ধারা শক্তি সঞ্চয় করেছে। এবং হুসেনের কালে এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মোল্লা ও ইসলামী রক্ষণশীলতার একটা শক্তিশালী ধারা এর ফলে আরও সমৃদ্ধ হয়। বিকশিত হয় একটা মুসলিম শিক্ষিত ও তুলনামূলকভাবে দুর্বল মুসলিম মধ্যবিত্ত।

আর এই সময়েই মহিমান্বিত করা হচ্ছিল হিন্দু নেতৃত্ব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে আর মুসলমানরা দালালি করছে। এটা বেশি করে বাংলায় দেখা গেল ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের সময়।

হিউমের উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্য, ব্রিটিশের রাজরানীর প্রতি নিয়মিত শ্রদ্ধা জানান ও অতি নিয়মতান্ত্রিক পথে কিছু কিছু দাবি পেশ—এই ছিল জন্মের পর থেকে বিশ বছরের অধিক সময় কংগ্রেসের কাজ। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯২৮ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে উভয় সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় নি। তবে কংগ্রেসে একে একে যোগ দেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, ইউপির পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ। এরা ভারতীয় জাতিতত্ত্বের অভ্যন্তরে হিন্দু জাতিতত্ত্ব লালন করতেন। কংগ্রেসে মুসলমানরা অল্প সংখ্যায় হলেও যোগদান করে আসছিলেন—প্রকৃত জাতীয় সংগঠন হতে পারলে ক্রমাগত মুসলমান অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা কিন্তু ১৮৯৫ এর পুনা কংগ্রেস থেকে মুসলমানগণ দূরে সরে যেতে ও সমর্থন তুলে নিতে শুরু করেন। কারণ শিবাজী উৎসব ও গণেশ উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মুসলিম বিদ্বেষ ও বিরোধকে তাঁরা ধরে ফেলেন।

আবার একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সূত্র ধরে তীব্র হয়ে উঠল উগ্রপন্থা ও মধ্যপন্থার দ্বন্দ্ব।...কংগ্রেসের উগ্রপন্থীদের ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দ, তাদের কল্পিত সমিতি ও অনুসৃত কার্যাবলী সমস্ত কিছু থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ও প্রতিফলিত হচ্ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যঞ্জনা। কোনও অহিন্দুর পক্ষে সেই ব্যঞ্জনাতে সঙ্গত হওয়া সম্ভব কিনা একথা কেউ বিচার করেন নি এবং হয়তো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেকথা কেউ বিচার করতেও চাননি অর্থাৎ নিজেদের বিচরণক্ষেত্র থেকে মুসলিমদের বহিষ্কারই করেছিলেন।[৬০]

The main obstacle of Hindu-Muslim unity not only in Bengal but over the whole of India, was the attitude of the extremist group of Congress towards the Muslim.[৬১]

[শুধু মাত্র বাংলাতে নয় সমগ্র ভারতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুসলমানদের প্রতি চরমপন্থী কংগ্রেসের মনোভাব।]

গোহত্যা নিবারণ, হিন্দি ভাষা প্রবর্তন, শুদ্ধিকরণ উৎসব, ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রে চাকরির ক্ষেত্রে সাফল্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল হিন্দু অহমিকার ইন্ধন। পক্ষান্তর ১৯০৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত মুসলিম লীগের রাজনীতি ছিল সুস্পষ্টরূপেই আত্মরক্ষাত্মক, তা কোন রকমেই মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ছিল না, ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির মধ্যে নিজেদের বিপন্ন অস্তিত্বকে ও নিজেদের অধিকারগুলিকে রক্ষা করার রাজনীতি।[৬২]

আবুল হুসেনের *আমাদের রাজনীতি*র রচনাকাল ১৯৩১। তিনি প্রথমেই 'রাজ-নীতি' ও 'আমাদের করণীয় রাজনীতি'র একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র অনুসরণের আভাষ পাওয়া যায়। এরপর তিনি সুরা বকর-২১৩ থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে তিনি মূল যে বক্তব্যটি হাজির করেছেন তাহল জনকল্যাণমুখী অখণ্ড ভারত। কিন্তু প্রত্যাশিত কল্যাণকর রাষ্ট্রটি যে কার্যকর নেই তার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণি বৈষম্যের স্বরূপকে তিনি প্রতীকী উদাহরণ দিয়েছেন 'ব্রাহ্মণ-'শূদ্র' সম্বন্ধ হিসেবে। ব্রিটিশ শাসনকে তিনি মনে করেছেন এইভাবে যে, গণমুখী না হলেও ভারতের জাতীয় জীবনকে তা উজ্জীবিত করেছে।

তিনি মনে করেন, 'ব্রাহ্মণ-প্রধান যুগ থেকে ব্রিটিশ-প্রধান যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্র জন-সাধারণ বা গণের বৃহত্তর জীবন বিকাশে সাহায্য না করে শ্রেণি বিশেষের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জনে সাহায্য করেছে।' বলা যায় 'রাষ্ট্র' যে প্রাধান্য বিস্তারকারী বিশেষ শ্রেণির শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার বা যন্ত্র সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট স্বচ্ছ ছিল।

তিনি মনে করেছেন ভারতীয় জাতির সামনে এমন একটা ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুযোগ এসেছে যার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু, 'দুঃখের বিষয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীরা ভারতীয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ হয়েও হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সাধনাকে সন্দেহের চক্ষে দেখছেন, এবং তাঁদের সাথে বিরোধ করে ব্রিটিশ পরিচালকদের হাত ধরে থাকতে চাচ্ছেন। তার কারণ তাঁরা ভারতীয় রাষ্ট্র বলে কোন আদর্শকে দেখতে চাচ্ছেন না।' ... তারপর রাষ্ট্রশক্তি অর্জনে হিন্দু আন্দোলন শুরু করল, কিন্তু মুসলমান ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে আন্দোলনে যোগ দিতে সাহস করল না।' কিন্তু 'মুসলমান-হিন্দুর স্ব-রাজ সাধনায় পুরোপুরি সাহায্য না করলেও স্বরাজকে প্রতিহত করতে তার ইচ্ছা নাই।'

হুসেনের ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিষয়ে উপরের বক্তব্য সেই সময়ে কতখানি সংগতিপূর্ণ ছিল ও তার প্রত্যাশা পূরণে হিন্দুদের আদৌ কোন গুরুদায়িত্ব ছিল কি না সে আলোচনায় এই মুহূর্তে না যেয়েও বলা যায় হুসেন একরকম নিশ্চিত যে, ভারতীয় জাতির ভিত্তিতে ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারে হিন্দুদের সহযোগী মিত্র হিসেবে মুসলমানদের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত এবং যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতার দায় ও দায়িত্ব যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের উপর বর্তায় সেহেতু হিন্দুর স্ব-রাজ সাধনায় মুসলমানদের অংশগ্রহণে দ্বিধান্বিত থাকা তাঁর জন্যে ক্ষতিকর।

তিনি একথাও পর্যন্ত বলে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করলেন যে, 'হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজনের হাতে মুসলমান বাঁধা। বৃটিশ পরিচালকগণ কি তাদের হাত থেকে মুসলমানকে রক্ষা করতে পারছেন? তাহলে স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বনে মুসলমান আদৌ উপকৃত হয় নাই ও হচ্ছে না। এতে করে বরং হিন্দুর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ প্রবৃত্তি আরও প্রখর হয়ে উঠেছে ও উঠছে।'

তাহলে হুঁশিয়ারী বা উৎকণ্ঠিত পরামর্শ কি এমন হচ্ছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে মুসলমানরা যেহেতু বাঁধা সেজন্য হিন্দুর স্বরাজ-সাধনায় একান্ত সহযোগিতা দরকার। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নীতির জন্যই তাদের সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

তিনি তাঁর বক্তব্য প্রসারিত করলেন, 'আপনাদের হিন্দু বড় দলের (Hindu Majority) প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষকে স্নেহ প্রীতিতে পরিণত করবার সাধনা করতে হবে। হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্য আপনাদের তৈরি হতে হবে।'

হুসেন ভারতীয় রাজনীতির গতিধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু তিনি তার নিজের বক্তব্যে প্রথমাবধি মূলত অনড়। হুসেনের এই লেখাটির প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলার রাজনীতিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার গুরুতর প্রভাবকে রাজনৈতিক আলোচনার বাইরে রাখা কতখানি সংগত তা নিয়ে বোধ করি প্রশ্ন উত্থাপন হতেই পারে।

এই নিবন্ধের সীমাবদ্ধতার জন্য আমি এখানে উপরের অভিমত সামনে রেখে বিভিন্নভাবে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছি :

প্রথমত বহুল আলোচিত বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে আমরা জানি যে, কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে সাথে বঙ্গবিভাগের একটা প্রশাসনিক সমস্যাও (যার গুরুত্ব খাটো করা যায় নি) ছিল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিল থাকলেও এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলেও ফলাফল যা হওয়ার তা কিন্তু হয়েই যায়। এটা একটা সাম্প্রদায়িক বিভাজন। বাংলাদেশে কমরেড বদরুদ্দীন উমর পথিকৃৎ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক হিসেবে দুই দফার বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বহু বছর ধরেই আলোচনা করে আসছেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর অন্যান্য প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি বাঙালির জাতীয়তাবাদ গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এছাড়া অধ্যাপিকা সুফিয়া আহমেদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ বঙ্গভঙ্গ ও তার ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে এইসব বই দুষ্প্রাপ্য নয়।

যা হোক এটা নিশ্চিত যে, সম্প্রতি আমরা বঙ্গভঙ্গের উপর আরো সব লেখা পাচ্ছি যার দ্বারাও এটা সমর্থিত যে কার্যত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন হয়েছিল এবং শুধু ইংরেজ চক্রান্তে এত বড় একটা বিভাজন ঘটতে পারত না যদি তার ক্ষেত্রও অনেকটা প্রস্তুত না থাকত এবং 'বিভাজনের' ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষার হার বাড়ে ও ঢাকা কেন্দ্রিক একটা শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাব

ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয়ত বঙ্গবিভাজন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে।[৬৩]

এই সময়কালে হিন্দু যুবকরা ব্রিটিশ বিরোধী যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালিয়েছিল তার চরিত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রভাব নেতিবাচক। অরবিন্দের উদ্ভাবন ধর্মীয় প্রতীক-বাগধারা সম্পৃক্ত 'ভবানী মন্দির': তার মনে হল, ভক্তির উদ্রেক ছাড়া সম্ভব নয় শক্তির উদবোধন। বঙ্কিমচন্দ্র-যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের হাতে যার সূচনা—দেশভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরভক্তির সেই সমন্বয়তত্ত্ব একটি সুগঠিত রূপ পেল অরবিন্দের রচনায়, ধর্মীয় আঙ্গিকে মোড়া সেই দর্শন গড়ে দিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের চিত্তবিশ্ব।[৬৪]

১৯০৫ সালের মহালয়ার দিন কালিঘাটের মন্দিরে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে তারা বিলিতি জিনিস পরিহার করবে; নবদ্বীপ ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন জানান। স্বদেশী আন্দোলন কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ধর্মীয় আন্দোলনের স্তরে চলে যায়।[৬৫]

হিন্দু জাতীয়তাবাদ, 'আনন্দমঠ' উপন্যাস এবং 'বন্দে মাতরম' গানের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রতিক্রিয়া প্রকট হয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। ... বাঙালি জমিদার মধ্যবিত্ত যে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় পথে নেমেছিলেন তার একটি বড় কারণ: পূর্ববঙ্গে তাঁদের জমিদারি ছিল, বাংলা ভাগ হওয়া মানে সেই স্বার্থে ঘা লাগা।[৬৬]

The Moslem Chronicle নামক এক পত্রিকার ১৯০৮ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'Swaraj in Jessore' শিরোনামে এই মর্মে সংবাদ বেরোয় যে যশোহরের হিন্দু জমিদারগণ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার অপরাধে মুসলমান প্রজাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে ও মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে। ইত্যাদি।[৬৭]

১৯২৫ সালে মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন গঠন ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে একত্রে চিত্তরঞ্জন দাস 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে একটি চুক্তিতে উপনীত হন। এই চুক্তির ঘোষণা কংগ্রেসে অবস্থিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং কংগ্রেসের এই অংশটি হিন্দু মহাসভাকে নুতনভাবে সংগঠিত করতে নিযুক্ত হয়। এইসব সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ সময় বেশ কিছু সংবাদপত্রে প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঞ্জাবকে এবং সেই সঙ্গে ভারতকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করার পরিকল্পনা প্রদান করেন।[৬৮] চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কার্যত বাতিল হয়ে যায়।

তীব্র হিন্দুত্ববোধ দিয়েই বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। কালীমূর্তির 'সামনে বসে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করতে হত ঈশ্বর, অগ্নি, মাতা, গুরু এবং পরিচালকদের সাক্ষী রাখিয়া'...ইত্যাদি।[৬৯]

'বন্দে মাতরম' নিয়ে তর্কবিতর্ক সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা সচেতন, কিন্তু একথা আজো ঠিক যে, 'বন্দে মাতরম' শিল্পগুণে যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন আসলে গানটি দেবী দুর্গারই প্রশস্তি। ... মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয়ই গ্রাহ্য হোক না কেন, বৃহত্তর হিন্দু জনসাধারণের পক্ষেও তিনি যা মুসলিম জনসাধারণের পক্ষেও তিনি তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা।[৭০]

সন্ত্রাসবাদীদের বর্ণিত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সন্ত্রাসবাদ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সশস্ত্র উপায়ে উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত তাদের আত্মত্যাগকে তাই ছোট করে দেখার চেষ্টা অনুচিত। প্রসঙ্গক্রমে ১৮৫৭ সালের মহান প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ অধ্যায়টি বাদ দিয়েও বাংলায় পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত করে বিচার করার তাগিদে সেই সময় থেকে বহু বছর যাবত বিস্মৃত তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া বা তথাকথিত ওহাবিদের সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়টি কিছুটা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

১২

বিধর্মী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র মুসলমান। মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক প্রবণতাসমূহ দূর করার জন্যই এরা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করলেও শিখ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনিবার্যতার কারণে তাদের এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভি ছিলেন তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের মূল নেতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের প্রধান পরিচালক। সৈয়দ আহমদের জিহাদ শুধু পাঞ্জাব বা শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই ছিল না বরং তার জিহাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজরাই। ১৮২৬ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রথম শিখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধেই চলতে থাকে। ১৮৪৯ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধেই সশস্ত্র যুদ্ধের বিস্তার। সুদূর বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ করে সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল এলাকায় মুজাহিদদের ইংরেজ বিরোধী বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে।[৭১]

মুজাহিদদের কেন্দ্রস্থল পাটনা থেকে অত্যন্ত সংগোপনে ও সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ চলতে থাকে। প্রশিক্ষণ হত, হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নতুবা দেশত্যাগ করা।[৭২]

হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী, '১৮৫০ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে আমরা ষোলবার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি এবং তার জন্যে তেত্রিশ হাজার স্থায়ী সৈন্যের দরকার হয়েছে। এবং ১৮৬৩ পর্যন্ত এই যুদ্ধের সংখ্যা কুড়িবার এবং তার জন্য দরকার হয়েছে ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্যের।'

সৈয়দ আহমদ শহীদ হওয়ার পরও তার অনুগামীরা নিরলসভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে এক দুর্নিবার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৬৩ সালে আম্বালার ব্রিটিশ বিপর্যয়ের পর তারা বিদ্রোহীদিগকে ধরে ধরে কতকগুলি বিচারের প্রহসনের আয়োজন করে। এগুলো সংক্ষেপে (১) ১৮৬৪ সালের আম্বালা বিচার, (২) ১৮৬৫ সালের পাটনা বিচার, (৩) ১৮৭০ সালের মালদা বিচার ও রাজমহল বিচার।[৭৩]

এ সমস্ত বিচারের রায়ে শত শত মুসলিম মুজাহিদকে ফাঁসি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তরিত করা হয়। বস্তুত আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপান্তর ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল এসব মুজাহিদদের জন্য। ১৮৭১ সালে বিচার চলাকালীন মুজাহিদদের ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ফলে বাংলার প্রধান বিচারপতি জন প্যাকসটন নরম্যান তাঁর বিচারালয়ের সিঁড়িতে একজন মুজাহিদের ছুরিকাঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন (রাম গোপাল, *Indian Muslim, a Political History* P.23 থেকে উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত-পৃ. ২৩)। তিনি কিছুসংখ্যক মুজাহিদকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করেছিলেন। একই বছর শের আলী নামক দণ্ডপ্রাপ্ত একজন পাঠান মুজাহিদের হাতে ভাইসরয় লর্ড মেয়ো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নিহত হন।[৭৪] এই সংগ্রাম নব্বই এর দশক পর্যন্ত চলতে থাকে। বর্ণিত হত্যাকাণ্ডকে আনিসুজ্জামানসহ কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদ বলেছেন।

এই যে বিরাট পরিধিতে বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম চলল তা (ক) গেরিলা যুদ্ধ, (খ) সম্মুখ যুদ্ধ ও (গ) সন্ত্রাসবাদী কায়দার মধ্য দিয়ে শেষ হল। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর্বকে সন্ত্রাসবাদী পর্ব বলা হচ্ছে। তাছাড়া সশস্ত্র যুদ্ধের এই যে বিরাট আয়োজন তা কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেনি।

তুলনামূলক বিশ্লেষণের অবকাশ নেই বলে এখানেই শেষ করতে হল। যদিও পাশাপাশি দুটো চিত্রের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই আমরা দেখতে পারি। ভারতের শিরোমণি ঐতিহাসিকরা যা দেখতে চাননি।

আবুল হুসেনের যে দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি তার মধ্যে 'The Gandhi-Irwin Truce and the Muslims' ইংরেজিতে লেখা। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পর্কে প্রথাগত ইতিহাস রচনার মাধ্যমে মোটামুটি ধারণা ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদেরও ভালোই জানা আছে। তাছাড়া হুসেনেরই মন্তব্য হল, True it is that Mahatma Gandhi completely surrenderred his method of war.etc.[৭৫]

[এটা সত্য যে মহাত্মা গান্ধী তার যুদ্ধপদ্ধতি নিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করেছিলেন ইত্যাদি।]

কিন্তু এই প্রবন্ধেও সেই সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর অভিমত বুঝতে পারা যায় যখন তিনি বলেন, The burning question of the day

is said to the the problem of Hindu-Muslim unity and already Mahatma Gandhi is out to tackle it and the people also are urging him to solve. But I request him to solve it but not at any cost. The present day demand alleged to be the demand of the Muslim community is unreal and based on fictious and immaginary... এবং Indeed the Hindu-Muslim problem is complex and dificult as it has been made to be so. But to my mind this is no problem at all. It is illogical and has no basis either on principal or on precedent. The problem owns its importance to a few individuals; belonging to the Muslim community, who scent danger of every step of progress.

[বলা হয়ে থাকে আজকের দিনের সব থেকে উত্তপ্ত প্রশ্ন হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, মহাত্মা গান্ধী যা সামাল দিতে পারেন নি কিন্তু তার কাছেই বিষয়টি সমাধানের জন্য তাকেই বারবার অনুরোধ করে।
কিন্তু আমি তাকে অনুরোধ করব যে কোন মূল্যে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন নেই। এই সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের দাবি উত্থাপনের জন্য যে অজুহাত দেখাচ্ছে তা অবাস্তব এবং যার ভিত্তি হল কল্পিত ধারণা...এটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সত্যিই বেশ কঠিনও বটে। কিন্তু আমার মনে হয় আদৌ এটা কোন সমস্যা নয়। বিষয়টি যুক্তিহীন এবং এর এমন কোনো ভিত্তি নেই যার পিছনে না আছে কোন নীতি না আছে কোনো নজির। সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণ করে কিছু ব্যক্তি বর্গ—এরা রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়েরই অভ্যন্তরে যারা প্রতিটি অগ্রগতির মধ্যে বিপদের গন্ধ শুঁকে পেতে অভ্যস্ত।]

আমার মনে হয় ইতোপূর্বে যেসব ঘটনা ও বক্তব্য হাজির করা হয়েছে সে সবই যথেষ্ট হুসেনের উপরের মতামত বুঝতে।

এই নিবন্ধের সমাপ্তি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা আমি হুসেনের লেখালেখি ও কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করছি না-বা এটা কোন গবেষণাধর্মী লেখাও নয়।

'মুসলিম কালচার' রচনাটি হুসেনের নিজের নয় তিনি অনুবাদ করেছেন—ইংরেজ মুসলমান মুহম্মদ মারমাডিউক পিক্থল্ এর মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণ থেকে।

পিক্থল্ এর বক্তব্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি বা সহমত্য না থাকলে তিনি এর অনুবাদ করে প্রকাশ করতেন না ধরে নেব। মুসলিম কালচারের বক্তব্যই নয় অন্যত্রও হুসেন এমন সব বক্তব্য ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে দিয়েছেন যা হয়ত খুবই দ্বান্দ্বিক নতুবা অংশত স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। এমনকি হয়তবা দু'টোই।

হুসেন ধর্ম, ধর্মবোধ, ধর্মমোহ, ধর্মাশ্রয়ী ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি মানবজাতির অগ্রগতির পথে কোথায় কতখানি প্রয়োজন বা আদৌ তার প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে বিচিত্র অবস্থান ও নানাবিধ সংগতি-অসঙ্গতির ধারায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—তবে পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানদের মোল্লাতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত করে

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার তাগিদ তাঁকে মনে হয় সর্বদা অস্থির করে রাখে—তিনি যেন ঝড়ের পাখি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে সমাজে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে হিন্দুদের কাছাকাছি বা সমমানে আনার জন্য তিনি আসলে বাংলার নবজাগরণপন্থীদের পথ অনুসরণ করাকেই সঠিক মনে করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর 'মডেল' সংগ্রহ করেছেন হিন্দু শিক্ষিত এলিটদের কাছ থেকে, যদিও নিজে কৃষকদের একান্ত দরদী। এবং হিন্দু-মুসলমানদের শোষকদের তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেছেন।

যে বছরগুলির মধ্যে হুসেনের কর্মকাণ্ড ও রচনাসমূহের উপর আমার কিছুটা আলোচনা সেই সময় ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা পর্যায়। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই কেবল ঐ বিদেশী বর্বর শোষকদের ও তার দালালদের সম্পর্কে আলোচনা সংগত—কিন্তু আমি বিশ্লেষণে যেতে চাইনি। এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সেরকম না—বিভিন্ন ঘটনা ও তার উপর বিজ্ঞজনের বিশ্লেষণকে আমি সামান্য সংকলন করেছি মাত্র।

ব্রিটিশরা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে ভারতবাসীর ঐতিহাসিক উপকার করেছে বলে আমি মনে করি না। বহু বছর আগেই যা আমি লিখেও প্রকাশ করেছি (১৯৯১)।

মার্কসের মতে ব্রিটিশ শাসন একইসাথে ভারতে দুটি পরস্পরের পরিপূরক কাজ সম্পন্ন করেছে—ধ্বংসাত্মক (Destructive) এবং সৃজনশীল (Regeneration)। মার্কসের এই তত্ত্ব অনেকে গ্রহণ করেছেন যদিও মার্কসের পরের লেখায় দেখা যায় তিনি নিজে এই মত পরিবর্তন করেছিলেন। ...ব্রিটিশ শাসন ভারতে কোন সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেনি। তার ভূমিকা ছিল ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ও বৃটিশ শোষণের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। প্রাক-ঔপনিবেশিক সমাজ অনড়, গতিহীন, নিস্তরঙ্গ ছিল এবং বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এই ধারণাও সঠিক নয়।[৭৬]

আজকের দিনে ইতিহাসের অনেক মালমসলা যা এমনকি সত্তুরের দশকেও হয় অজানা ছিল নতুবা গুরুত্ব দেয়া হয় নি তা নতুন করে গুরুভার গবেষণার মাধ্যমে মূল্যায়ন পুনর্মূল্যায়ন হয়ে চলেছে। অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতামত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের চালু মতামত খণ্ডিত হচ্ছে। এমন সময়ে আমাদেরও ঝালিয়ে নিলে ভালো হয় ইতোমধ্যে অনেক অকেজো পুরনো ধারণাকে।

দুর্ভাগ্যবশত সামাজিক ইতিহাস এখনও অবধি ভারতে অবহেলিত বিষয়। প্রায়শই এটিকে সমাজ সংস্কার প্রয়াস নিয়ে সমীক্ষার সঙ্গে কার্যত এক করে ফেলা হয়। শ্রেণি গঠন ও শ্রেণি চেতনা নিয়ে কাজ সবে শুরু হয়েছে। দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের বিকাশ স্পষ্টতই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবু সেটি বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে এমন ইঙ্গিত প্রায় নেই-ই। বিশাল মাত্রায় নিরক্ষরের দেশে লিখিত সাহিত্য

শুধু এক সংখ্যালঘু অংশেরই ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের দিশারী হতে পারে।

কোন ঐতিহাসিকই পক্ষপাতমুক্ত হতে পারেন না, সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো অঘোষিত ও অচেতন পক্ষপাত।[৭৭]

তবে আশার কথা কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসহ সুমিত সরকারের *মর্ডান ইন্ডিয়া* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। বিশবছরের অধিক সময় আগে। এরপর সরকারের আরো লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ইতিমধ্যে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অন্তত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময়কালের ওপর আরো অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ ও বই প্রকাশিত হচ্ছে—যাতে রয়েছে চমকে দেবার মতো তথ্য ও বিশ্লেষণ। স্বীকার করি পাকিস্তানে প্রকাশিত তেমন কোন বই পাই নি।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আবুল হুসেনের বক্তব্যকে কেন্দ্রে রেখে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে—তা শুরুতেই বলে নিয়েছি। এবং যেমন প্রথমে তেমনি শেষে কবুল করছি আবুল হুসেনের রচনাসমূহের মাত্র কিছু অংশই আমি পড়েছি। তাছাড়া আবুল হুসেনের ঢাকা ত্যাগ করার পর কলকাতায় থাকার সময়কার কর্মকাণ্ডের তেমন কিছুই আমি জানি না। তবে এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু হল ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ে মুসলমানদের ভূমিকা নেই, ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে মুসলমানরা নিজদেরকে সরিয়ে রেখেছিল, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে মুসলমানদেরই প্রধান ভূমিকা রয়েছে—এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় নিয়ে আসা। এসব ধারণাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দশকের পর দশক ধরে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ভারতের শিরোমণি ঐতিহাসিকদের এক বড় অংশ পারদর্শিতার সাথেই তাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে পেরেছেন। রাজনৈতিক পরিবেশে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে খারাপ ভাবে। নির্মোহ দৃষ্টি, উঁচু মাপের পাণ্ডিত্য ও কঠোর গবেষণা কেবল শিরোমণি ঐতিহাসিকদের সৃষ্ট ইমারতকে যথাযথভাবে আঘাত করতে পারত। এ কাজ হয় নি, তা বলা যাবে না—তবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে আশানুরূপ ব্যাপক যে গবেষণা ও তার ফলাফল পাওয়া আমাদের দরকার ছিল তা আমরা পাই নি। এটা আনন্দের কথা আয়েশা জালাল যেমন ভারত বিভাজনে জিন্নার ভূমিকা নিয়ে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা (*The Sole Spokesman*) প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠিত অনেক শিরোমণি ঐতিহাসিকদের ভালোমতোই বিব্রত করতে পেরেছেন তেমনি সুফিয়া আহমেদ, রফিউদ্দিন আহমেদসহ অনেকেই বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তা নিয়েও অনেক বিষয়েই নতুন ভাবনা হয়েছে। এটা ঠিক আয়েশা জালাল বা রফিউদ্দিন আহমেদ-এর গবেষণার ফলাফল অনেকেই গ্রহণ করেন নি বা আংশিক গ্রহণ করেছেন কিন্তু তবুও এই ধরনের ঐতিহাসিক কাজ আরো বেশি বেশি হওয়া প্রয়োজন। আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি যেন ইতিহাস-চর্চা পূর্বের প্রথাগত ধারাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে। আমি নিজে একজন ইতিহাসের পাঠক মাত্র সেজন্যে এটুকু বুঝতে পেরেছি

সাধারণ পাঠকরা দশকের পর দশক কিভাবে ইতিহাসের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তিতে থাকতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসই আসল ইতিহাস' (সুরঞ্জন দাস, ১৯৯৩)। তবুও সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিভিন্ন জাতিগত সমস্যা, আদিবাসী সমস্যা অনেক সময় এমন জটিলতা সৃষ্টিতে সক্ষম যে এসব সমস্যাসমূহ আলাদা গুরুত্বের সাথে গবেষণা দরকার যা অনেক ভালোভাবেই শুরু হয়েছে। সুতরাং দৃষ্টিকে প্রসারিত এবং জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে শ্রেণি সচেতনতা বৃদ্ধি করেই কেবল আমরা নতুনভাবে ইতিহাস অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে পারবো।

বাংলাদেশে এই ধারাটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় বলে হুসেনের বেশ কয়েকটি অত্যন্ত উঁচু মাপের প্রবন্ধ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নি।

গ্রন্থনির্দেশ

১. *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১); সংকলন ও সম্পাদনা: মুস্তাফা নুরউল ইসলাম; বাংলা একাডেমী; ঢাকা; ২০০৩; পৃ. ৭
২. পূর্বোক্ত; পৃ. ৭
৩. *নির্বাচিত শিক্ষা;* সম্পাদক : আব্দুল মান্নান সৈয়দ; একুশে পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা; ২০০২; ভূমিকা
৪. আবুল কাশেম ফজলুল হক; *কাজী আব্দুল ওদুদ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ;* বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র-১৯৮৯, পৃ. ১৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৬. *শিখা সমগ্র*, মুখবন্ধ, পৃ. ৯
৭. *আবুল হুসেন রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড; আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পাদিত; বাংলা একাডেমী; ২০০৩; সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে; পৃ. ১৪
৮. *আবুল হুসেন রচনাবলী;* পৃ. ৮ (এরপর শুধু 'রচনাবলী' বলে উল্লেখ থাকবে)
৯. পূর্বোক্ত; পৃ. ৮, ৪৭
১০. পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৪, ৬৩
১১. কাজী আবদুল ওদুদ; শাশ্বত বঙ্গ; *বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সিরিজ* : ০১; ১৯৯৪; পৃ. ৩১৪
১২. *রচনাবলী*, পৃ. ৫৬
১৩. রাষ্ট্র ও শিক্ষা : অধ্যাপক জাহেদা আহমদ; *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১); সামাজিক সাংস্কৃতিক*-৩য় খণ্ড; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০০; সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম; পৃ. ১০০
১৪. পরমেশ আচার্য; শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি; *আকাদেমি পত্রিকা*; সংখ্যা-১৭; ২০০৪; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; পৃ. ৬৭
১৫ পূর্বোক্ত; পৃ. ৬৮
১৬. *রচনাবলী*, পৃ. ৭৩-৯২
১৭. *রচনাবলী;* সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে; পৃ. ১৫
১৮. কাজী আবদুল ওদুদ; শাশ্বত বঙ্গ; *বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সিরিজ* : ০১; ১৯৯৪; পৃ. ৩৯৭
১৯. *কাজী আবদুল ওদুদ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ;* ভূমিকা; পৃ. ১৮, ২০

২০. এম শফিকুল আলম; দেলোয়ার হোসেনের দার্শনিক চিন্তাভাবনা; প্রসঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মসলিম সমাজ; *ইতিহাস অনুসন্ধান;* সংখ্যা-১৪; কোলকাতা, ইং-২০০; পৃ. ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৮
২১. আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার; ইসলাম ও আধুনিকতা; *প্রতিক্ষণ;* কলকাতা; ১৯৯৮; পৃ. ১৪, ১৫, ১৬, ১৯
২২. পূর্বোক্ত; পৃ. ১৯, ২০
২৩. পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৬
২৩. Asgar : *Lifting the Veil*, Sangam Books (India) Limited 1995, P.58
২৫. *The History of Bengal,* volume-ii, Edited by Sir Jodunath Sarkar, The University of Dacca, 1976, p. 497, 498
২৬. *মোসলেম ক্রনিকল* ২ মে ১৮৯৬' ওয়কিল আহমেদ কর্তৃক উদ্ধৃত; বাংলার রেনেসাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ-২০৪; বাতায়ন প্রকাশন, পৃ. ৩৮
২৭. দেবেশ রায়; অপর ভাষা; অক্ষর পাবলিকেশনস; ত্রিপুরা; ২০০৩ পৃ. ১২
২৮. মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায় : *উপন্যাসে অতীত;* থীমা; কলকাতা; ২০০৩; পৃ. ৩৬, ৪০
২৯. পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪
৩০. সুরজিৎ দাশগুপ্ত : *ভারতীয় মুসলমানদের সংকট;* মিত্র ও ঘোষ; ১৪০৯, পৃ. ৩১
৩১. *The Moslem Chronicle*, 28 March; 1896; p. 142; ওয়কিল আহমেদ কর্তৃক উদ্ধৃত; উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা; দ্বিতীয় খণ্ড; বাংলা একাডেমী; ১৯৯৩; পৃ. ১২৭
৩২. পরমেশ আচার্য : *বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর বিতর্ক;* নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা; ২০০২; পৃ. ১৮, ২১, ২২, ২৬
৩৩. অমলেন্দু দে : বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; ১৯৮৭; পৃ. ১৩৭
৩৪. আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য;* প্যাপিরাস; ২০০১; পৃ. ১৯
৩৫. পূর্বোক্ত; পৃ. ২০
৩৬. পূর্বোক্ত; পৃ. ২০, ৭৮
৩৭. পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৯
৩৮. Rafiuddin Ahamed : *The Bengal Muslim; 1871-1906;* Oxford India Paperbacks 1998, p. 133
৩৯. Jayanti Maitra; *Muslims Polities in Bengal 1855-1906;* KP Bagchi; Calcutta; 1984; p. 137, 147, 151
৪০. Sufia Ahmed : *Muslim Community in Bengal 1884-1912*; Oxford University Press, 1974, Bangladesh. p. 53 [উদ্ধৃত : luteef. A., A Minute on the Hoogly Madrussa 1877, 1. O. L. Tracts 826, p. 4]
৪১. গোলাম মুরশিদ : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি; *প্রথম আলো* ২৬ আগস্ট ২০০৫
৪২. আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ২২
৪৩. আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩
৪৪. ওয়কিল আহমদ : *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা;* প্রথম খণ্ড; বাংলা একাডেমী; ১৯৮৩; পৃ. ২৫১-২৫২
৪৫. আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ৩০০
৪৬. আনিসুজ্জামান; পূর্বোক্ত; পৃ. ৩০১
৪৭. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২, ৩০৫
৪৮. আনিসুজ্জামান : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২, ৩০৫, ৩০৭-৩০৮
৪৯. আব্দুল মান্নান সৈয়দ : পূর্বোক্ত; ভূমিকা

৫০. ওয়কিল আহমদ : *বাংলার রেনেসাঁ*, পৃ. ১৩৩, ১৩৫
৫১. Rafiuddin Ahamed; পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০
৫২. অনুরাধা রায় : দেশ ভাগ : একটি অন্তর্মুখী প্রক্রিয়া; *বঙ্গবিভাগ: সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলন;* বিবেকানন্দ কলেজ; উত্তর চব্বিশ পরগনা; ২০০২; সম্পাদনা : সোমদত্তা মণ্ডল, শুক্কা হাজরা; ২০০২ পৃ. ৬৭
৫৩. বদরুদ্দীন উমর : *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*; চিরায়ত প্রকাশন; কলকাতা; ১৯৯০; পৃ. ৩১
৫৪. অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত পৃ-৮৭
৫৫. জয়া চ্যাটার্জী : *বাংলা ভাগ হল*; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; ২০০৩; পরিশিষ্ট ১; পৃ. ৩১৭-৩১৮
৫৬. তপন রায় চৌধুরী : *ইউরোপ পুনর্দর্শন*; আনন্দ পাবলিশার্স; ১৯৯৫; পৃ. ৬৩
৫৭. বিস্তারিত আলোচনা; পার্থ চট্টোপাধ্যায়; *ইতিহাসের উত্তরাধিকার : নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স; ১৯৯৯; পৃ. ১২১-১৬০
৫৮. অনুরাধা রায়; জাতি সৃজনের জটিলতা : উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মুসলমান ভাবনা; *আকাদেমি পত্রিকা;* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী; সংখ্যা-১৩; জুন ২০০১; পৃ. ১০৭, ১১২
৫৯. থাপার, মুখিয়া, বিপান : *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা;* কলকাতা ১৯৭৬; পৃ. ৭১
৬০. সুরজিৎ; পূর্বোক্ত; পৃ. ৪৭, ৫৪
৬১. Sufia Ahamed; ibid; o. 210
৬২. সুরজিৎ; পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৯
৬৩. জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড; রাজনীতির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি : ১৯০৬-১৯৪৭; *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড; এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০০০; পৃ. ২২৩
৬৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : অগ্নিযুগের বাংলার বিপ্লব মানস; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স; কলকাতা; ১৯৯৭; পৃ. ৩৯
৬৫. পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৮
৬৬. পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৩
৬৭. সুররিৎ; পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৯
৬৮. বদরুদ্দীন উমর : *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি;* চিরায়ত প্রকাশন; কলকাতা; ১৯৮৭; পৃ. ১৮
৬৯. সন্দীপ; পূর্বোক্ত; পৃ. ৭৫
৭০. সুরজিৎ; পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৬-৩৭
৭১. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক; *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন;* বাংলা একাডেমী; ১৯৯৫; পৃ. ১৫, ১৭, ২১
৭২. পূর্বোক্ত; পৃ. ২১
৭৩. ইনাম-উল-হক কর্তৃক মুইনদ্দীন আহমদ খান সংকলিত *Selections from Bengal Government Record on Wohabi Trials (1863-70)* থেকে উদ্ধৃত; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩
৭৪. ইনাম-উল-হক; পূর্বোক্ত; পৃ. ২৩
৭৫. *রচনাবলী*; পৃ. ২৩৭
৭৬. সুনীতি কুমার ঘোষ : *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*; নিউ হরাইজন বুকট্রস্ট; কলকাতা; ২০০১; পৃ. ২৮, ২৯
৭৭. সুমিত সরকার; *আধুনিক ভারত; ১৮৮৫-১৯৪৭;* কে পি বাগচী; কলকাতা; ১৯৯৩; পৃ. ৯, ১০

ইতিহাসের দর্শন

গত কয়েক দশকের 'ইতিহাস' সংক্রান্ত বিতর্ক যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে তা উপেক্ষা না করেই বলা যায় আমরা এমন একটি দেশে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি যেখানে 'ইতিহাস' ও 'ইতিহাসের দর্শন' সংক্রান্ত প্রশ্নে সরব বিতর্ক নতুনভাবে শুরু ও তা তীব্র করে তুলতে হবে বলে মনে করি। এখন এ বিষয়টি আর উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের বিভাগীয় কলাকৌশলে বা মামুলি ধরনের অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃত্তে আটকে রাখা যাবে না; আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে এই বিতর্ক ও ফয়সালা জরুরি হয়ে পড়েছে। ধরা যাক, সম্প্রতি রামুতে উপাসনালয়সহ বৌদ্ধদের উপর হামলার ঘটনাটি বা ঘাড়ের উপর রোহিঙ্গা সমস্যা এদের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে কি না তা আদৌ আলোচনার বিষয় হতে পারছে না। তর্ক-বিতর্ক তো দূরের কথা। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আরাকান, বৌদ্ধ-মুসলমান দ্বন্দ্ব, নিয়ত ত্রাস, আতঙ্ক ও মৃত্যু—এসব যেন নেহায়েতই পরিবেশিত সংবাদ মাত্র। অথবা ইতিহাস বহির্ভূত ঘটনা।

যেমন আরো ধরা যাক; ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ, পলাশী, ঔপনিবেশিকতা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষক সংগ্রাম, রেনেসাঁ, জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার জন্য ভারতের জাতীয় যুদ্ধ (১৮৫৭), ১৯০৫, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ, সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, ক্ষমতা হস্তান্তর (১৯৪৭) ইত্যাদি বিষয়গুলো বহুল আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঐতিহাসিক, গবেষক বা তাত্ত্বিকরা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রায়শ ভিন্ন ভিন্ন এমন কি বিপরীত সিদ্ধান্ত টেনেই চলেছেন।

দু'শ পঞ্চান্ন বছর আগে থেকে পলাশী নিয়ে যে সব মিথ্যাচারের শুরু তার অনেকগুলো বিষয় আজও বহাল আছে। শুধু জটিলতা বাড়ানো। তথ্য সন্নিবেশের বিপুলতা বাড়লেও পুরনো বিতর্কগুলোর পক্ষ-বিপক্ষতা ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও প্রায় যেন একইভাবে থেকে গেছে। এ-ও দেখা যায়, অনেক ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাদাতা ইতিহাসবিদদের যুক্তিতর্ক পেশের পেশীবহুল যোগ্যতা, ঐতিহাসিকের তথ্য বিশ্লেষণের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে পরাভূত করার কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, হ্যালহেড ও ফোর্ট উইলিয়াম থেকে দুশো বছর ভারতীয় লেখক, ঐতিহাসিক ও পরবর্তীতে রাজনীতিবিদগণ উপনিবেশিক নীতিনির্ধারক, প্রশাসক,

লেখক ও ঐতিহাসিকদের মতামতকে প্রশ্রয় দিয়ে ধর্মীয় অনুপ্রেরণাসহ একটা অখণ্ড ভারতীয় একজাতিতত্ত্ব নির্মাণে ক্রমাগত সক্রিয় থাকেন। অদ্যাবধি যা মোটা দাগে বহাল রয়েছে। এই প্রশ্নে মার্কসবাদী এমন কী ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের একাংশের বিরোধিতা এখনও স্পষ্ট স্বতন্ত্র কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারে নি।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও বিকাশ, ধর্মীয় বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি আদায় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশগুলির জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নির্মাণ করার প্রশ্নে সচেতন বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আগ্রাসী অখণ্ড ভারতীয় একজাতিতত্ত্বের মোকাবেলা করতে 'শ্রেণী' ও 'সাম্রাজ্যবাদ'কে অমীমাংসিত রেখে, অন্যান্য প্রতিকূল প্রবণতার বিরুদ্ধে যথাযথ লড়াইয়ে প্রশ্নে ছাড় দিয়ে ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সীমানায় আবদ্ধ থেকে বিপজ্জনক খাদে পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাছাড়া কোন দেশের শাসকশ্রেণি এই প্রশ্নে আগুয়ান হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে। যেমন— পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মতান্ধতার ভিত্তিতে ভারত বিরোধিতা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এ ধরনের লক্ষণ বিদ্যমান আছে।

লক্ষ্য করা গেছে উচ্চ মূল্যে কেনা এবং কম মূল্যে বিক্রি হয়ে যাওয়া দুই-দুইটি 'স্বাধীনতা'র পরিণতি। অর্জন জনগণের হাতেই আসে নি, বেহাত হয়ে গেছে। '৪৭ ও '৭১-এর উদ্বাস্তু হওয়া এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনদান অনেকাংশেই বৃথা গেছে।

'৪৭ ও '৭১ এ জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি সময়, নীতি, নেতৃত্ব ও পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে অমীমাংসিত থাকার ফলে দেখা গেছে বিশেষ সময়ে উপরিকাঠামোতে ধর্ম ও ভাষা বিকল্প প্রকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যেতে পারে। আবার ভাষা ও ধর্মকে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে ঠেলে দেবার চেষ্টা চলতে পারে— উভয়ক্ষেত্রেই ন্যায্যতার স্বীকৃতি বা অনুমোদনের জন্য গণবিরোধী গোষ্ঠী ও শ্রেণি মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ পেয়ে যায়।

ভারত বিভক্তির সময় এই জনপদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গাঢ় মুসলমান ও পাকিস্তান বিভক্তির সময় প্রগাঢ় (রক্ত ঝরেছিল প্রচুর) বাঙালি এই দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল নেতা ও শক্তি। বাংলাদেশ একাত্তর উত্তরকালীন কয়েক দশক অতিক্রান্ত একটি দেশ বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও সাতচল্লিশের মানসলোক একাত্তরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত। উপমহাদেশের প্রেক্ষিত এর অন্যতম কারণ। উভয় পর্বেই 'শ্রেণি' ও 'সাম্রাজ্যবাদ' বরং আরো শক্তিশালী হয়েছে। 'বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়কে' বিভক্ত করার প্রয়োজনীয় উপাদান সমাজের ভেতরেই থেকে যাওয়ার সুযোগে বিশেষ বিশেষ সময়ে এইসব উপাদান প্রগতির দ্বার রুদ্ধ করার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। 'মুসলমান ও বাঙালী' এই অশুভ প্রচেষ্টা সময়ে মাথা তোলে— ভাবখানা এই জনপদে অন্য ভাষাভাষী বা

ধর্মের লোক বাস করে না বা যেন অন্যকোন গুরুতর সমস্যা বলে কিছু নেই। নেই শ্রেণি ও বিদেশী প্রভূদের সমস্যা। নেই সংখ্যালঘু জাতিসত্তা— বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সমস্যা।

'৪৭-এর পর অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে আমরা এক জটিল অবস্থার মধ্যে রয়েছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়া, মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের বিপুল স্বল্পতা ও নীচুমান, পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সাহায্য করেছে। গণবিরোধী শক্তির আগ্রাসন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে যেভাবে জোট বেঁধে চলেছে বিপরীতে মোকাবেলা করার শক্তির জোট তেমন অর্থবহ হয়ে উঠতে পারছে না।

এই যে দুর্বলতা এর অন্যতম প্রধান কারণ হল, '৭১-উত্তরকালে দেখা গেল আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝাতো, বাঙালি মুসলমান বুর্জোয়া শোষকদের উগ্র শাসনব্যবস্থা, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর শোষণ নির্যাতন এবং বাঙালির ইতিহাস ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিসেব করার ব্যবস্থা। সম্ভব হলে তারা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে শকাব্দের মতো এক নোতুন সাল গণনাও শুরু করতো। হাস্যকর শোনালেও এটাই এখানকার উগ্র জাতীয়তাবাদীদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদের মর্মার্থ।

এই মানসিকতা একটু সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সুপ্ত শক্তিকেও চিহ্নিত করা যাবে। কারণ আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না। কাজেই আওয়ামী লীগ শাসন ও পরবর্তী পর্যায়ে একের পর এক বাঙালি বুর্জোয়া শাসন আমলে এদেশে দ্রুতগতিতে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ তার মুখোশ ছিন্ন করে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এখানে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হলো, সমাজের উপরিকাঠামোতে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, এভাবে যে গাঁট বন্ধন বা ঐক্য বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেটা রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই জাতীয়তাবাদীদের মানসলোকের গভীর দেশে এই একই ঐক্যস্রোত প্রবাহিত হয়ে সামগ্রিকভাবে তাদের সংস্কৃতিতেও বেশ স্পষ্টভাবেই ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার নানা লক্ষণের প্রতিফলন ঘটায়।

সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রের এই সব উপাদান শিক্ষিত সমাজের এবং শ্রমজীবীদের একটা অংশেরও চিন্তাকে বিকশিত, উন্নত, পরিমার্জিত ও প্রগতিশীল না করে তার ঠিক বিপরীত ধারাকেই দৃষ্টির অগোচরে শক্তিশালী করে। এই ধারা সাধারণভাবে বাঙলাদেশের মধ্যবিত্তের এবং নব্য ধনিক শ্রেণির চিন্তাধারা গঠনের ক্ষেত্রে বিস্তার করে প্রবল প্রভাব।

বাঙালি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তের মানসলোকের এই গঠন প্রক্রিয়া যে হঠাৎ

করেই ১৯৭১ সালের পর শুরু হয় নি, উপরন্তু পাকিস্তানী আমল থেকে তার একটা ধারাবাহিকতা ছিলো এটা আগেই বলা হয়েছে।[১]

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেনাপতি জিয়াউর রহমান যেমন ফাঁকা মাঠ পেলেন তেমনি তিনি অতি সহজেই মুসিলম লীগ, ন্যাপ ভাসানী ও প্রাক্তন পিকিংপন্থীদের এক বড় অংশকে জড়ো করে বিএনপি গঠন করতে পারলেন (অবশ্য অন্যান্য ইসলামী শক্তিও এই প্রক্রিয়ায় যোগ দিলেন)। তিনি বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ থেকে বলতে গেলে 'বাঙালী আত্মপরিচয়' ও প্রায় সহস্র বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বাদ দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। এরপর সেনাপতি এরশাদ জিয়াউর রহমানের পথ অনুসরণ করে বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ সব দল থেকে লোক সংগ্রহ করে জাতীয় পার্টি গঠন করলেন। এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দিলেন। এই উভয় পর্বে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও ধর্মীয় সুবিধাবাদীদের প্রাধান্যকে আওয়ামী লীগ উমর বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন লড়াই করতে পারে নি বরং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলরা দুঃখজনক ভাবে আওয়ামী-বাকশালী ধারা ও জিয়াউর রহমান-এরশাদের ধারায় বিভক্ত হয়ে গেলেন। এবং নিজেদের স্বাধীন-সত্তাকে প্রায় ধ্বংস করে দিলেন। কথিত পিকিংপন্থীদের একাংশ যেমন জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সঙ্গে ভিড়লেন তেমনি মস্কোপন্থী বা সিপিবি থেকে কর্মী ও নেতৃত্বের এক বড় অংশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল শক্তি এখন সাম্রাজ্যবাদের দালাল দুটি ধনীক শ্রেণির রাজনৈতিক জোটের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের আবর্তে পাক খেতে খেতে বিপজ্জনক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন।

২

ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গে বলা যায় যেমন 'ইতিহাস' তেমনি 'দর্শন' কোনোটির বিষয়ে আসলে সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই— যেমন নেই 'ইতিহাসের দর্শন' সম্পর্কে। নানাবিধ ঘটনা পরম্পরায় পরিবর্তনশীলতার ছাপ পড়তে থাকবেই।

যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি, লেনিন-বর্ণিত ফিনান্স পুঁজির ৫৫-৬০ বছর পর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নিও-লিবারেল ধারণা— আর্থিক খাত ও পুঁজি-হিসাবের উদারীকরণ-এর চাপ, নেটওয়ার্ক, মহাকাশ ও পারমাণবিক প্রযুক্তিসহ 'উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল' এবং 'সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা–উত্তেজনা' (কমিউনিস্ট ইশতেহার), বির-তিহীন যুদ্ধাবস্থা (ড্রোন, মাইন, রকেট উৎক্ষেপণ, স্পেস সেন্টার ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ সমরাস্ত্র শিল্পে উচ্চতর প্রযুক্তির ব্যবহারে বিস্ময়কর অগ্রগতি যুদ্ধাবস্থার গতিশীলতা বহুগুণে বাড়িয়েছে) ও জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির প্রেক্ষিতে

অতি দ্রুততায় এর সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন সব বক্তব্য এমনভাবে আছড়ে পড়ছে যে, সেইসব বক্তব্যের গ্রহণ-বর্জন অথবা ধাতস্থ প্রক্রিয়া অন্তত নির্দিষ্ট মাত্রায় বোধগম্য না-করে ইচ্ছে মতো ইতিহাসের এক কোণে অনড় থাকাকে যথাযথ বলা যাবে না।

'সংজ্ঞা' সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বসম্মত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

যে দেশটির রয়েছে দু'শো বছরের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা— এখনো সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত, — এবং যোগ হয়েছে এখনকার প্রায় প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সর্ব ক্ষেত্রে যার এমনভাবে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ, এমনকি এই সব প্রশ্নে সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর স্পর্শকাতর বিভাগগুলোতেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি, এমনকি পাঠ্যসূচি প্রণয়নকারীরা সরকার, শ্রেণি, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অবনত অবস্থায় থাকলে এর বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থ সচেতনতা, সংঘবদ্ধ হওয়া ও লড়াইয়ের প্রশ্নকে বানচাল করার জন্য যখন দেশি-বিদেশি অর্থপুষ্ট আয়েশে তৈরি করা বিচিত্র সব তাত্ত্বিক খড়্গ মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিয়ে সর্বদা সব ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করতে থাকে তখন সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকমণ্ডলীর এক বড় অংশ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তাঁরা চাকরি, প্রমোশন, উচ্চডিগ্রি, কনস্যালটেন্সি, বিদেশযাত্রা, এমনকি এই ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করেও ক্ষমতাসীন দলের সহজেই অনুগত হতে পারেন।

সমাজ থেকে উদ্ভূত এবং যত দিন দ্বন্দ্ব সংঘাত তত দিন বিভিন্ন প্রবণতার সক্রিয়তাকে মান্যতা দিয়েও বলা যাবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে পক্ষতা প্রশ্নে ক্রমাগত রহস্যময় শব্দগুচ্ছের আড়ালে থাকার অপচেষ্টাকে অনুমোদন দেয়া যায় না। ঐতিহাসিকরা যখন স্পষ্ট হতে অস্বীকার করেন তখন গণবিরোধী রাজনীতিবিদ ও এমনকি তাদের ক্যাডাররা ঘাড়ে হাত রাখে।

অনেক বছর আগের কথা, একজন বেশ বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন, আমার বিশ্বাস সাধারণ একজন তত্ত্বীয় দার্শনিকের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটালেও (অন্তত, ছুটির সময়) জানা যাবে না যে তিনি ভাববাদী না বস্তুবাদী, কিন্তু আমার মনে হয় না কোনো মার্কসবাদীর সঙ্গে একদিন মাত্র কাটালেও তাঁর মতবাদ কি তা অজানা থাকবে।[২] ১৯৩৮ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক দর্শনের উপর প্রদত্ত বক্তৃতামালায় হ্যালডেন মন্তব্যটি করেন।

এখন আর সে সময় নেই। তবে আমার মনে হয় একজন তত্ত্বীয় উত্তর-আধু-নিকতাবাদী বা তত্ত্বীয় উত্তর-উপনিবেশবাদী এমনকি একজন তত্ত্বীয় সাবঅলটার্নের সাথে একদিনের কম সময় কাটালে এবং যদি সেটি ছুটির দিন না-ও হয় তবে তিনি যে কোনো সুযোগে জানিয়ে দেবেন মার্কসবাদ আগা-গোড়া একটা যাচ্ছেতাই

আবর্জনা; শুধু তাই নয়, খোদ ইতিহাস বলেই তো কিছু নেই। আর ইতিহাস বলেই যদি কিছু না থাকে তবে তার দর্শনের প্রশ্ন আসে কীভাবে! অবশ্য একজন তত্ত্বীয় সাবঅলটার্ন দাবি করবেন, আমাদের বিষয়বস্তুর এলাকা পূর্বের অবস্থানে থেমে নেই, প্রসারিত হয়েই চলেছে এবং প্রচলিত ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান-চর্চার অধিকাংশ রীতি নীতি-পদ্ধতিরই আমরা বিরোধিতা করি। এই বিরোধিতাই আমাদের প্রকল্পের চালিকাশক্তি।[৩] তবে দেখা যাচ্ছে প্রসারিত বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও নিরন্তর বিরোধিতা প্রকল্প গাঁটছড়া বাঁধছে উত্তর-আধুনিকতাবাদী ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদীদের সাথে। বিশ্বের বিপুল জ্ঞানী ও তাত্ত্বিকরা এখন দল বেঁধেছেন অন্তত একটি প্রশ্নে : মার্কসবাদকে পরাজিত করা যায় নি যদিও তবুও তারা এখন আশাবাদী, ইতিহাসের শেষ যেহেতু উদারতাবাদে সেজন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে হবে মার্কসবাদকে—সমাজতন্ত্রকে; আর বজায় রাখতে হবে ক্রিটিকাল এনগেজমেন্ট বা পুঁজিবাদের দৃষ্টিকটু অগ্রহণযোগ্য দিকগুলোর নিরন্তর বিরোধিতার একটা প্রকল্প। সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড আন্দোলন ধরনের কিছু একটা চালু থাকবে এবং পুঁজিবাদকে সংযত রাখার একটা প্রচেষ্টাকে (অতি পুরাতন কেচ্ছা) তত্ত্বায়ন করা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে তোতলানো এবং গণতন্ত্রের কথিত শ্রেষ্ঠ উপাদানের মহত্তম দিকগুলোর প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও চলবে। চলবে বহুজাতিক কোম্পানি, বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নিও-লিবারেলদের বিরোধিতার নামে মার্কসবাদবিরোধী এক ধরনের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম সৃষ্টির জন্য আবেদন রাখা। এবং এজন্য এনজিও, সিভিল সোসাইটি, ওয়ার্ল্ড স্যোশাল ফোরাম ধরনের সংগঠন ও সংগঠনের পক্ষে কার্যত অবস্থান গ্রহণ। এইসব কাজ হয়ে থাকে জাতীয়, আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক পরিসরে সেমিনার, বৈঠক, সম্মেলন ও বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ ধরনের কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রমাণ করা হয় যে এই প্রক্রিয়াগুলো হলো আপাদমস্তক পুঁজিবাদবিরোধী।

এক ধরনের সমাজতন্ত্রের কথাও চালাচালি করা মন্দ নয় যা কিনা মার্কসবাদ দূষণ মুক্ত হবে। আর চলবে পুঁজির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মার্কসকে মাঝে মধ্যে হাজির করা—দেখ মার্কস কেমন কায়দায় 'পুঁজি' সম্পর্কে ক্রিটিক্যাল ছিলেন।

এতে ঝামেলা বেশ বেড়েছে। ইতিহাসচর্চার ঘরানা হিসেবে যাঁরা পুরনো মার্কসবাদবিরোধী তাঁদের অনেকে হয়তো জানেনই না এই প্রশ্নে তাঁদের উত্তরসূরিরা সন্তোষের সাথে তাঁদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এবং সেই সাথে তাঁদের মতো পূর্বসূরিদেরও দৃশ্যত ধোলাইয়েও পিছ-পা নন। অর্থাৎ চেষ্টাটা হলো সেকেলে মার্কসবাদ-বিরোধীদের স্থূলতার সীমানা অতিক্রম করা, যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব-আতঙ্ক তাঁদের নেই। অথবা এই অস্তিত্বহীনতা তাদের আরো বেশি স্পর্ধিত করে তুলেছে।

সেক্ষেত্রে মার্কসবাদী ইতিহাস-চর্চায় যাঁরা আস্থাবান তাঁদের এখন কয়েক

পর্বের দায় পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশে তাঁদের পারদর্শিতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। এর আরো একটি কারণ আছে, তা হল এ বিষয়ে কথিত মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা গত শতাব্দীর ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছেন সেটিও বোঝা যায় না। অনেকে এই গর্বে আত্মহারা, ইতিহাস-চর্চা প্রসঙ্গে মার্কসবাদ যেসব নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তা জেনে সময় নষ্ট করে কী-ই বা লাভ! আমাদের চোখ তো অন্ধ নয়, প্রলয়ে কী-বা আসে যায়। এই ভাবে তাঁরা হয়তো তাদের অজান্তেই মার্কসবাদকে দাফন করার পুরনো অপচেষ্টার নতুন সংস্করণের সহায়ক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হন।

ইতিহাসের মালমশলার এবং একই সাথে ইতিহাস নিয়তই তার বিপুল ব্যাপ্তি ঘটিয়ে চলেছে। জ্ঞানের প্রায় এমন কোনো শাখা নেই যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত।

ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে মালমশলা ব্যবহার করি তাকে সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই ধরনে প্রধান দুটি শ্রেণিতে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্নতত্ত্বের আওতা থেকেই জন্ম নিয়েছে auxiliary sciences যা ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত সহায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।[৪]

কিন্তু এই অনুসন্ধানও গ্রাহ্য করার মতো :

> Since the end of the Second World War, it is anthropology, rather than history, which has led the revolt against the mutual segregation of the two disciplines within the domain of South Asian Studies. Cohn was not the only rebel; he was one of a number of scholars whose writings showed unmistakable signs of a rapprochement in this respect.[৫ক]

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে ইতিহাসের পরিবর্তে নৃবিজ্ঞানই দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা ক্ষেত্রে এই দুই শাস্ত্রের মধ্যকার পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বার্নাড কন-ই একমাত্র বিদ্রোহী ছিলেন না; তিনি ছিলেন সেসব বিদ্বানের একজন যাঁদের রচনাবলি এ বিষয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়েছেন (গুহ, ১৯৯৬, পৃ. ৮)।]

Bernard S. Cohn-এর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী—

> Over the last twenty-five years, there have been a number of efforts to bring together historians and anthropologists and to merge the approaches and methods of the two fields in a fruitful collaboration in teaching and research. This effort has at times been marked by success. But my impression after ten years as a student and practioner in both fields is that anthropologists and historians still stand far apart.[৫খ]

[বার্নাড কনে'র ভাষ্য অনুসারে বলতে গেলে, গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে ইতিহাসবিদ ও নৃবিজ্ঞানীদের একত্রিত করার শিক্ষা ও গবেষণায় ফলপ্রসূভাবে এই দুই শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হওয়ার অনেক প্রয়াস চালানো হয়েছে। একদা এই প্রয়াস কিছুটা সফলও হয়েছিল। তবে একজন ছাত্র ও চর্চাকারী

হিসেবে দশ বছর পর এই দুই ক্ষেত্রে আমার অভিমত হলো এই যে, এখনও নৃবিজ্ঞানীগণ ও ইতিহাসবিদগণ পরস্পর থেকে অনেক দূরে রয়েছে (কন, ১৯৯৬, পৃ. ১)।]

এই ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্রমাগত উদাসীন থাকা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হওয়ার প্রশ্ন উঠেছে molecular biology, neuro-science, cultural evolution ইত্যাদি।[৬]

তাছাড়া প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে প্রকৃতিতে ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন তাদের প্রতিক্রিয়া সমাজজীবনের সর্বত্র। ইতিহাসের পরিধির মধ্যে প্রবেশ ও অনুপ্রবেশ অনেক সময়ই ঠাওর করা মুশকিল। বর্তমানে তৃতীয় পর্বের ঔপনিবেশিকতা বা আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশ ও জ্বালানীসমৃদ্ধ দেশগুলোসহ প্রধানত তৃতীয় বিশ্বে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে আফ-গানিস্তানে ও পাকিস্তানের সীমান্তে সামরিক দখল অভিযানে প্রতিনিয়ত শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাসহ ব্যাপক জনগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে এবং যেখানে প্রতিরোধ সংগ্রামও বিস্ময়কর। এ ছাড়া যে সময় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্বই বিপন্ন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকের ভূমিকা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখানে তো অতীত, মধ্যকালীন অতীত ও সাম্প্রতিক অতীত চলমান বর্তমানের ভেতর দিয়ে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে—ঐতিহাসিক তো সব রকম মালমশলাই পাচ্ছেন। ষোড়শ শতাব্দীর পাল তোলা জাহাজ থেকে সপ্তম নৌবহর এবং সর্বশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ভয়ানক ধরনের মারণাস্ত্র দিয়ে সাজানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বিশাল সব নৌবহর যা সারা পৃথিবীকেই হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তা তো সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকরা পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছেন। ঐতিহাসিকরা যদি শুধু অতীত ব্যবসায়ী হন তাহলে আমাদের মতো গ্রাহকদের সটকে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার নিজের তরফে এই ধারণা বদ্ধমূল; ইতিহাস কাজে লাগে, লাগানো যায়—লাগানো উচিতও বটে। এবং এখানেই আসে ইতিহাসের দর্শনের প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে এখান থেকেই। বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সাথে সংযুক্ত থেকেও বলা যায় এই প্রশ্নে আমাদের প্রধান ক্ষেত্রটি হওয়া ভালো 'দক্ষিণ এশিয়া'। অবশ্য এটা সর্বদা মনে রাখা চাই যে, 'সাম্প্রতিক ইতিহাসের কোনো বড় সমস্যা আলোচনা কোনো ক্ষেত্রেই আমরা ঔপনিবেশিকতার ভূমিকাকে বাদ দিয়ে করতে পারি না।'[৭]

মধ্যযুগ ও পলাশী থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর আমাদের ইতিহাস চর্চার ধমনীতে নিয়ত দাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নিয়ে প্রবহমান। দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে ইতিহাস-চর্চা এখনও প্রতিক্রিয়ার পক্ষের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একে উলটিয়ে দিতে হবে। সংঘবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া এ কাজ অসম্ভব। এ হল বড় ধরনের সংগ্রাম। একে যত দিন তুচ্ছ করে চলা হবে

ততদিন ইতিহাসের দায় ক্রমাগত সুদসহ বাড়তেই থাকবে।

আমি নিশ্চিত, আজকের পরিস্থিতি দাবি করে ইতিহাসকে কাজে লাগানোর প্রশ্নে পক্ষাবলম্বনে দ্বিধাহীন হতে।

৩

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে 'ইতিহাসের শেষ' দিয়েই আলোচনা শুরু করা যায়: ফুকুয়ামার *The End of History and the Last Man* ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এর উপক্রমণিকায় বলেন, ১৯৮৯ সারে *The National Interest*-এয গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায় তিনি "The end of history?" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর ভাষায় এর মূল প্রতিপাদ্য হল : In it, I argued that a remarkable consensus concerning the legitimacy of liberal democracy as a system of government had emerged throughout the world over the past few years, as it conquered rival ideologies like hereditary monarchy, fascism, and most recently communism. More than that, however, I argued that liberal democracy may constitute the end point of mankind's ideological evolution and the final form of human government, and as such constituted the end of history.[৮]

[আমি এতে যুক্তিসহকারে দেখানো চেষ্টা করেছি যে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্বব্যাপী সরকারব্যবস্থা হিসেবে উদার গণতন্ত্র বিষয়ক উল্লেখযোগ্য ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ এবং অতি সম্প্রতি সাম্যবাদের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শসমূহকে পরাজিত করেছে। যা হোক, তাছাড়া আমি এই যুক্তি দিয়েছি যে, উদার গণতন্ত্র হয়তো মানবজাতির ভাবাদর্শগত বিবর্তনের শেষ বিন্দু এবং মানবিক সংস্কারের চূড়ান্ত রূপ গঠন করবে এবং এভাবে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে (এফ. ফুকুয়ামা, ১৯৯২, পৃ ১১)।]

তিনি 'Government'-এর সীমানা অতিক্রম করে 'ইতিহাস' সংক্রান্ত যাবতীয় ধারণাকেই সম্পূর্ণ উপড়ে ফেললেন। এবং এখানে আধুনিক ফুকুয়ামার পাশে শরীর লেপ্টে এসে দাঁড়ালেন উত্তর-আধুনিকরা। অবশ্য একেবারে মিশে যেতে চাইবেন না তাঁরা। ফুকুয়ামার মতো অতটা 'সরাসরি' হওয়াটা তাঁদের পাণ্ডিত্যকে আহত করে।

ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করে-দেয়া ফুকুয়ামাদের ঘোষণা অনুযায়ী ইতিহাস কিন্তু শেষ হয়ে গেল না। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক নতুন হুমকি ধীরে কিন্তু শক্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল Variously branded from Islamic front. (সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী চলছিল এবং চলছে শুধুমাত্র ইসলামী ফ্রন্ট থেকে নয়)। সাম্রাজ্যবাদীরা এই নতুন 'evil threat'কে 'Islamic fundamentalism', 'radicalism' 'militancy' 'extrem-ism', 'resurgence', 'Islamism', and 'Political Islam' বলে western me-

dia'র রাজনৈতিক পরিভাষায় আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে।

অতঃপর বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগণের কলিজার উপর ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, সারাবিশ্ব বিশেষ করে মার্কিনিদের হতবাক করে দিয়ে যে ভয়াবহ আক্রমণের শুরু তা ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বব্যাপী।

> With the end of the cold war, if Francis Fukuyama saw history buried under the rubble of the Berlin Wall and asked us to 'witness' not just the passing of a particular period of post-war history, but 'the end of history' as such, the endpoint of mankind's ideological evolution, he is squarely proved short-sighted and wrong within a mere decade or so.[৯]
>
> [স্নায়ু যুদ্ধের সমাপ্তির সাথে, যদি ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা দেখতে পেতেন বার্লিন প্রাচীরের ধ্বংস্তূপের নিচে ইতিহাস সমাহিত হয়েছে এবং যুদ্ধ-উত্তর ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো পর্বের ঠিক অতিক্রম নয় তবে ইতিহাসের সমাপ্তির সাক্ষী হতে বলেন, যেমন, মানবজাতির ভাবাদর্শগত বিবর্তনের শেষ বিন্দু, তিনি কেবল এক দশক বা এমন সময়ের মধ্যেই ন্যায়সঙ্গতভাবে অদূরদর্শী ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হবেন (অসীম রায়, ২০০৬, পৃ ৩)।]

ফুকুয়ামা কিন্তু তার উপরে বর্ণিত বক্তব্যেই থেমে থাকেন নি। অর্থাৎ অসীম রায়ের বক্তব্যেই ফুকুয়ামার সব ভাষ্যের শেষ উত্তর সেটা ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই—সে দাবি অসীম রায় অবশ্য করেন নি।

ফুকুয়ামা ইতিহাসের দর্শন-সংক্রান্ত প্রশ্নে কান্ট, হেগেল ও মার্কসকে Universal history'র ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিসেবে গণ্য করেছেন। এরা ইতিহাস যে একটা পর্বে শেষ হবে এই বিশেষ ইতিহাসতত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন। Kant suggested that history would have an end point, that is to say, a final purpose that was implied in man's current potentialities and which made the whole of history intelligible, ইত্যাদি।

> [কান্ট বলেছেন যে, ইতিহাসের একটা শেষ সীমা থাকবে, বলা যায়, একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য, যা মানুষের বিদ্যমান সম্ভাবনার মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যা সামগ্রিক ইতিহাসকে বোধগম্য করেছে।]

কান্টের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তাঁর ষাট বছর বয়সে, ১৭৮৪ সালে। প্রবন্ধটির নাম An Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View./ The Idea of a Universal History with Cosmopolitan intent. যদিও প্রবন্ধটি ছিল মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার তবুও দেখা গেল ভবিষ্যতের জন্য এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে তা সক্ষম হল। তিনি মনে করেন তাঁর বক্তব্যকে পূর্ণতা দিতে দরকার হবে এমন একজন প্রতিভাধর দার্শনিকের যিনি একই সাথে হবেন একজন ঐতিহাসিকও বটে, who could assimilate the history of all times and all peoples into a meaningful whole. Hegel, like Kant, defined his

project as the writing of Universal History...

> [অর্থপূর্ণ একটা সমগ্রের মধ্যে যিনি সমগ্র ইতিহাস ও সকল জনগোষ্ঠীকে আত্মস্থ করতে পারেন। কান্টের মতো হেগেলও বিশ্ব ইতিহাস লিখন হিসেবে নিজের প্রকল্পকে সংজ্ঞায়িত করেন।]

যদিও হেগেল কান্টের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি প্রকল্পকে নির্দিষ্ট পরিপূর্ণতায় বিকশিত করতে সক্ষম হন তবুও দেখা যায়, Hegel has frequently been accused of worshipping the state and its authority, and therefore of being an enemy of liberalism and democracy.

> [প্রায় সময় হেগেলকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের উপাসক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় এবং তিনি উদারবাদ ও গণতন্ত্রের একজন শত্রু হিসেবে বিবেচিত হন।]

কিন্তু ফুকুয়ামা মনে করেন এই পরিচয় হেগেলের আসল পরিচয় নয়। Hegel was the philosopher of freedom, who saw the entire historical process culminating in the realization of freedom in concrete political and social institutions. এবং the philosopher who justified preservation of a large realm of private economic and political activity independent of the control of the state.

> [হেগেল ছিলেন স্বাধীনতার দার্শনিক, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাদীনতার বাস্তবায়নে তিনি সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্তকরণ দেখেছিলেন। এবং তিনি এমন একজন দার্শনিক ছিলেন যিনি রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশাল ক্ষেত্র সংরক্ষণের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন।]

এবং এখানে ফুকুয়ামা তাঁর প্রয়োজনীয় উদারবাদের পক্ষে হেগেলকে পুনঃনির্মাণ করে নিলেন। ফুকুয়ামা স্মরণ করেছেন, হেগেল হলেন the first historicist philosopher—that is, a philosopher who believed in the essential historical relativity of truth.

> [হেগেল হলেন একজন ইতিহাসবাদী দার্শনিক অর্থাৎ এমন একজন দার্শনিক যিনি সত্যের অপরিহার্য ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতায় বিশ্বাস করেন।]

ফুকুয়ামা মার্কসের পর্বে এসে অভিযোগ তুললেন :

> From the moment Hegel formulated his system, people were not inclined to take seriously his claim that history ended with the modern liberal state. Almost immediatedly, Hegel came under attack from the other great nineteenth-century writer of a Universal History, Karl Marx.

[হেগেল যখন থেকে তাঁর ব্যবস্থা সূত্রাবদ্ধ করেন, আধুনিক উদার রাষ্ট্রের সাথে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে তাঁর এই দাবি জনগণ আন্তরিকভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। হেগেল প্রায় সাথে সাথেই, উনিশ শতকের বিশ্ব ইতিহাসের অন্য একজন মহান লেখক কার্ল মার্কসের আক্রমণের মুখে পড়েন। অর্থাৎ হেগেল হলেন আধুনিক উদারনৈতিক রাষ্ট্রের দার্শনিক এবং এই বিশেষ রাষ্ট্রীয় রূপে এসে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে।

Marx accepted from Hegel a view of the fundamental historicity of human affairs, the notion that human society has evolved over the course of time from primitive social structures to more complex and highly developed ones.

[কার্ল মার্কস হেগেলের কাছ থেকে মানবিক বিষয়াদির মৌলিক ইতিহাসবাদের একটি অভিমত গ্রহণ করেছেন, সেই ধারণাটি হলো মানবসমাজ কালক্রমে আদিম সমাজ কাঠামো থেকে অধিকতর জটিল এবং অতিমাত্রায় উন্নত সমাজে বিবর্তিত হয়েছে।]

কিন্তু–

Marx shared Hegel's belief in the possibility of an end of history. That is, he foresaw a final form of society that was free from contradictions, and whose achievement would terminate the historical process.

[ইতিহাসের সমাপ্তির সম্ভাবনাময় হেগেলের বিশ্বাসের সাথে কার্ল মার্কসও সহমত পোষণ করতেন। অর্থাৎ তিনি সমাজের একটা চূড়ান্ত রূপ দেখতে পান যা বিরোধমুক্ত এবং যার অর্জন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উচ্ছেদ ঘটাবে।]

মার্কস (মার্কসীয় দর্শনের প্রশ্নে এঙ্গেলসকে মার্কস থেকে আলাদা করার যে কোনো চেষ্টাই হবে চক্রান্তমূলক) যেহেতু এই ইতিহাসতত্ত্বের শেষ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক সেজন্য মার্কস সম্পর্কে ফুকুয়ামার মূল কথাটা হল :

Where Marx differed from Hegel was over just that kind of society emerged at the end of history, Marx belived that the liberal state failed to resolve one fundamental contradiction, that of class conflict, the struggle between the bourgeoisie and proletariat, Marx turned Hegel's historicism against him, arguing that the liberal state did not represent the universalization of freedom, but only the victory of freedom for a certain class, the bourgeoisie.[১০]

[হেগেলের সাথে মার্কসের মতপার্থক্য ছিল শুধু ইতিহাসের সমাপ্তিতে উত্থিত সমাজের ধরন বিষয়ে। মার্কস বিশ্বস করতেন যে, উদার রাষ্ট্র একটি মৌলিক বিরোধ সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, তা হলো শ্রেণি বিরোধী, বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যকার সংগ্রাম। মার্কস হেগেলের ইতিহাসবাদকে তাঁর বিরুদ্ধেই দাঁড় করান।

তিনি যুক্তি সহকারে বলেন যে, উদার রাষ্ট্র স্বাধীনতার সর্বজনীনকরণ উপস্থাপন করে না, তবে শুধু একটি শ্রেণি, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বাধীনতার বিজয় ঘোষণা করে (ফুকুয়ামা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৬৫)

অর্থাৎ ফুকুয়ামা হেগেলের সাথে মার্কসের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে শুধুমাত্র 'জাস্ট'-এর মতো সামান্য কিছু বেশি মাত্র খুঁজে পেয়েছেন। ইতিহাসের শেষে সমাজব্যবস্থাটা কেমন হবে এটিই শুধু হেগেলের সাথে মার্কসের পার্থক্য। তাছাড়া মার্কসের পর্বে এসে তিনি মার্কসকে একজন 'লেখক' হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন।

আসলে এই সাথে যে বিশ্ব, শ্রেণিবিভক্ত মানবজাতির অগ্রগতি ও পরিণতির সমস্যা প্রসঙ্গে সমাজবিকাশের গতিসংক্রান্ত নিয়মাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি ইতিহাস দর্শনের উদ্ভব ঘটে গেল সে সম্পর্কে ফুকুয়ামা চুপ।

হেগেল যেখানে সম্ভাব্য পরিণত বুর্জোয়া শ্রেণি ও রাষ্ট্রের শক্তিমত্তার প্রবক্তা সেখানে মার্কসের অবস্থান একেবারেই বিপরীতে। বুর্জোয়া শ্রেণি ও রাষ্ট্র চূর্ণ করা–সম্পূর্ণ উৎখাত করা এবং শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। হেগেলের মতে যেখানে প্রাশিয়ান রাষ্ট্র পরম সত্তার চরম পরিণতি সেখানে মার্কস এর প্রায় চার দশক পরে *লুই বোনাপার্ট*-এ ঘোষণা দিলেন : All revolutions perfected this machine instead of smashing it. The parties that contended in turn for domination regarded the possession of this huge state edifice as the principal spoils of the victor. ...And yet the state power is not suspended in mid air. Bonaparte represents a class,[১১]

[সকল বিপ্লবই রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করার পরিবর্তে এটাকে উৎকৃষ্ট করে তোলে। বিজয়ের প্রধান সুযোগসুবিধা হিসেবে এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপক স্বপ্নসৌধের দখল প্রসঙ্গে দলসমূহ পালাক্রমে কর্তৃত্বের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।...তথাপি রাষ্ট্রক্ষমতা মধ্য আকাশে মিলিয়ে যায় নাই। বোনাপার্ট একটা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছেন (মার্কস, ১৯৭৩, পৃ. ৪৭৭-৭৮)

অর্থাৎ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি।

শুধু হেগেল ও ফয়েরবাখের সঙ্গে নয় ঐ সময় পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর দর্শনের সঙ্গে চিরতরে হিসেব চুকিয়ে ফেলতে গিয়ে মার্কস বলেন, The philosophers have only *interpreted* the world, in various ways; the point, however, is to *change* it.[১২]

[দার্শনিকরা শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন, বিবিধ উপায়ে, যা হোক, আসল কথা হলো, এটাকে পাল্টাতে হবে (মার্কস, *নির্বাচিত রচনাবলি*, খণ্ড ১, ১৯৭৩, পৃ. ১৫)।]

চূড়ান্তরূপের ধারণা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার (দর্শনের) বিপরীতে যায়। ১৮৪৫ সারে *জার্মান ভাবাদর্শে* মার্কস-এঙ্গেলস প্রচলিত জার্মান দর্শনের

বিপরীতে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য হাজির করেন।

> Frederick Engels, with whom, since the appearance of his brilliant sketch on the criticism of the economic categories (in the *Deutsch-Französische jahrbücher), I maintained a constant exchange of ideas by correspondence, had by another road* (compare his *The Condition of the Working Class in England)* arrived at the same result as I, and when in the spring of 1845 he also settled in Brussels, we resolved to work out in common the opposition of our view to the ideological view of German philosophy, in fact, to settle accounts with our erst-while philosophical conscience. The resolve was carried out in the form of a criticism of post-Hegelian philosophy. *[The German Ideol-ogy.-ed.]*[১৩]
>
> [অর্থনীতিক সংজ্ঞা-বিভাগের (economic categories) সমালোচনা প্রসঙ্গে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের চমৎকার স্কেচটি (*Deutsch-Franzosische Jahrbucher* পত্রিকায়) প্রকাশের পর থেকে পত্রালাপের মাধ্যমে আমি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ভাব-বিনিময় রক্ষা করেছি, তিনিও অন্য পথ দিয়ে (তাঁর 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা'র মিলিয়ে দেখুন) আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন। তাই ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে যখন তিনিও ব্রাসেল্‌স্-এ এসে বসবাস করতে লাগলেন, তখন আমরা স্থির করলাম যে, জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব-নিকশ মিটিয়ে নেব। আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনারূপে (মার্কস-এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলি*, খণ্ড ১, ১৯৭৩, পৃ. ৫০৪-৫০৫)।]

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত *অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বলেছেন কীভাবে ১৮৪৫ সালে ব্রাসেল্‌সে 'জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি' অর্থাৎ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যা প্রধানত মার্কসের-ই রচনা, 'আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নেব' বলে স্থির করেছিলাম। 'আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনা-রূপে।'[১৪] (এঙ্গেলস, *রচনা সংকলন*, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৭২, পৃ ৪১)

এই সময়কালে মার্কস-এঙ্গেলসের বয়স যথাক্রমে ২৬ ও ২৪ বছর। এর আগেই মার্কস রচনা করেছেন *Contribution to the Critique of Hegel's Philosopy of law.* মার্কসবাদবিরোধী পণ্ডিতরা তরুণ মার্কস প্রীতি দেখিয়ে আসছেন দশক দশক দশক ধরে। এই প্রশ্নে তাদের মস্তিষ্ক কচলানির খাসিলত মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে। তরুণ মার্কস (১৮৪৩-৪৪) বৃদ্ধ হেগেলের বিরুদ্ধে

(তিনি তখন যদিও মৃত) শুধুমাত্র সংবিধান প্রশ্নে কিভাবে বাহাস করেছিলেন তার একটি অতিক্ষুদ্র নমুনা : 'Certainly, entire state constitution have changed in such a way that gradually new needs arose, the old broke down, etc.; but for a new constitution a real revolution has always been required.[১৫]

> [নিঃসন্দেহে, সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এমনভাবে পরিবর্তন হয়েছে যে, ধীরে ধীরে নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়, পুরানোটা ভেঙ্গে চুরমার হয় ইত্যাদি : তবে একটা নতুন সংবিধানের জন্য সর্বদা প্রকৃত বিপ্লবের প্রয়োজন। (মার্কস, *সংকলিত রচনাবলি*, খণ্ড ৩, ১৯৭৫, পৃ. ৫৬)।]

এখন এই খাঁটি বিপ্লব সংগঠিত হবে কিভাবে? মার্কস পরবর্তীতে বললেন, Revolutions are not made with laws. [অর্থাৎ বিপ্লব আইনের দ্বারা সংগঠিত হয় না। পথ কি?] মার্কস ঐ অধ্যায়েই বললেন, Force is the midwife of every old society which is pregnant with new one. [এক নতুন সমাজ সত্তায় গর্ভবতী প্রত্যেক পুরনো সমাজের ধাত্রী হলো শক্তি/বলপ্রয়োগ।][১৬] (Karl Marx-*Capital,* Vol-1, 1990.)

ফুকুয়ামার নির্ভেজাল বাচালতা নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। এখন আমরা আলোচনা করবো ফুকুয়ামার প্রধান যে বিবেচ্য, *কমিউনিস্ট ইশতেহারের* ১৪০ বছর পর monumental failure of Marxism, যা অবধারিত ছিল, সেটিকে নিয়ে।

কান্ট, হেগেল ও মার্কস যে ইতিহাসদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখন তা মহাবাচনিক ইতিহাস তত্ত্ব হিসেবে বেশি পরিচিত। এরা তিনজনই ছিলেন মহান দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। চলমান ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান মৌলিক উপাদান যা ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে সক্রিয় আছে তা অনুসন্ধান করেছেন এবং ভিন্নতাসহ তিনজনই অগ্রগতির মধ্যে যুক্তি ও ধারা-পরম্পরা আছে তা গ্রহণ করেই এগিয়েছেন।

এদের বক্তব্য অনুযায়ী ইতিহাসের গতি অভিপ্রায়মুখী-লক্ষ্য ও অর্জনসাপেক্ষ। তখন তার মধ্যে ক্রমাগত অগ্রগতির নির্দিষ্ট নিয়মাবলির অস্তিত্ব ও শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে। তবে 'নির্দিষ্ট' ও 'শর্তসমূহকে' নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার আলোকেই দেখতে হবে। পর্বে পর্বে অভিপ্রায়/লক্ষ্য অর্জিত হলেও তা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ীভাবে থেমে যাবে না, বলবে না, এই যে দেখুন ঠিক এইখানে ইতিহাসের শেষ হলো। তবে ইতিহাস শেষ হবে নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে পরের অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা থাকবে।

এতসব বিশ্লেষণ করা ফুকুয়ামার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি এটাই প্রমাণ করতে আগ্রহী, এরাই 'ইতিহাসের শেষ' তত্ত্বের দার্শনিক নির্মাতা। উদার গণতন্ত্রের সীমানা অতিক্রম করতে গিয়ে মার্কসের ব্যর্থতার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু

নেই। কয়েক শতাব্দী ধরে চালু থাকা উদারতাবাদের এলাকার মধ্যে মার্কস তাঁর মতে অনেকটা জোর করেই অনুপ্রবেশ করেন,

> Communist societies, they were deliberately created by human beings at a definite point in time, on the basis of a certain theoretical understanding of man and of the appropriate political institutions that should govern human society, while liberal democracy cannot trace its theoretical origins to single author like Karl Marx.[১৭]

[কালক্রমে একটা সুনির্দিষ্ট পর্বে মানুষ সুচিন্তিতভাবে সাম্যবাদী সমাজ সৃজন করেছে মানবসমাজ পরিচালনার জন্যে যথার্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক উপলব্ধির ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে, কার্ল মার্কসের মতো একক কোনো লেখকের মধ্যে উদার গণতন্ত্র তার উৎস খুঁজে পাবে না (ফুকুয়ামা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৩)।]

অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে মানুষ সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টি করেছে ভেবেচিন্তে-সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ও মানব সমাজকে শাসনের জন্য নির্মিত হয়েছে যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। অথচ সেই সময় উদার গণতন্ত্র তার তাত্ত্বিক উৎপত্তিতে কার্ল মার্কসের মতো একজন রচয়িতার মতো কাউকে খুঁজে পাবে না।

বক্তব্যটি আদৌও তথ্যভিত্তিক নয়, বানোয়াট।

'একদিকে ইউরোপ বৃহৎ শিল্প এবং শিল্প প্রলেতারিয়েতের জন্ম ও বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি হল, শ্রেণি সংগ্রামেরই পরিণত পর্যায়ে উৎক্রমণের ইতিহাস। অন্যদিকে কিন্তু দেখা গেল, ১৮৪০ এর পর শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে দুর্বলভাবে চালু থাকা আগের পর্বের বিভিন্ন ধারার ইউটোপীয় চিন্তাচেতনাসমূহ ও তদ্বারা প্রভাবিত বিদ্যমান সংগঠনসমূহ, তাদের কাজের ধারা-পদ্ধতি পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাচ্ছে না—এই অবস্থাকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করে সামনের দিকে আর এগুতে পারছে না। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, মূর্ত বাস্তবতার এই নতুন প্রেক্ষিতের দাবি হচ্ছে, 'পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা ও অপরিণত শ্রেণি পরিস্থিতির প্রতিসঙ্গি অপরিণত তত্ত্বের' জায়গায় বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি 'পরিণত' আগুয়ান এক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বে সজ্জিত শ্রমিকশ্রেণীর এক নতুন ধরনের জঙ্গি বিপ্লবী পার্টি। আর ইতিহাসের ঠিক এই সন্ধিক্ষণ মুহূর্তে, এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই মহান প্রতিভাধর বিপ্লবী : কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)।'[১৮] [নূর মোহাম্মদ, *সংস্কৃতি*, মার্চ ১৯৯৬]

কমিউনিজমের মার্কসবাদী ধারণাটি যেমন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী বিকাশের একটি পর্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তেমনি লিবারেল ডেমেক্রাসি পুঁজিবাদী

সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের কালে পুঁজিবাদী শাসন দর্শন হিসেবে একটা বিশেষ সময়কাল ধরে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক দার্শনিকের তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ও একাধিক বিপ্লবের ফল। মার্কসবাদ যেমন সমাজের মধ্যে হঠাৎ কোন তাত্ত্বিক অনুপ্রবেশ নয় তেমনি লিবারেল ডেমোক্রাসির দার্শনিক নির্মাতাগণ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ফরাসী বিপ্লবের পরিপূর্ণ ঠিকুজি ইতিহাসের এক বিরাট ঘটনা। লিবারেল ডেমোক্রাসি পিতৃ-মাতৃহীন ঠিকানাবিহীন নয়। তা এমনি এমনি বেড়ে ওঠেনি।

ঘৃণা ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ছাড়া এই ধরনের মূল্যায়ন অসম্ভব। এর প্রধান কারণ, ফুকুয়ামার 'ইতিহাসের শেষ তত্ত্বে' মার্কসের প্রয়োজন। কিন্তু উদারতাবাদের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কস-এঙ্গেল্‌স যে সম্পূর্ণ নতুন এক সংগ্রামী তত্ত্ব নির্মাণ করলেন যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেই কেবল সম্ভব—এখানেই ফুকুয়ামা গংদের ঘোরতর আপত্তি।

মার্কসের বিরুদ্ধে ফুকুয়ামার বর্ণিত যে অভিযোগ সে সম্পর্কে মার্কসের নিজের ভাষ্য :

> Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past.[১৯]

[মানুষ নিজেই নিজ ইতিহাসের রচয়িতা তবে মানুষ ঠিক নিজের খুশিমতো তা রচনা করতে পারে না; তারা তাদের পছন্দ মতো তবে সরাসরি বিপরীতমুখী, চাপিয়ে দেয়া ও অতীত থেকে রূপান্তরিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনেই ইতিহাস তৈরি করে (মার্কস-এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলি*, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭৩, পৃ. ৩৯৮)।]

ফুকুয়ামা গংদের কথা হল ইতিহাসের শেষ নিয়ে নতুন কিছু তারা বলছেন না। অতএব বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এই ঘোষণাই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে হবে; লিবারেল ডেমোক্রাসিতেই ইতিহাসের সমাপ্তি। এই উদার গণতন্ত্রের অর্থনীতি কী হবে? আসলে সেখান থেকেই তো ফুকুয়ামাদের যন্ত্রণা ও যাত্রা। এ বিষয়ে ফুকুয়ামা অত্যন্ত দৃঢ় ও পরিষ্কার :

> In its economic manifestation, liberalism is the recognition of the right of free economic activity and economic exchange based on private property and markets. Since the term "Capitalism" has recently become a fashion to speak of "free market economics" instead; both are acceptable alternative terms for economic liberalism.[২০]

[এটার অর্থনৈতিক প্রকাশে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বাজারের ভিত্তিতে মুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক বিনিময়ের অধিকারের স্বীকৃতি হলো উদারবাদ। যেহেতু 'পুঁজিবাদ' পদটি সম্প্রতি 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'-এর বিকল্প হিসেবে প্রচলিত হয়েছে : তাই অর্থনৈতিক উদারবাদের জন্যে বিকল্প পদ হিসেবে দু'টাই গ্রহণযোগ্য (ফুকুয়ামা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪)।]

ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে কথিত মুক্ত অর্থনীতির তথা পুঁজিবাদীই হল উদারতাবাদের সারকথা।

১৯৯২ সাল থেকে আমরা এখন ফিরে যাব ১৮৪৬ সালের এপ্রিলে। মার্কস-এঙ্গেল্‌স যৌথভাবে *জার্মান ভাবাদর্শ* রচনার কাজ শেষ করলেন। উদারতাবাদ সম্পর্কে মন্তব্য :

liberalism, i.e., liberal private property-owners, at the beginning of the French Revoloution gave private property a liberal appearance by declaring it one of the rights of man.

[উদারবাদ অর্থাৎ উদার সম্পত্তির মালিকানা, ফরাসি বিপ্লবের সূচনাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের অধিকারের একটা হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা উদার রূপদান করেছিল।]

তারা এ-ও বললেন ১৮২০ সালেই হেগেল উদারতাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি কী তা পরিষ্কার করেন;

Hegel turns the phrase of the bourgeois into the true concept, into the essence of property.[২১]

[হেগেল বুর্জোয়া প্রবাদটি সত্যিকার প্রত্যয়ে, সম্পত্তির নির্যাসে রূপদান করেছেন (মার্কস-এঙ্গেলস, *সংকলিত রচনাবলি*, খণ্ড ৫, ১৯৭৬, পৃ. ২০৮)।]

নিশ্চিতভাবেই তারা হেগেলের শ্রেণি অবস্থান নিয়ে ন্যূনতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকেন নি।

ফুকুয়ামার বক্তব্যের প্রায় দেড়শ' বছর আগেই মার্কস-এঙ্গেলস উদারতাবাদ-এর অর্থনৈতিক ভিত্তি ও নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন এবং এর উচ্ছেদের তত্ত্ব নির্মাণ করে চলেছেন। এবং লাস্কি ১৯৩৬ সালে বলেন, এটা ঠিক যে ইতিহাসে উদারতাবাদ এক সময় চার্চের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অতি ধীরে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তবাদ ভাঙন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লিবারেল রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে। কিন্তু উদারতাবাদ তার পুরনো ভূমিকা পরিত্যাগ করেছে।

The spirit begins to disappear with the emergence of the capitalist spirit as predominant. And the principle of utility is no longer determined by reference to social good.[২২] (Laski, 2005, p 33)

[পুঁজিবাদী প্রাণশক্তি প্রধান হিসেবে উত্থানের সাথে সাথে উদারবাদের প্রাণশক্তি অদৃশ্য হতে থাকে। সমাজমঙ্গলের বরাত যোগে কোনোমতেই উপযোগিতার নীতিমালা নির্ধারিত হয় না (লাস্কি, ২০০৫, পৃ. ৩৩)।]

বিজয়ী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে উদারতাবাদকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে লাস্কি এর একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

অর্থাৎ উদারনৈতিক রাষ্ট্রের প্রশ্নে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রথম যুগের দিকে রাজনৈতিক দার্শনিকরা আশাবাদের যে প্রকল্প নির্মাণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই তা যেমন স্ববিরোধিতায় পূর্ণ ছিল, তেমনি ফুকুয়ামা গংদের 'দশক'-এর আগেই পুঁজিবাদীরা তা পরিহার করে। শুধুমাত্র ঐসব দার্শনিকদের বক্তব্যসমূহকে অপব্যবহার করার চেষ্টা চলে সমকালীন পুঁজিবাদের অবিনশ্বরতা প্রমাণ করতে গিয়ে।

এই অনু-অধ্যায়টি এখানেই শেষ হলে বরং ভালো হত। কিন্তু ফুকুয়ামা যে ধূর্ততার সাথে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছেন তা অনুধাবনে খুবই সামান্য কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি : এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কান্ট থেকে মার্কস পর্যন্ত যে নতুন ইতিহাস দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল তার ব্যাখ্যা ফুকুয়ামা থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য।

কান্টের মতে, রাষ্ট্র হলো আধিকারিক আইনের অধীনস্থ বহুলোকের সম্মিলন, অর্থাৎ নিছক আইনি সংগঠন।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রশ্নে কান্ট চুক্তি তত্ত্ব স্বীকার করেন যা ক্ষমতার জন্য বুর্জোয়াদের সংগ্রামের পর্বে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে পেরেছিল। তিনি হব্‌স থেকে রুশো পর্যন্ত রাজনৈতিক দার্শনিকদের দ্বারা শুধু এই প্রশ্নে নয় আরো নানাবিধ বক্তব্যের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। সত্যিকার আলোকপ্রাপ্তির আদর্শ বলে কান্ট গণ্য করেছেন দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের নেতৃত্বে প্রাশিয়াকে, তিনি নাকি প্রথম রাজা যিনি শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছেন ও মেনেছেন। কান্টকে সব থেকে অভিভূত করেছে রাষ্ট্রে অনুমোদনীয় স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনার সীমারেখা প্রসঙ্গে ফ্রিডরিখের বক্তব্য : 'যত খুশি, যা খুশি আলোচনা কর, কিন্তু অধীনে থাকো'। প্রুশীয় রাজার রাষ্ট্রকে কান্ট বলেছেন আলোকপ্রাপ্তির যুগের অথবা 'ফ্রিডরিখের যুগের' রাষ্ট্র।

এখানে দেখা যায় কান্টের প্রজাতন্ত্রবিষয়ক (Republican Govt.) মতামতের স্ববিরোধিতা। বলতে গেলে নিজ দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী; কান্ট মনে করছেন প্রজাতন্ত্রই রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বোচ্চ রূপ। শাসনের প্রণালী মিলে যাবে আইনী রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে এবং এটা ঠিক একেই তিনি মনে করতেন সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের অন্তিম লক্ষ্য বলে। অভিজাততন্ত্রের বিরোধী হিসেবে তিনি এই মত তুলে ধরেন। কান্ট তাঁর নিজের 'প্রজাতন্ত্র' বিষয়ক মতামতকে মনে করতেন গণতন্ত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক ধরনের শাসন গ্রহণীয় নয়, কেননা তা শক্তিশালী

রাষ্ট্রক্ষমতা গড়তে, জনগণকে আইনের অধীনে আনতে পারে না। প্রজাতন্ত্রকে তিনি আদি চুক্তির অর্থ ও মর্মের অনুসারী মনে করতেন।

তিনি এও মনে করতেন, সমাজের রাজনৈতিক জীবন থেকে মজুরি-খাটা শ্রমিক, গোমস্তা, শিক্ষানবিশ, চাকর-বাকর, নারী, গৃহশিক্ষক, খাজনাদায়ী চাষি এবং সাধারণ ভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে নিজের কাজ দিয়ে নয়, অন্যদের হুকুমে, এমন সমস্ত লোকদের বাদ দেওয়া উচিত।

কান্ট যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন তা হল, মানবজাতি কি অবিরাম প্রগতি ও উত্তমের পথ ধরে চলেছে? ভাববাদী কান্ট মানবতাবাদী ধারায় ইতিবাচক অর্থে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন। স্বাধীনতার দিকে জনগণের ক্রমিক, অগ্রগতিমূলক বিকাশের ধারণায় উপনীত হন কান্ট। শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে অবজেকটিভ নিয়মসিদ্ধতা, শান্তির নীতিতে জাতিসমূহের সংঘ গঠনের অনিবার্যতার কথা বলেন তিনি। তিনি মনে করেন, লোকে চাক বা না-চাক, এ সংঘে যোগ দিতে তারা বাধ্য।[২৩] (*রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, ১৯৮৭, পৃ ২২৮-২৪৪)।

এখানে তিনি যে বুর্জোয়া দাবীগুলোর রূপায়ণ চেয়েছিলেন সেটিই এই ইতিহাস দর্শনের মূল কথা নয়। তিনি প্রথমে দেখাতে চেয়েছেন ইতিহাস অবিরাম অগ্রগতি অভিমুখী—ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থাকবে। নিরন্তর প্রবহমানতার মধ্যেই মানবেতিহাসের প্রধান তাৎপর্য নিহীত। তিনি ইতিহাসের অগ্রগতি একটি বিশেষ প্রশ্নে (রাষ্ট্র) চিরতরে স্থির হয়ে যাবে এই দাওয়াই দিয়ে ইতিহাসের গতিকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার সিলমোহর লাগিয়ে যান নি।

কান্টের মতে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেই সূচিত হয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি। প্রগতির পক্ষে সংগ্রাম অপরিহার্য। কিন্তু তিনি তাঁর *চিরস্থায়ী শান্তি* (Eternal Peace) নামক গ্রন্থে বলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রের পৃথক সেনাবাহিনী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়; আর প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র স্থায়ী সৈন্যদল বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো দেশই শান্তি ভোগ করতে পারবে না। স্থায়ী সেনাবাহিনীই জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের মূল কারণ। [আমরা জানি ফুকুয়ামার লিবারেল ডেমোক্রাসির ভিত্তি, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে আছে স্থায়ী সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার উপর। আমাদের এই প্রাণপ্রিয় ধরিত্রীকে পুরোপুরি ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে কথিত লিবারেল রাষ্ট্র।][২৪] (আমিনুল ইসলাম, ২০০৯, পৃ ৭৪-৭৫)

কান্ট স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়, মানবিক মর্যাদা, চিরস্থায়ী শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব ভাবনা হাজির করেন ও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রতিপন্ন করেছিলেন উদীয়মান, ক্ষমতার দিকে আগুয়ান বুর্জোয়ার অবস্থান থেকে যা সুসিদ্ধ, তা তার মানবজাতি বিষয়ক দর্শনের কাঠামোর মধ্যে সর্বদা রূপায়ণে সচেষ্ট ভাবনা হলেও পরিবর্তমান ঘটনাচক্রের দিকে কখনো তাঁদের অভিমুখ ছিল না। এগুলি হল নিতান্ত ধরে নেয়া গোছের ধ্বনি।

> Kant's political philosophy seems more than ever to be compounded of an abstract morality not of this world and an amoral politics too much of it.[২৫] (Strauss and Cropsey-ed, 1987, p-603)
>
> [কান্টের রাজনৈতিক দর্শন মনে হয় বিমূর্ত নৈতিকতার চেয়ে অধিকতর কিছু যা এই দুনিয়ার নয় এবং এটারই অতিমাত্রায় অনৈতিক রাজনীতি (স্ট্রস এবং ক্রপসি সম্পাদিত, ১৯৮৭, পৃ. ৬০৩)।]

এবং

> Kant's doctrine appears to appeal implicitly both to the notion of end of history and to that of perpetual progress : but two notions are mutualley contradictory.[২৬] (*ibid,* p-610)
>
> [কান্টের মতবাদ ইতিহাসের সমাপ্তি এবং অন্তহীন প্রগতি উভয় ধারণার প্রতি ইঙ্গিতে আবেদন জানায়। তবে ধারণা দু'টি পরস্পরবিরোধী। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১০)।]

তা হলেও কান্ট কার্যত তাত্ত্বিক দর্শনের ভিত্তিতে বিকশিত ও অগ্রণী বুর্জোয়া ভাবধারাকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন সমগ্র মানবজাতির আরো অগ্রগতির অপরিবর্তনীয় মানবিক দাবির আকারে।

বর্তমান পুঁজিবাদের অত্যধিকাংশ ভাবাদর্শীরা যেখানে কান্টের উত্তরাধিকার থেকে বেছে নিয়ে মহা মনীষীর সেইসব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগান করেন যা কোনো না কোনো ভাবে অচল হয়ে যাওয়া বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবহারশাস্ত্রীয় কাঠামোর সংরক্ষণ ও তার পক্ষে ওকালতির কাজে লাগে, সেখানে মার্কসবাদী গবেষকরা একেবারেই ভিন্ন অবস্থান থেকে অগ্রসর হন কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে।[২৭] (*রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪)

হেগেলের মতে বাস্তবতা এমন একটা ধর্ম নয় যা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সর্বাবস্থায় এবং সর্বকালে প্রযোজ্য।...আগে যা ছিল বাস্তব বিকাশধারার পথে তাই-ই হয়ে পড়ে অবাস্তব, লোপ পায় তার আবশ্যিকতা, তার অস্তিত্বের অধিকার, তার যুক্তিসিদ্ধতা। এবং মুমূর্ষু বাস্তবের স্থানে আসে এক নতুন সজীব বাস্তব, শান্তিপূর্ণভাবেই আসে যদি পুরাতনের পক্ষে বিনা সংগ্রামে বিলীন হবার মতো সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাকে; আর ওই পুরাতন যদি এই আবশ্যিকতার প্রতিরোধ করে তাহলে আসে বলপ্রয়োগ। এইভাবে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারেই হেগেলের প্রতিপাদ্য পরিণত হচ্ছে তার বিপরীতে : মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে সমস্ত বাস্তবই কালক্রমে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে; অতএব নিজের প্রকৃতি অনুসারেই তা যুক্তিবিরুদ্ধ,...কিন্তু হেগেল দর্শনের (এবং কান্টের সময় থেকে দর্শনের সমগ্র আন্দোলনের এই শেষ পর্বে আমরা আবদ্ধ থাকব) প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চরিত্র আসলে ঠিক এই যে, মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলো সম্পর্কে চূড়ান্তপনার সমস্ত ধারণার উপর তা চিরকালের মতো মরণ-

আঘাত হেনেছে।...মানবতার কোনো এক নিখুঁত আদর্শ অবস্থায় জ্ঞান যেমন কোনো পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে উপনীত হতে পারে না, তেমনি ইতিহাসও তা পারে না। কোনো নিখুঁত সমাজ বা নিখুঁত 'রাষ্ট্রের' অস্তিত্ব শুধুমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব।...দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছুই নেই। এ দর্শন সবকিছুর ক্ষেত্রে ও মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে দেয়; তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় শেষহীন উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিকতে পারে না। এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে চিন্তা-পরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্বমাত্র। তার একটি রক্ষণশীল দিকও অবশ্যই আছে: এ দর্শন অনুসারে জ্ঞান ও সমাজের নির্দিষ্ট এই একটা পর্যায় তাদের কাল ও পরিস্থিতির পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতাটুকু আপেক্ষিক, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্যই অনাপেক্ষিক একমাত্র এই পরমটুকুই দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনে স্বীকৃত।[২৮] (এঙ্গেলস, *মার্কস-এঙ্গেলস*, ১৯৭২, পৃ ৪৪, ৪৫, ৪৬)।

কিন্তু এ কথাটা এখানে অবশ্যই বলা দরকার : হেগেলের রচনায় উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এত সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট হয় নি। এগুলি তাঁর পদ্ধতির অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি নিজে কখনো এতটা সুস্পষ্টভাবে সে সিদ্ধান্ত টানেননি এবং বস্তুত তার সহজ কারণ এই যে, তিনি একটি দর্শনতন্ত্র গড়ে তুলতে বাধ্য ছিলেন এবং চিরাচরিত চাহিদা অনুসারে দর্শনতন্ত্রের উপসংহারে কোনো না কোনো চরম সত্য থাকতে বাধ্য। অতএব, বিশেষত তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' (Logic) হেগেল যত জোর দিয়েই বলুন না কেন যে, এই পরম সত্য কেবল যুক্তিমূলক (তাই ঐতিহাসিক) প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু তিনি সে প্রক্রিয়ার এক পরিসমাপ্তি যোগাতে বাধ্য বোধ করলেন, কেননা তাঁর দর্শনতন্ত্রকে কোনো না কোনো এক বিন্দুতে এনে শেষ করতেই হবে। তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' তিনি এই শেষটাকে আবার শুরুতে পরিণত করতে পারেন, এখানে তাঁর সমাপ্তি বিন্দু অর্থাৎ পরম ভাবসত্তা এবং তা এই অর্থেই পরম যে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের পরম অভাব বর্তমান—'অন্যীভূত হয়' (alienats) (অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়) প্রকৃতিরূপে এবং পরে চৈতন্যের মধ্যে অর্থাৎ চিন্তা ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে-ফের স্বরূপ লাভ করে। কিন্তু এই সমগ্র দর্শনের শেষে অনুরূপ ভাবে ফের শুরুতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব কেবল এই উপায়ে, অর্থাৎ কিনা, ইতিহাসের পরিসমাপ্তি নিম্নোক্তভাবে কল্পনা করতে হবে : মানবজাতি এই পরম ভাবসত্তার জ্ঞান লাভ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, হেগেলীয় দর্শনেই সে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমস্ত গোঁড়ামি লোপ পায় তার বিপরীতে এইভাবে হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের গোঁড়ামির সবটুকুই পরম সত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। বৈপ্লবিক দিকটি তাই রক্ষণশীলতার অতি বৃদ্ধিতে চাপা পড়ে গিয়েছে এবং শুধু দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সেটা ঐতিহাসিক কর্মের ক্ষেত্রেও। মানবজাতি হেগেলের মাধ্যমেই যখন ওই 'পরম ভাবসত্তার' পরিব্যাখ্যানের পর্যায়ে

পৌঁছেছে তখন কার্যক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এত দূর এগিয়েছে যে, এই 'পরম ভাবসত্তাকে' বাস্তবে রূপান্তরিত করা তার পক্ষে সম্ভব। অতএব সমসাময়িকদের উপর ওই 'পরম ভাবসত্তা'র বাস্তব রাজনৈতিক দাবিও খুব বেশি লম্বা করা উচিত নয়। তাই 'অধিকারের দর্শনের' উপসংহারে আমরা দেখি, তৃতীয় ফ্রিদরিখ ভিলহেলম বারবার কিন্তু ব্যর্থভাবে প্রজাদের কাছে সাবেকী সমাজ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজতন্ত্রের, অর্থাৎ তখনকার পেটি বুর্জোয়া জার্মান অবস্থার উপযোগী মালিকশ্রেণীর সীমাবদ্ধ নরমপন্থী পরোক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই মধ্যে নাকি ওই পরম ভাবসত্তা রূপ নেবে এবং তাছাড়াও আমাদের কাছে আভিজাত্যের আবশ্যিকতা মনন পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে।

তাই, এমন এক সমূহ বৈপ্লবিক চিন্তাপদ্ধতি যে কেমন করে এহেন চূড়ান্ত নিরীহ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হল তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতাগুলির মধ্যেই।[২৯] (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬-৪৭)

> Above all, in a world which would continue to be dominated by oppositions, would the end of history by the solution of all contradictions still make sense? On the other hand, without the end of history and without a total reconciliation, the whole Hegelian construction of the state would lose its definitive and necessary character. As we have seen, political philosophy can coincide with the philosophy of history because the final state replaces the best regime. Both Hegel's description of the historical development and that of the rational state imply that the final state represents a synthesis which reconciles all the human possibilities and leaves no room for the incompleteness and the dissatisfaction which would produce a further development of Universal history.
> Hegel's texts on this questions of the end of history are remarkably ambiguous.[৩০] (Strauss and Cropsey-eds, 1987, p 754-755)

[সর্বোপরি যে দুনিয়া অব্যাহতভাবে প্রতিপক্ষ দ্বারা শাসিত হবে, সকল বিরোধের সমাধান দ্বারা ইতিহাসের সমাপ্তি কি এখনও কোনো অর্থ ধারণ করে? অন্যদিকে, ইতিহাসের সমাপ্তি ব্যতীত এবং পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান ব্যতীত, সামগ্রিক হেগলীয় রাষ্ট্র নির্মাণ এর নিশ্চয়ক ও আবশ্যক বৈশিষ্ট্য হারাবে। আমরা যেমন দেখেছি, রাজনৈতিক দর্শন ইতিহাসের দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে কারণ চূড়ান্ত অবস্থা উৎকৃষ্ট শাসন অপসারণ করে। হেগেলের ঐতিহাসিক বিকাশ ও যৌক্তিক রাষ্ট্রের উভয় বিবরণই ইঙ্গিত দেয় যে চূড়ান্ত অবস্থা একটা সংশ্লেষণ উপস্থাপন করে যা যাবতীয় মানবীয় সম্ভাবনার মিলন সাধন করে এবং অসম্পূর্ণতা ও অসন্তুষ্টির কোনো স্থান রাখে না যা বিশ্ব ইতিহাসের অধিকতর বিকাশ ঘটাবে। ইতিহাসের সমাপ্তির এই প্রশ্নে হেগেলের লেখাজোখা উল্লেখযোগ্যভাবে অস্পষ্ট (স্ট্রস এবং ক্রপসি সম্পাদিত, ১৯৮৭, পৃ. ৭৫৪-৭৫৫)।]

জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিক ধারণাকে সমালোচনা করেন হেগেল এবং বংশানুক্রমিক নিয়মতান্ত্রিক রাজার সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি অবশ্য মনে করেন রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় কাজ চলবে বিধান দ্বারা, রাজা শুধু যোগ করবেন 'আমি চাই' টুকু। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও আইনি ব্যবস্থা। তিনি জার্মানির সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার প্রশ্নে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। বুর্জোয়া অধিকার ও স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মালিকানা, চুক্তির স্বাধীনতা, আদালতের পুঁজিবাদী সংস্কার ইত্যাদির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। ক্যান্টের বিপরীতে হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতার গ্যারান্টি হলো তার সশস্ত্র শক্তি যার বিকশিত রূপ হল স্থায়ী সেনাবাহিনী। বিপরীতে মার্কস *ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধর* ধ্রুপদী বয়ানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন কমিউনের প্রথম আদেশের প্রতি : কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল স্থায়ী সেনাবাহিনীর অবলুপ্তি, তার স্থানে সশস্ত্র জনবলের প্রতিষ্ঠা।[৩১] (মার্কস, ১৯৭১, পৃ. ১৮৬)

বিশ্ব ইতিহাস এবং স্বাধীনতার প্রগতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্থান সম্পর্কে হেগেলের যা দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে তিনি অবশ্য জার্মান জনগণকে উঁচুতে তুলেছেন এবং নিজের ছকের সুবিধার জন্য প্রাশিয়া এবং অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রের বুর্জোয়া পরিপক্কতার স্তরকে বাড়িয়ে ধরেছেন। তাহলেও তাঁর 'আইনের দর্শন' বা 'ইতিহাসের দর্শন' কোথাও এমন কথা বলা হয় নি যে তাঁর সমকালীন প্রাশিয়াই বুঝি বিশ্ব ইতিহাসের শেষ, সমাপ্তি পর্যায়। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্ব-ঐতিহাসিক অগ্রগতি এগিয়েই চলেছে।[৩২] (*রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড ২, পৃ. ২৬৬-৬৭)

'লুই বোনাপার্টের' তৃতীয় জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৮৫) এঙ্গেলস বলেন :

> It was precisely Marx who had first discovered the great law of motion of history, the law according to which all historical struggles, whether they proceed in the political, religious, philosophical or some other ideological domain, are in fact only the more or less clear expression of struggles of social classes, and that the existence and thereby the collisions, too, between these classes are in turn conditioned by the degree of development of their economic position, by the mode of their production and of their exchange determined by it.[৩৩] (*Engels,* 1973, p 396-397)
>
> [প্রথম মার্কসই ইতিহাসের গতির এই প্রধান নিয়মটি আবিষ্কার করেন যে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, অথবা ভাবাদর্শের অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই চলুক না কেন, সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শ্রেণিগুলির সংগ্রামের অল্পবিস্তর স্পষ্ট অভিব্যক্তি; আর এইসব শ্রেণির অস্তিত্ব এবং একই সঙ্গে এই শ্রেণিগুলির মধ্যে সংঘর্ষকেও আবার নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিরই অর্থনৈতিক

> অবস্থার বিকাশের মাত্রা, উৎপাদনের চরিত্র ও প্রণালী সেটা দিয়ে নির্ধারিত বিনিময়-প্রণালী (এঙ্গেলস, ১৯৭৩, পৃ. ৩৯৬-৯৭)।]

ইতিমধ্যেই মার্কস মানব ইতিহাসে গতির নিয়মাবলি অনুসরণ করতে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন—সমকালের বিপ্লবের অনুপ্রেরণা আর অতীত এমনকি বর্তমান থেকেও আসবে না, আসবে ভবিষ্যৎ থেকে :

> The social revolution of the nineteenth century cannot draw its poetry from the past, but only from the future. It cannot begin with itself before it has stripped off all superstition in regard to the past. Earlier revolutions required recollections of past world history in order to drug themselves concerning their own content. In order to arrive at its own content, the revolution of the nineteenth century must let the dead bury their dead. There the phrase went beyond the content; here the content goes beyond the phrase.[৩৪] (Marx, 1973, p 400)
>
> [উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য-প্রেরণা আর অতীত থেকে নয়, আসতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ থেকেই। অতীত সম্পর্কে সমস্ত কুসংস্কার মোচন না করে সেটার নিজের কাজ আরম্ভ করাই সম্ভব নয়। আগেকার বিপ্লবগুলির পক্ষে বিশ্বের অতীত ইতিহাস স্মরণ করার প্রয়োজন ছিল নিজেদের সারবস্তু সম্পর্কে নিজেদের প্রতারণা করার জন্যে; নিজের সারবস্তুতে পৌঁছানোর জন্যে উনিশ শতকের বিপ্লবকে মৃতদের সমাধিস্থই রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে উক্তিটা সারবস্তুকে ছাপিয়ে উঠত; এক্ষেত্রে সারবস্তু উক্তিটাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে (মার্কস, ১৯৭৩, পৃ. ৪০০)।]

উপরের বক্তব্যটুকু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইতিহাসের শেষ বলতে ফুকুয়ামা যে এক ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি করেছেন এবং যার দায় তিনি কান্ট হেগেল ও মার্কসের উপর চাপিয়েছেন তা কতটা বোগাস।

৪

ইতিহাসের দর্শন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, হবে। চর্বিত-চর্বণ এবং উদ্দেশ্যহীন তাত্ত্বিক বুদ্ধিপনা আমাদের যে খুব কাজে আসবে তা মনে হয় না। প্রায়োগিক প্রেক্ষিত যদি হয় তাত্ত্বিকদের সার্থকতার ক্ষেত্র তা হলে আমরা উদ্দীপিত হতে পারি। ইতিহাস অতীতভিত্তিক (অতীত ও ইতিহাস) বিষয় এ দাবির প্রতি নমনীয় থেকেই বলা যায় বর্তমানের সাথে তার সম্পর্ক নির্ণয় এবং ভবিষ্যতমুখী চিন্তা-চেতনার আলোকে ইতিহাস-চর্চাকে জনপ্রিয় করা আজকের দিনে একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে। ইতিহাসের দায় বলে একটা কথা আছে। সে দায় মেটাতে কেউ দৈহিকভাবে অতীতে ফিরে গিয়ে তা করতে পারে না। পলাশীর ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলা হত্যা, যুদ্ধক্ষেত্রে টিপু সুলতানের শহীদ হওয়া বা ১৮৫৭-তে বাহাদুর শাহ শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে গোপনে সম্পর্ক রেখেছিলেন কি

না—এসব বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা আড়াই'শ বছর ধরেই প্রায় নিয়মিত তাদের প্রকল্পের অনুকূলে লিখেই চলেছেন। মাত্র কয়েক দশক, ভারতের ঐতিহাসিকদের এক অংশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে মোকাবেলা করলেও (সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদদের কথা আপাতত বাদ রাখলাম) দেখা যায় এমন স্পর্শকাতর কিছু ব্যাপার আছে যা তারা নিয়মিতই ছাড় দেন সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেই। আসলে এসব বিষয়গুলো অনেক অনেক বছর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষকে দুর্বল করে রেখেছে। অতিসাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারি (অবাঙালি) ও অপরিপক্ক বলেছেন। কেন? ধরে নিতে হবে, এর ফলাফল কোন দিকে যাবে তা জেনে বুঝেই তিনি একথা বলেছেন।

ইতিহাসের অতীত, সাম্প্রতিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিশাল ও বহুবিস্তৃত আলোচনা ও ততোধিক মতভিন্নতা পড়তে পড়তে একসময় মনে হয় ক্লান্তি এসে যায়—হয়তো এখানেই ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সার্থকতা! তবুও বলা যায়,

The recent and the more or less distant past thus combine in the amalgam of the present...Recent and remote history, then, are the first two keys to understanding the present. Finally, the course provides a third. This involves identifying the major problems in the world today. Problems of everything—political, social, economic, cultural, technical, scientific. ...They know the last line of the play. When it comes to the present day, with all its different potential denouncements, deciding which are the really major problems essentially means imagining the last line of the play—discerning, among all the possible outcomes, those which are most likely to occur. The task is difficult, hazardous, and indispensable...Serious historians today also defend forecasting—with some courage, given its risks.[৩৫] (Braudel, 1993, p xxxvi, xxxvii)

[সাম্প্রতিক এবং প্রায় দূর অতীত এভাবে বর্তমানে মিশ্রিত হয়...। অতঃপর সাম্প্রতিক এবং দূরবর্তী ইতিহাস, হলো বর্তমান উপলব্ধির প্রথম দু'টি চাবি। অবশেষে, পরিক্রমাটি তৃতীয় চাবি প্রদান করে। বর্তমান জগতে এসবই প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে। সবকিছুর সমস্যাবলি—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক...। তারা নাটকের শেষ লাইনটিও জানে। যখন এটা বর্তমানকালে চলে আসে, যাবতীয় বিবিধ সম্ভাব্য বাতিলবিজ্ঞপ্তি সহকারে, সত্যিকার অর্থে নির্ধারণ করে কোনগুলি প্রধান প্রধান সমস্যা আবশ্যিকভাবে বোঝায় নাটকের শেষ লাইনটি অনুমানকরণ—প্রাজ্ঞ, সম্ভাব্য সকল পরিণতির মধ্যে যেসব অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটে। কাজটা দুরূহ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং অপরিহার্য...। অবশ্য গুরুগম্ভীর ইতিহাসবিদগণও বর্তমানে

পূর্বাভাষ প্রদানের পক্ষে—খানিকটা সাহস যোগে, ঝুঁকি সত্ত্বেও (ব্রদেল, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬-৩৭)।]

ফলে শুরুটা এভাবে সংগত মনে হয়েছে : প্রথমত 'ইতিহাস'-এর প্রচলিত সংজ্ঞা কী বয়ানে বিদ্যমান তা দেখা, দ্বিতীয়ত ইতিহাসের দর্শন—অর্থাৎ ইতিহাস যখন স্বতঃসিদ্ধ; সমস্যা দর্শন নিয়ে—ঐতিহাসিক, অধ্যাপক ইতিহাসবিদ, ইতিহাস-বোদ্ধা ও আমাদের মতো ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের লেজ না-ছাড়া পাঠকদের ইতিহাস-চর্চার প্রশ্নে কোন দর্শনের পক্ষে দাঁড়াবেন তা খোলাসা করা।

ইতিহাস : সংজ্ঞা (নমুনা)

শাব্দিক অথবা বৈয়াকরণিক অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটির জাত্যার্থ (connotation) নিরূপণ কোনো দুরূহ কাজ নয়। কিন্তু শব্দটির প্রচলিত ব্যাপক অর্থের দিকে নজর রেখে এর কোনো সঠিক সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল। সেইজন্য আলোচনার শুরুতে অতি পরিচিত একটি সংজ্ঞাই উল্লেখ করছি : History is a movement in time : সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। এই অভিধা মেনে নিলে দেখা যায় যে, ইতিহাস অতীতের কঙ্কাল নয়, শবাধারে পাঁচ হাজার বছর ধরে বন্ধ করে রাখা মমির মতো কোনো নিশ্চল পদার্থ নয়। এ হচ্ছে আন্দোলন, যার গতি আছে, যা অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের সময়সীমার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। এই গতিশীলতাকে মেনে নিলেই বুঝতে হবে যে, ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কাজ ইতিহাসের প্রবহমানতা, পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা; অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির রূপ ও প্রতিষ্ঠান যেমন বদলে যায়, তেমনি এদের মধ্যকার কতকগুলো আবার টিকেও থাকে এবং কতকগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইতিহাস যেহেতু সময়-সীমার মধ্যে আন্দোলন বিশেষ, সময়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও ঐতিহাসিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখানে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা এবং আবশ্যকমতো যুগ-বিভাজন বা periodisation-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা। যুগ-বিভাজন বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব।[৩৬] (তরফদার, ঐ, ১৯৯৫, পৃ ২২৯)

ইতিহাস কী? এর বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত? এটা কীভাবে লিখিত হবে? আর এর উপকারিতা কী? ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে উত্তর দেয়। অন্য কথায়, ইতিহাসের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও উপকারিতার বলয় নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা নানা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ইতিহাসের স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হন। তাঁদের লেখনীতে বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ

পায়।...অনুসন্ধানের ধারা-প্রকৃত সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বর্গীয়ভাবে (Generically) ইতিহাস বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো অজানা বস্তুকে খুঁজে বের করা এবং এ অর্থে ইতিহাসও বিজ্ঞান।[৩৭] (দেলওয়ার, ২০০২, পৃ ৩, ৫)।

আসলে ইতিহাস-চর্চা হচ্ছে বর্তমানের গায়ে অতীতের যে ছাপ তাকেই বোধগম্য করা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাই হচ্ছে present evidence. অর্থাৎ আজ এই মুহূর্তে যে evidenceগুলো হাতের কাছে আছে তাই দিয়েই অতীতের পুনর্গঠন চলছে। মনে রাখতে হবে evidence শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাশে রাজনীতিও নিরন্তর কাজ করে চলছে।...ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ইতিহাস জাতিরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে। ইতিহাস-চর্চা অনেকখানি আটকা পড়েছে জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা শ্রেণিটির জীবনী রচনার মধ্যে। এই শ্রেণিটি উপনিবেশগুলোর ভাগ্যনিয়ন্তাও বটে। এই ইতিহাসের রাজনীতি তো খুবই স্পষ্ট। জন-ইতিহাসকে এই দুই বেড়া ভেঙে বের হবার আশ্বাস দিতে হয়। কাজটি মূলত রাজনৈতিক।[৩৮] (কামাল, ১৯৪৭-২০০০, ২০০১, পৃ ৯৪)।

ড. সলিমুল্লাহ খানের *ইতিহাস কারখানা* প্রথম ভাগ[৩৯] (২০০৭) ও দ্বিতীয় ভাগ[৪০] (২০০৯) প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী বিষয়বস্তু মূলত ইরাক, ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম। ইতোমধ্যে এই যুদ্ধ ও প্রতিরোধের যে সময়টা অতিক্রান্ত তার থেকে আমরা বারুদের গন্ধ পাচ্ছি, প্রতিনিয়ত এই বারুদের গন্ধ পেয়ে চলেছি এবং সাম্রাজ্যবাদ আর কতদিন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াসহ প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপনের যুদ্ধ চালাবে এবং এর সাথে চলতে থাকবে বিরাট রক্তক্ষয়ী এক প্রতিরোধ সংগ্রাম তা আমরা জানি না, কিন্তু বারুদের গন্ধ পেতে থাকব। ইতিহাসে অতীত ও বর্তমানের সাথে সম্পর্ক কী তা নিয়ে কতকাল আমরা যে বিতর্ক চালাব তা-ও জানি না। কিন্তু চলতি এই সময়কালেই সাম্রাজ্যবাদের নতুন ধরনের উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়টি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এখানে বর্তমানকে যেমন অতীতের সাথে সম্পর্কিত করার দায় থাকবে, অতীতকে পুনর্নির্মাণ/পুনর্গঠন করার তাগিদ আসবে; একই সাথে চলমান ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিবরণ আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্ধন যোগায়, পরামর্শ দেয় ও প্ররোচিত করে। ভবিষ্যৎ-এর কর্মপন্থা নির্ধারণে চলতে থাকা বারুদের গন্ধই আমাদের সঠিক পথ বাৎলে দিতে পারে।

অতীতের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি জিনিসকেই এক-একটা বিশেষ প্রণালীতে অনুধাবন করা যায়। ঠিক কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাবার তাড়নায় ও প্রেরণায় অনুসন্ধান চালানো হবে, তারই ওপর নির্ভর করবে ঠিক কোন প্রণালীটা অনুসরণ করা হবে।...একালের বিভিন্ন বিতর্কে অতীতকে টেনে এনে যখন তারই নিরিখে

কোনো গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণ করার চেষ্টা চলে, যখন নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্যকে প্রধান এবং অন্যগুলোকে গৌণ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলে, তখন অতীত হয়ে ওঠে কঠিন লড়াইয়ের ময়দান। আজকের ভারতবর্ষে ঠিক সেটাই ঘটছে।[৪১] (সেন, ১৯৯৯, পৃ ১, ৫, ৬)।

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের কতকগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল এবং তাৎপর্যকে কখনোই সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। এই তাৎপর্য বিচার পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও তার শ্রেণিচরিত্র; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণিসমূহের বিকাশ, বিন্যাস ও দ্বন্দ্ব; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে তার অভিব্যক্তি—এ সমস্তকে বাদ দিয়ে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অন্য কথায় আমাদের দেশের সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনকে বাদ দিয়ে যেমন অসম্পূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনাও সেই পরিস্থিতি বাদ দিয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্যহীন এবং অন্তঃসারশূন্য। বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতির সাথে একই গ্রন্থিতে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত এবং সেই অনুসারে পরস্পরের সাথে নিবিড় ও গভীরভাবে একাত্ম।[৪২] (উমর, ১৯৭৯, পৃ ৭, ৮)

ইতিহাস-ব্যাখ্যা যাই করুক এবং যেভাবেই করুক অতীতের আশ্রয় নেয় বলেই সে ইতিহাস। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে মারাত্মক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে জটিল। ইতিহাসের অতীত কী বস্তু সে-সম্পর্কে সতর্ক হবেন। অতীত এবং ইতিহাসের অতীত এক নয়।...কিছুদিন হয়, সাম্প্রতিক ইতিহাস বলে একটি বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক ইতিহাসের চাইতেও এ বেশি আধুনিক। ঐতিহাসিকেরা আধুনিক হলেও অধুনার তুলনায় পিছনে থাকতেন, কেউই সাম্প্রতিককালে প্রবেশ করতেন না। ইদানীং এই দ্বিধা অনেকটা ঘুচেছে।[৪৩] (দাশগুপ্ত, ২০০১, পৃ ৩৯)।

শ্রেণিবিভক্ত কোনো সমাজে ইতিহাস গবেষণার অর্থ হলো উপরের শ্রেণিগুলির স্বার্থ এবং বাকি জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যেকার পার্থক্যগুলির বিশ্লেষণ; এর অর্থ সেই পরিসরটি মাথায় রাখা যেখানে কোনো নভোদ্ভূত শ্রেণি ক্ষমতায় আসাকালীন নতুন কিছু অবদান রেখেছিল, এবং সেই পরিস্থিতির—যখন সে তার কায়েমি স্বার্থকে রক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়ার পিছু হটেছিল (বা হটবে)।[৪৪] (কোসাম্বী, ২০০২, পৃ xi)।

> History is neither an endless tournament in which different countries vie for domination of the global market-rulers being given high or low marks for preparing their subjects for winning the competition, nor is it the outcome of the working of passive market forces.
> A prominent group of historians and publicists regard human history as a tournament, and they have given the palm to Europe as the continent that prepared its people for victory in this global competition for markets and resources...History reveals that institutions or artifacts produced by human beings can lead to the exploitations or the

loss of freedom of other human beings. Thus the celebration of vast numbers of slaves whose labor made it possible for the few free citizens to enjoy that good life. Our criteria then must apply to all, or at least the vast majority of the human group concerned, if they are to lay claim to universality.[৪৫] (Bagchi, *Perilous Passage*, 2006, p xiii)

[ইতিহাস কোনো অন্তহীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয় যেখানে বিশ্ব বাজার শাসকদের কর্তৃত্বের জন্য বিভিন্ন দেশকে প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে তাদের বিষয়বস্তুর প্রস্তুতির জন্যে অধিক বা অল্প নম্বর দেয়া হয় আর অপ্রতিরোধী বাজার শক্তির কার্যকলাপের ফলাফলও নয়।
ইতিহাসবিদ ও প্রচারকদের একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী মানব ইতিহাসকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তাঁরা ইউরোপকে ঘুষ দিয়েছেন যেন মহাদেশটা বাজার ও সম্পদের জন্যে এই বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে তার জনগণকে প্রস্তুত করে। ইতিহাস জানায় যে মানুষের তৈরি প্রতিষ্ঠান বা বস্তু অন্য মানুষকে শোষণ বা স্বাধীনতা হরণের দিকে ধাবিত করতে পারে। তাই বিপুল সংখ্যক দাসের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যাদের শ্রম কতিপয় মুক্ত নাগরিকের উত্তম জীবনযাপন উপভোগ সম্ভব করেছে। অতঃপর আমাদের মানদণ্ড অবশ্যই সবার প্রতি প্রয়োগ করতে হবে অথবা অন্ততপক্ষে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাধিক্যের প্রতি, যদি তারা বিশ্বলৌকিতার কাছে দাবি করে (বাগচী, *পেরিলোয়াস প্যাসেজ*, ২০০৬, পৃ. xiii)]

'কাকে বলে ইতিহাস'? এই প্রশ্নে আমার প্রথম উত্তর ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।[৪৬] (কার, ১৯৯৯, পৃ ২৫)।

We stand in regard to the past, what the relations are between past, present and future are not only matters of vital interest to all: they are quite indispensable...[৪৭] (Eric Hobsbawm, 1999, p 32)

[আমাদের অবস্থান অতীতের পক্ষে; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যকার সম্পর্কটা কি শুধু তাই সকলের কাছে আত্যন্তিক আগ্রহের বিষয় নয়, এসব সম্পূর্ণ অপরিহার্য (এরিক হবস্‌বম, ১৯৯৯, পৃ. ৩২)।]

ইতিহাসের দর্শন

মমতাজুর রহমান তরফদার ১৯৬৯ সালে বাংলা একাডমীর সহায়তায় বাংলা ভাষায় *ইতিহাসের দর্শন* শিরোনামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি বলেন,

এই সংকলন যে নতুন লেখাগুলো সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে আছে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানোভ ও লেনিনের রচনা। রচনাগুলোতে স্থান পেয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা, বিশেষ করে দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশ ও বস্তুবাদ সম্বন্ধে

দার্শনিক আলোচনা, যার সংক্ষিপ্তসার সম্পাদকের ভূমিকার শেষের দিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বস্তুবাদী দার্শনিকদের লেখাগুলোর সংযোজনার পেছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে; আর তা হল ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে ভাববাদী ধারণার পাশাপাশি বস্তুবাদী ধারণার উপস্থাপনা। এই ধারণা দুটির মধ্য থেকে কোনো-একটিকে বাদ দিলে সংকলনটি একপেশে এবং অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম সংস্করণে যাঁদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁরা হলেন; ইব্‌ন খলদুন, জিয়া-উদ-দীন বারনী, ফুসতেল দ্য কুলাজ, হেনরি পিরেন, মেইনেক, হুইসিংগা, ফ্রাসোয়া সিমিয়াম, মার্ক ব্লখ ও আর.জি. কলিংউড। দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন করে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হল তাঁরা হলেন; কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, প্লেখানোভ ও লেনিন।

এই সংকলনের একটি দীর্ঘ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাতে তিনি ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "'ইতিহাস', 'ইতিহাসের পদ্ধতি' ও 'ইতিহাসের দর্শন'—এই কথাগুলোর পৃথক পৃথক অর্থ আছে। অবশ্য এরা পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।...তথ্য নির্বাচন-সংক্রান্ত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গবেষকের বিচার-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং এমনকি তাঁর ইতিহাস দর্শন প্রকাশ পেয়ে থাকে। কাজে লাগানোর আগে তথ্যগুলোর সমালোচনা দরকার। সমালোচনার আলোকে যাচাই না করলে সংগৃহীত মাল-মসলার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারা যায় না। এর পরবর্তী পর্যায়ে আসে তথ্যের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমেই অতীতের পুনর্গঠন সম্ভব। ঘটনার কারণ ও প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই ইতিহাস-দর্শন ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক সবসময় দর্শন সম্বন্ধে সচেতন না-ও থাকতে পারেন। ঐতিহাসিকের তরফ থেকে যুক্তি-ভিত্তিক পূর্ব-ধারণার অন্য নামই হচ্ছে ইতিহাস দর্শন।"[৪৮] (তরফদার ঐ, পৃ ৬-৭)।

তিনি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিকদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কলিংউড পর্যন্ত চিন্তার দিক দিয়ে তারা মূলত ভাববাদী এবং মার্কস থেকে লেনিন পর্যন্ত বস্তুবাদী। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়, সাধারণ অর্থে দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন ইতিহাসের দর্শনও তেমনি ভাববাদী ও বস্তুবাদী দু'টি (মাত্র) প্রধান ধারায় বিভক্ত। পদ্ধতি হিসেবে আমার মনে হয় এই ভাবে সরাসরি বিভক্তির সীমারেখা টেনে নিয়ে ইতিহাসের দর্শন প্রসঙ্গটি এই নিবন্ধে আলোচনা করতে গেলে সীমাবদ্ধতার চাপ অনুভব করা যেতে পারে; বরং ইতিহাসের দর্শন-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের বা একই সঙ্গে কেউ যদি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হন, তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। এবং এটাও জানতে হবে, সংকলনটিতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বাইরেও বর্ণিত বিষয়ে অনেক বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদ রয়েছেন (বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকে) যাঁদেরকে এড়িয়ে আজ আর ইতিহাসের দর্শন-সংক্রান্ত প্রশ্নে আলোচনা মোটেও সমসাময়িক ও সন্তোষজনক হবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র, ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর—ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, চীন বিপ্লব, কথিত

পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ, বাংলাদেশের উদ্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়ন-পূর্ব ইউরোপ ও চীনের পতন, বিশাল আকারে বহুজাতিক কোম্পানির উদ্ভব, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দাপট, প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়, লগ্নি পুঁজির অস্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধি–অনুষঙ্গ হিসাবে নব্য উদারতাবাদের জয়গান, কথিত সিলিকন বিপ্লবকে কেন্দ্র করে তথ্য প্রযুক্তির আগ্রাসন, এনজিও-সিভিল সোসাইটির বিপুল বিস্তার, সমাজতন্ত্রের সাময়িক পিছু হটা ও পুঁজিবাদের নিদারুণ নৈরাজ্যিক অবস্থা, যে মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, তারাই আজ লড়ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (সর্বক্ষেত্রে নয়—যদিও এটা এখন পরিষ্কার সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ লড়াকু শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত [যেমন শিয়া-সুন্নি, সিরিয়া-তুরস্ক ইত্যাদি] করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে ও একদিকে যেমন গণবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র উগ্রতা অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রায় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে), জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ফলাফল ইত্যাদি মিলিয়ে একটি বিরাট মহাবাচনিক ধারা-প্রক্রিয়ার মধ্যে যেখানে আমাদের নিত্য বসবাস সেখানে চলমান ঘটনাবলির উপর ঐতিহাসিককে সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ পারদর্শিতাসহ উত্থাপিত নতুন নতুন প্রশ্ন, তত্ত্ব বা বয়ানকে আজকের বাস্তবতারই আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা সমীচীন হতে পারে।

মার্কস ফ্রান্সের চলমান ঘটনাবলির উপরই লেখেন তার বিখ্যাত *লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার*। এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা হাজির করেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন,

> This eminent understanding of the living history of the day, this clear-sighted appreciation of events at the moment of happening, is indeed without parallel. But for this, Marx's thorough knowledge of French history was needed.[৪৯] (Engles, 1973, p 396).
>
> [কালের জীবন্ত ইতিহাসের এই মহৎ উপলব্ধি, ঘটনার সময়ে ঘটনা-প্রবাহের এই বিচক্ষণ মূল্যায়ন, বাস্তবিকই অতুলনীয়। তবে এজন্যে মার্কসের ফরাসি ইতিহাসের পুরোদস্তুর জ্ঞানের দরকার ছিল (এঙ্গেলস, ১৯৭৩, পৃ. ৩৯৬)

ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা

সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় ইতিহাস। ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভের জন্য তাই আবশ্যক ইতিহাস অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের মূল শক্তি কী তা জানার। ইতিহাসের পরিবর্তন কে সংঘটিত করে যুগের মহামানব, মানুষের চেতনা, অতিপ্রাকৃতিক বিধাতা? অথবা সমাজ ও সভ্যতা পরিবর্তিত হয় সামাজিক কোনো বিধান বলে? এই প্রশ্ন মনুষ্য সমাজের উদ্ভবকাল থেকেই চলে এসেছে। এ প্রশ্নের দু'টি প্রধান জবাবের সাক্ষাৎ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে সমাজ ও সভ্যতার মূল চালক মানুষের চেতনা। এই

চেতনার মূলে আছেন বিধাতা। বিধাতার নির্বাচিত সম্রাট ও মহামানবগণ সমাজ ও সভ্যতার মূল চালক হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের ইচ্ছাতেই সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ কিংবা বিলয় ঘটে। এই ব্যাখ্যা ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা বলে পরিচিত।...ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা এই চেষ্টারই পরিপোষক। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যার এটাই ছিল প্রধান ধারা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ফরাসী বিপ্লব এই ব্যাখ্যাকে অসার প্রতিপন্ন করে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে ইতিহাসের মূল চালকশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৫০] (সরদার, ১৯৭৩, পৃ ২১২, ২১৩)।

ইতিহাস দর্শনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

Philosophy of History, a field of knowledge which studies the meaning of history, it's laws, and the main trends of main development. Historically, P.H. dates back to antiquity. In the 17th-18th centuries it was elaborated by Vico (q-v.) and the philosophers of Enlightenment (Voltaire, Herder, Condorcet, Montesquieu, (qq.v). To combat the influence of theology on history, dating back to St. Augustine (q.v.), the Enlighteners introduced into P.H. the idea of causality, elaborated the theory of progress. Voiced the idea of the unity of the historical process, and proved the idea of influence of the geographical and social environment on man. Hegel's (q.v.), P.H. was the peak in the development of bourgeois P.H. he regarded history as a single, law-governed, intrinsically necessary process of self-development of the spirit, the idea. The founders of Marxism noted the limitations of P.H., its speculative, a priori and idealistic nature. Their discovery of historical materialism (q.v) provided the basis for a truly scientific philosophical generalisation of history and establishment of its main laws of development. In modern bourgeois P.H. the conceptions of Toynbee and Spengler (qq.v.) predicting the inevitable decline of Western civilisation enjoy a great influence. W. Rostow recently attempted to put forward an optimistic version of P.H. (see Stages of Economic Growth, Theory of). Still, the majority of bourgeois sociologists and historiographers reject any philosophical generalisation of history, regarding it as a chaotic succession of accidents and deny the concepts of causality, regularity, and progress.[৫১] (ed., I, Frolov, Moscow, 1984, p 324)

> [ইতিহাসের দর্শন হলো একটি জ্ঞানক্ষেত্র, যা ইতিহাসের অর্থ, বিধিবিধান এবং মূল বিকাশের প্রধান প্রবণতাসমূহ অধ্যয়ন করে। ঐতিহাসিকভাবে, প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাসের দর্শনের উৎপত্তি। সতের-আঠারো শতকে ভিকো এবং জ্ঞানালোকের দার্শনিকগণ (ভলতেয়ার, হার্ডার, কদরঁসে, মতেঁস্ক্যু) এটাকে সুনির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের উপর ধর্মতত্ত্বের প্রভাব মোকাবিলা করতে গিয়ে সাধু অগাস্টিনের সময় থেকে জ্ঞানলোকবিদগণ ইতিহাসের দর্শনে কার্যকরণ ধারণা প্রচলন করেছেন, প্রগতির তত্ত্ব সুনির্মাণ করেছেন। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঐক্যের ধারণাকে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং মানুষের উপর ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের ধারণা প্রমাণ করেছেন। বুর্জোয়া ইতিহাস দর্শনের বিকাশে

হেগেলের ইতিহাস দর্শন ছিল চূড়ান্ত। তিনি ইতিহাসকে একটি একক, বিধি-নিয়ন্ত্রিত, প্রাণশক্তির ভাবনাটির স্ব-বিকাশের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতেন। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ ইতিহাস দর্শনের সীমাবদ্ধতা, অনুমানমূলক, আশ্রমমুখী এবং ভাববাদী প্রকৃতি উল্লেখ করেছেন। তাঁদের উদ্ভাবিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাধারণীকরণ এবং এর বিকাশের প্রধান প্রধান সূত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রদান করেছেন। আধুনিক বুর্জোয়া ইতিহাস দর্শনে টয়েনবি এবং স্পেংগলারের পশ্চিমা সভ্যতার অনিবার্য অবক্ষয় বিষয়ক প্রত্যয়সমূহ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। সম্প্রতি ডব্লিউ. রস্টো ইতিহাস দর্শনের একটা আশাবাদী ভাষ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। (দেখুন, *থিওরি অব স্টেজেস অব ইকোনোমিক গ্রোথ*)। এখনও, বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তাগণের অধিকাংশই ইতিহাসের যে কোনো দার্শনিক সাধারণীকরণ প্রত্যাখ্যান করেন, এটাকে দুর্ঘটনার বিভ্রান্তিকর পরিচয় হিসেবে বিবেচনা করেন এবং কার্যকারণ, নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রগতির প্রত্যয় অস্বীকার করেন (আই, ফ্রোলভ, মস্কো, ১৯৮৪, পৃ. ৩২৪)।]

ইতিহাস এবং দর্শন এক নয়, অভিন্ন যে হবে এমন উপায় নেই, কিন্তু তারা যে পরস্পরের শত্রু তা-ও নয়। দু'য়ের ভেতর পার্থক্যের জায়গাটা পরিষ্কার; ইতিহাস বিচার করে বিশেষকে, মনে হবে সে বুঝি আটকে আছে ওইখানেই; আর দর্শনের লক্ষ্য তো বরাবরই নির্বিশেষে, তার দাবি সে আটক থাকবে না, সে মুক্ত। কিন্তু সত্য তবু এটাও যে, ইতিহাস দর্শনকে খোঁজে, এবং দর্শন নিজেও আকাশ থেকে নামে না, ইতিহাসের কাল ও স্থান থেকেই বের হয়ে আসে।...ইতিহাসে কাহিনী থাকে, বিবরণ সেখানে অপরিহার্য; ইতিহাসের পদে পদে দলিল-দস্তাবেজ সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন, ওসব ছাড়া সে চলবে কী, দাঁড়াতেই পারবে না। কিন্তু ইতিহাসে তত্ত্বও থাকে, তার প্রয়োজনে কার্যের ব্যাখ্যা করা হয় কারণ দিয়ে, যাতে দেখা যায় ঘটনার পেছনে নিয়ম আছে, ঠিক তেমনিভাবে যেমনভাবে ঘটনার সঙ্গে থাকে ঘটনার তাৎপর্য। তত্ত্বের এই জায়গাটাতে এসে বুঝি আমরা যে, দর্শন ছাড়া ইতিহাস অপূর্ণ, হয়তো-বা মস্তিষ্কবিহীন। আর ওই যে তত্ত্বজ্ঞান তা আসে ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে।

ইতিহাসবেত্তা নিরপেক্ষ হবেন এটা বলা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষতা জিনিসটা আসলে ভুয়া, অনেক ক্ষেত্রেই অতিকথা, কোথাও-বা আত্মম্ভরিতা মাত্র। এমনি বিজ্ঞানও তো নিরপেক্ষ নয়; সে সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিপক্ষে। আর ইতিহাস তো নিরপেক্ষ হতেই পারে না, কেননা ইতিহাসের সৃষ্টিকারীদের মতো লিপিকারও মানুষই, যে মানুষদের দু'জনের দৃষ্টিকোণ এক হয় না, এবং যার দরুন একই ঘটনা সম্পর্কে পাঁচজন লিখলে এক রকমের নয় আমরা পাঁচ রকমের বিবরণ পাই।...রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া চলে কিন্তু তার কর্তৃত্বকারী চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে না। আর এই কর্তৃত্ব যে কেবল প্রশাসন ও আইনের তা নয়। আদর্শেরও। বস্তুত

আদর্শিক আধিপত্য ছিন্ন করার কাজটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫২] (চৌধুরী, ২০০১, ভূমিকা)

তথ্য সম্বন্ধে গবেষণায় মনকে যথাসাধ্য নিরাসক্ত রাখা সমুচিত। পণ্ডিতেরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, ইতিহাস রচয়িতাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। কিন্তু নিজের ও অপরের গবেষণালব্ধ ফল সংগ্রহ করে ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা এবং তার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে মনস্থির করে ইতিহাস রচনা একেবারে নিরপেক্ষ হতে পারে বলে স্বীকার করি না। বারবার দেখা গিয়েছে যে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব ও চিন্তাধারার প্রতিফলন রচনায় অবশ্যম্ভাবী।

তাই তথ্য সন্ধানে নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। কিন্তু তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হল ইতিহাসবিদের কর্তব্য। এই ব্যাখ্যা বিনা বিগত ইতিহাস অসার্থক নীরস, অসংলগ্ন ঘটনার নির্ঘণ্ট মাত্র। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন দিয়ে এই ব্যাখ্যা সম্ভব মনে করি না।[৫৩] (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৮, পৃ ২১)।

ঐতিহাসিকদের নির্দিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণের সময় দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা (১৯৮২) মনে করেন,

> ইতিহাসের 'মূল চালিকা শক্তি' কী, তাই নিয়ে আসল বিতর্ক। বর্তমান সমীক্ষা এই তত্ত্বের উপরই গড়ে উঠেছে যে শ্রেণি গঠন বোঝাবার সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হল উৎপাদন পদ্ধতি এবং তদ্দারা সৃষ্ট সামাজিক উদ্বৃত্তই হল শ্রেণি গঠনের প্রধান হেতু। যদিও জানি বিপরীত মত বহু লোক তুলে ধরেছেন। 'শ্রেণি' এবং 'উদ্বৃত্ত' শব্দগুলিকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকেই, তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে, 'উচ্চবর্গ' বা 'শিরোমণি', 'মর্যাদা', 'ক্রমবিন্যাস', 'সিদ্ধান্ত-করণ' ইত্যাদি কথা।...'ভিত ও উপরিকাঠামোর তত্ত্ব ধরে থাকাকে অনেক সময় ইতর মার্কসবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদ ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শুদ্ধ রূপ পাওয়ার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আমাদের অন্ধ গলির মধ্যে ঠেলে দেয়, এমন বিভ্রান্তি বা কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত।...কিন্তু সূক্ষ্মতা বা পরিশুদ্ধতা এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেই ধ্বংস করতে উদ্যত এবং বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে বস্তুবাদই অনেক বেশি কার্যকর। কেননা 'ইতর' শব্দটাই তো নিম্নশ্রেণির জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত; ভদ্রলোক শ্রেণির কিছু সদস্য দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে শখের কারণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ব্যবহার করেন।'[৫৪] (শর্মা, ১৯৯৮, পৃ ১৩-১৭)।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,

> আমাদের নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকরা প্রায়শ বলে থাকেন, তাঁদের একমাত্র প্রয়াস হচ্ছে to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth—শুনতে ভালো সন্দেহ নেই;...আসল কথা, আমাদের ঐতিহাসিকেরা যখন truth বা সত্যের নামে শপথ গ্রহণ করেন তখন চিত্ত ও চেতনায় যে বস্তু বিরাজ করে তার

> নাম fact বা যথাযথ তথ্য; অনেক সময়ই truth ও fact-কে সমার্থক বলে মনে করেন।...তিনি fact যাচাই করেন, নির্বাচন করেন এবং এ ক্রিয়াটি নির্ভর করে তাঁর অভিজ্ঞতার উপর, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর।[৫৫] (রায়, ২০০৩, পৃ ২৪-২৬)

তাহলে ঘুরে ফিরে দাঁড়াল সেই 'দৃষ্টিভঙ্গি'। অর্থাৎ তিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনি 'তথ্যের' প্রশ্নে আপোসহীন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি তাড়িত। নিশ্চয় এটা অন্যায় নয়। দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তির আদর্শভিত্তিক প্রত্যয় মূলত মতাদর্শগত সমস্যা।

ইতিহাসের দর্শন-এর সঙ্গে ইতিহাসের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। মানুষ যখন ইতিহাস-চর্চা করে, তখন কী করে এবং এই বিশেষ অনুসন্ধান থেকে যে জ্ঞান লাভ হয় তার প্রকৃতিটাই বা কী—এমন সব প্রশ্ন যদি করেন, তাহলে একরকম দর্শন হয় ঠিকই কিন্তু এইসব কথা তুললে অতীত সম্পর্কে নতুন করে কিছু জানা হয় না।...বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে দর্শন সবকিছু বুঝতে চায়। এই যুক্তিপ্রয়োগটা ঐতিহাসিকেরও অবলম্বন। সেজন্য কিছুদূর পর্যন্ত ইতিহাস ও দর্শনের আলোচনা চলা সম্ভব। সেই সম্ভাবনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্ষীণ। কবি কোনওদিন বিশেষ মানুষের স্বপ্ন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবেন, এমন মনে হয় না। অন্য দিকে দেখুন, প্রমাণের ব্যাপারে দার্শনিক ঐতিহাসিকের চাইতে অনেক বেশি সহিষ্ণু। ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কথা বলবেনও না, কথা শুনবেনও না। সেজন্য ঐতিহাসিক বিশেষ কিছু বোঝেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু যেটুকু বোঝেন সেটুকু চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন। দার্শনিক এমন ধারা প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করেন না।...মনে হয় জীবনের মধ্যে সাহিত্যিকও আছেন, ঐতিহাসিকও আছেন, দার্শনিকও আছেন, বৈজ্ঞানিকও আছেন। জীবন সম্পর্কে লিখতে গেলে এঁরা সবাই আছেন। ইতিহাস সত্যের একটা চেহারা দেখে। সাহিত্য অন্যরকম। দর্শন বোধকরি বলতে পারে, ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে যতটা তফাত ধরা হয় ততটা তফাত বোধ হয় নেই। এই বক্তব্যেই বাড়িয়ে ভাবি, জীবনের মধ্যে যদি সব বিদ্যাই থেকে থাকে তাহলে জীবনের সত্যের মধ্যে সকলের সত্যই রাখা থাকবে।[৫৬] (দাশগুপ্ত, ঐ, ২০০১, পৃ. ১৭, ২১, ২২)।

ইতিহাস দর্শনের জনক বলে সর্বাধিক পরিচিত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আল-মুকাদ্দিমা'; ৭৭৯ হিজরি বা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। তিনি মনে করেন; ইতিহাসের বাহ্য বিবরণের তুলনায় তার অন্তর্নিহিত শক্তি অধিকতর ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। খালদুনের ভাষায়,

> এটা আমাদের সম্মুখে বিষয় ও ঘটনাবলির কারণ এবং বিকাশ ও বিনাশের মৌলিক উপাদানসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করে। এ কারণেই ইতিহাস যথার্থভাবে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত।...তিনি তার আগের ঐতিহাসিকদের সমালোচনা করে বলেন তাদের সংগৃহীত বিবরণ ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হয়ে

> পড়েছে। তাঁরা কোনো রাষ্ট্রের বিবরণ দিতে গিয়ে একান্তই যান্ত্রিকভাবে বাহ্যজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। তার উত্থান-পতন, সুবিধা-অসুবিধার বিবরণে কার্যকারণ বিশ্লেষণের কোনো প্রকার চেষ্টা করেন নি। এ কারণে তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস পাঠককে শুধু রাষ্ট্রশক্তির প্রারম্ভ অথবা বিনাশের কথাই জ্ঞাপন করায়; একটি রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে অন্য একটি শক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়—কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে; সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই দেয় না। বস্তুত এ সকল ঐতিহাসিকের জন্য পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা এ কার্যকারণের বিশ্লেষণের ওপর অধিকতর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তা হয় নি।[৫৭] (খালদুন, ২০০৭, পৃ ৬৭, ৬৯)।

ইতিহাসের দর্শন অনুসারে, বিশেষত হেগেল যার প্রতিনিধি, এইটি মানা হয় যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের বাহ্যিক এবং আসল উদ্দেশ্যাবলিও কোনো মতেই ঐতিহাসিক ঘটনার চরম কারণ নয়, এই উদ্দেশ্যের পিছনে অন্য কোনো চালিকাশক্তি বর্তমান এবং তারই আবিষ্কার প্রয়োজন।

অতএব, যখন চালক শক্তিগুলিকে অনুসন্ধান করবার প্রশ্ন ওঠে, যে শক্তি ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের প্রেরণায় পিছনে সচেতন বা অচেতনভাবে এবং আসলে প্রায়ই অচেতনভাবে বর্তমান এবং যেগুলি হল ইতিহাসের প্রকৃত চরম চালিকা শক্তি, তখন প্রশ্নটা আসলে ব্যক্তি বিশেষদের উদ্দেশ্য নিয়ে ততটা নয়, তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন, যতটা সেই সব প্রেরণা নিয়ে যা বিপুল জনগণকে, সমগ্র জাতিকে এবং জাতির অভ্যন্তরস্থ সমগ্র শ্রেণিকে সচল করে তোলে এবং তা খড়ের আগুন যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে যায় সেরকম ক্ষণিক নয়, বরং বিরাট ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটনার মতো একটা স্থায়ী কর্মের জন্য। কর্মরত জনগণ ও তাদের নেতা তথাকথিত মহাপুরুষদের মনে যা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বা মতাদর্শগত ও এমনকি মহিমান্বিতরূপে সচেতন প্রেরণা হিসেবে প্রতিফলিত হয়, সেই চালক হেতুগুলিকে নিরূপণ করাই হল একমাত্র পথ এবং এই পথে অগ্রসর হয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট এক একটা যুগে ও নির্দিষ্ট এক একটা দেশের ক্ষেত্রে সক্রিয় নিয়মগুলির খোঁজ পাব। যা কিছু মানুষকে সচল করে তোলে সেটা তার মনের মধ্যে দিয়ে সক্রিয় হতে বাধ্য; কিন্তু তার মনে এর কী রূপ দাঁড়াবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর।[৫৮] (এঙ্গেলস, ১৯৭২, পৃ ৭৫-৭৬)।

মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলো অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কগুলোর সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলো হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের

সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।[৫৯] (মার্কস, ১৯৭১, পৃ ২৫)।

শুধু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইতিহাসগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই (প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদ দিলে সব বিজ্ঞানই হল ইতিহাসগত বিজ্ঞান) এক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার হল এই প্রতিজ্ঞা যে, 'বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে'; ইতিহাসের যে সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের যে সব ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থার, যে-সব তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয়, তা সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে হলে আগে সেই যুগের মানুষের বৈষয়িক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকেই এদের উৎপত্তি। 'মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।' সূত্রটি এত সহজ-সরল যে, ভাববাদী মোহে আচ্ছন্ন নয় এরকম যে কোনো ব্যক্তির কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। কিন্তু বিরাট বৈপ্লবিক পরিণাম এর মধ্যে নিহিত, শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়েও।

অন্যান্য সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তাপদ্ধতি থেকে হেগেলের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য তাঁর প্রচণ্ড ইতিহাসবোধে'র ওপরেই তার ভিত্তি।...ইতিহাসের মধ্যে যে একটা ক্রমবিকাশ, একটা অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাবার চেষ্টা করেন; এবং তাঁর ইতিহাস-সম্পর্কিত দর্শনের অনেক কিছুই আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গির মহিমা আজও শ্রদ্ধেয়, সেটা তাঁর পূর্বগামীদের সঙ্গে, অথবা বিশেষ করে তাঁর সময়কালের পর থেকে ইতিহাস নিয়ে সাধারণ ভাবনা করেছেন এরকম যে-কারুর সঙ্গেই তাঁর তুলনা করি-না কেন। তাঁর 'চেতনাবাদ', 'নন্দনতত্ত্ব', 'ইতিহাসের দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই তার এই অপূর্ব ইতিহাসবোধের প্রাধান্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসগতভাবে ইতিহাসের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট, যদিও বিমূর্ত বিকৃত আন্তঃসম্পর্কে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই যুগান্তকারী ধারণাই হল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ তত্ত্বগত ভিত্তি এবং যুক্তি-পদ্ধতির জন্যও একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল এই থেকেই।[৬০] (এঙ্গেলস, ঐ, ১৯৭২, পৃ ৩১, ৩২, ৩৬)।

ফরাসী ঐতিহাসিক জ্যাঁ শেঁনো (Jean Chesneaus) বলেছিলেন,

> ইতিহাসকে শাসকশ্রেণিরা ব্যবহার করে তাদের মতাদর্শ ও রাজনীতির স্বার্থে। জনসাধারণের চেতনাকে প্রভাবিত করার এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। তারা যেমন তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ইতিহাসকে কাজে লাগায়, তেমনই জনগণের সংগ্রামের স্বার্থেও ইতিহাস বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তা নির্ভর করছে ঐতিহাসিক কোন্ শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতকে দেখবেন।[৬১] (ঘোষ, ২০০১, মুখবন্ধ)।

৫

ইতিহাস চর্চা : দক্ষিণ এশিয়া। পর্ব-এক : মধ্যযুগ

প্রথমেই বলে কয়ে নিয়েছি এখনকার এই আমাদের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন ও গুরুত্ব কেন? কয়েক দশক আগে থেকেই প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ এশিয়া গবেষণা কেন্দ্র বা এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আদৌ আছে কি না তা অবশ্যই আমার জানা নেই।

নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা দাবি করে আর অগ্রসর না হতে। এটা মান্য করেই বলছি, পাঠকের অস্বস্তির প্রতি অন্তত কিছুটা ইঙ্গিত থাকুক যাতে বিষয়টির দিকে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের অনুগ্রহের দৃষ্টি পড়ে।

এটা খুবই জানা বিষয়, ইংরেজরাই আজকের ভারত-ইতিহাস চর্চার গোড়াপত্তন করে। প্রাচ্যবাদী বা হিতবাদী যে গোষ্ঠীরই ঐতিহাসিক হন-না কেন তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটিই—তারা ইতিহাস-চর্চার এমন একটি ছক তৈরি করে দেবেন যাতে ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও নীতি কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। এর ফলে, এমনকি দেশপ্রেমিক বলে পরিচিত ও ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতজনও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেবেন ভারতের একটা অতি দুঃসময়ে ইংরেজরা ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা অনেক দোষ-ত্রুটি করতে পারে বটে তবে তার দ্বারা এটা ম্লান হয়ে যায় না, ভারতকে তারা আলোকিত ও আধুনিক করেছিল, উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছিল। এর ফলাফল একেবারে শেষে এসেও আমরা দেখতে পেলাম : ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যখন পরস্পরের হাতে নিহত হচ্ছে তখন ইংরেজরাই এদেশে সবচেয়ে নিরাপদ—তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান বুঝে নিয়েই প্রত্যক্ষ ভারত শাসন থেকে অব্যাহতি নিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, উইলকিনস, জন শোর, চার্লস গ্রান্ট (ইভানজেলিক) ও ইংরেজ প্রশাসকদের মধ্যে এলফিনস্টোন আলফ্রেড লায়াল ইত্যাদি ভারতের ইতিহাস-চর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য।

ইংরেজপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক প্রভাবশালী বই লেখেন জেমস মিল ১৮১৭ সালে। মিল ভারতবর্ষে কখনও আসেন নি এবং কোনো ভারতীয় ভাষা তিনি জানতেন না। জেমস মিলের আরব্ধ ইতিহাস রচনার পরম্পরা ইংরেজ ইতিহাসবিদদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্টই প্রভাবশালী ছিল।[৬২] (মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ২০০৩, পৃ ২৩)।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার যে প্রাথমিক কাঠামোটি দাঁড় করানো হয় তার রচয়িতাদের মতে, আদিতে জাতির ইতিহাস ছিল ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল। এখানে জাতি বলতে কখনো বাঙালি, কখনো হিন্দু, কখনো আর্য, কখনো ভারতবর্ষীয়, যে কোনও একটা বলা যেতে পারে। কিন্তু যুক্তির কাঠামো ছিল একই। এরপর এল জাতির অবক্ষয়ের যুগ, কারণ মুসলমান শাসন অর্থাৎ জাতির

পরাধীনতা। এর থেকে পরিত্রাণ অর্থাৎ জাতীয় সমাজের সংস্কার এবং পুনরুজ্জীবন একান্তভাবেই ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল। এইভাবে একদিকে যেমন উইলিয়াম জোনস্ প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের গবেষণায় প্রাচীন ভারতের কাব্য দর্শন নিয়ে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তেমনি প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে মুসলিম রাজত্বের অপদার্থতা সম্বন্ধেও ইংরেজ লেখকরা মোটামুটি একমত ছিলেন। এই অপদার্থতার কাহিনী ব্রিটিশ শাসনের সপক্ষে যুক্তি হিসেবেই উপস্থিত করা হত। এইভাবে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার ছোঁয়ায় এদেশে যখন 'জাতীয় ইতিহাস' রচনা শুরু হলো, তখন একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতকে কল্পনা করে দেওয়া হলো সমস্ত আধুনিকতার ক্লাসিকাল সূত্র হিসেবে, তেমনি মুসলিম শাসনকে ঠেলে দেওয়া হলো মধ্যযুগীয় অন্ধকারে। মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো; ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয়, দুর্নীতিপরায়ণ এবং নিষ্ঠুর;—ভারতীয় লেখকরা এইভাবে যে ইতিহাস রচনা করলেন, সেখানে ঔপনিবেশিক পর্বে পরাধীন জাতির ঐতিহাসিক মুক্তির যে আধুনিক চেতনা দেখা গেল, তার শর্তগুলো উপস্থিত করেও শোনান হল কেবল মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতির বাহুবলের কাহিনী, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে থাকলেও প্রস্তাব কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে হাজির করা হয় নি।

ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগের ঠিকানা সেই প্রাচীন হিন্দুযুগে, মুসলমান যুগে সেই স্বর্ণযুগের অবসান, ব্রিটিশ শাসনে বা আধুনিক যুগে সেই অন্ধকার অধ্যায় থেকে মুক্তি। আমাদের নবজাগরণ এই ধারায় নিয়েই চলেছে। পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই ধারণাকেই সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সাজিয়েছে। ভারত হয়ে উঠেছে হিন্দু-ভারত।[৬৩] (নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০১, পৃ ৩৪, ৩৫)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতানা, এই দুই প্রান্তের ইতিহাস ইংরেজিতে সহজলভ্য ছিল, এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্নেল টড এবং গ্রান্ট ডাফ লিখিত বই পড়ে তাঁদের নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে নতুন করে গৌরববোধ করেন। জেমস টডের দু খণ্ডে লেখা *অ্যানাল্‌স্ অ্যান্ড অ্যান্টিকিউটিজ অব রাজস্থান* (১৮২৯ ও ১৮৩২) বহু লেখকের কল্পনায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে, এবং বাংলা ভাষায় তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ডাফের তিন খণ্ডে লেখা *হিস্টরি অব দ্যা মারাঠাজ* (১৮২৬) শুধু মহারাষ্ট্রের পাঠকদের উত্তেজিত করে তাই নয় গঙ্গাবিধৌত দক্ষিণবঙ্গে ধানখেত পরিবেষ্টিত শাবাজপুরে বসে সরকারী আমলা রমেশচন্দ্র দত্ত এই বই পড়ে শিবাজীর স্বপ্ন দেখে রাত্রি যাপন করেন সে কথা আমরা তাঁরই জবানিতে জানতে পাই। শিবাজী বা রানা প্রতাপ শুধু যুদ্ধে পরাক্রম এবং পৌরুষের পরাকাষ্ঠা ছিলেন না—তাঁরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তার যোগস্থাপনে সেতুর কাজ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক গৌরব অনায়াসে হিন্দু জাত্যভিমানের সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, এবং মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামই জাতীয় অস্মিতা প্রমাণের একমাত্র চিহ্ন বলে বিবেচিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। যে যুগে এই লেখকরা

তাঁদের উপন্যাসে হিন্দু পরাক্রমের বর্ণনা করেছেন তখন ক্ষমতায় আসীন ইংরেজ শাসক।[৬৪] (মীনাক্ষী, ঐ, ২০০৩, পৃ ৩৯, ৪০)।

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় মহামতি টডের 'রাজস্থান'-যাহা এতদিন আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়াছি—উহার অধিকাংশ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।[৬৫] (কানুনগো, ১৩৯৬, পৃ ২)।

স্যার হেনরি এলিয়ট ছিলেন কোম্পানিরই উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী। উত্তরপ্রদেশে বড়-সাহেবি করে তাঁর কর্ম-জীবন কাটে। এই অঞ্চলের অনেক বনেদি পরিবারের সঙ্গে তাঁর কর্মসূত্রে পরিচয়। স্যার হেনরির নেশা ছিল ফারসি পুঁথি সংগ্রহ করা। এই সব পরিবার তাদের পুঁথি বড়-সাহেবকে এনে দিত।...হেনরির বেশ ক'জন মুনশি ছিল। অল্প মাইনেতেই তারা কাজ করত আর 'মর্মোদ্ধার' যেটুকু করতে পারত, সাহেবকে এনে দিত। সাহেব ক্ষেমাঘেন্না করে ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন। এইভাবে এই বই লেখা হত। এখন, স্যার হেনরি তো গত হলেন। কিন্তু কাজ করার জন্য কোম্পানি ডাকলেন স্যান্ডহার্স্ট কলেজের অধ্যাপক জন ডসনকে। জন ডসন হেনরি এলিয়টের কাজ গুছিয়ে দেওয়ার পর আট খণ্ডে প্রকাশিত হল *এলিয়ট অ্যান্ড ডসন, দ্য হিস্টরি অভ ইনডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই হার ওন হিস্টোরিয়ানস* এই ইতিহাস বেশ সমাদৃত।

স্যার হেনরি মোটামুটি তিনটি কথায় বিশ্বাস করতেন এবং কথাগুলো এই বইয়ের ভূমিকায় জোর দিয়ে বলেও গেছেন। প্রথমত, তিনি একজন ইংরেজ রাজ-পুরুষ। ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য যে ভারতবাসীর প্রভূত কল্যাণ করছে এবং আরও করবে এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সমস্ত ঘটনাটাই বিধির বিধান। অদৃষ্টই ইংরেজদের ভারতবর্ষ শাসন করার জন্য ডেকে এনেছে। এলিয়ট এই বিধিলিপিতে বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বাসটি এরই রকমফের। ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের আগেও তো সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের গুণপণার কাছে সেগুলো কিছু-না। যেমন 'মুসলমান' শাসনের সময় চিন্তার স্বাধীনতা বলতে কোনও বস্তু ছিল না।...ইংরেজ-শাসনের শান্তি ও সুবিচার আগে মিলত না। এর থেকে যে তৃতীয় বিশ্বাসে স্যার হেনরি গেলেন সেটা ভারতবাসীর পক্ষে আরও মারাত্মক হয়েছে। মুসলমানদের কাজই হল হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করা (এবং পারলেই তাদের মন্দির ভেঙে দেওয়া)। মুসলমানদের হাতে যখন শাসনভার ছিল তখন হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে কোনওক্রমে বেঁচে ছিল। ইংরেজ রাজত্বে কী হিন্দু, কী মুসলমান, সকলেই সুখে আছে। এই হল হেনরি এলিয়টের মেজাজ। 'এলিয়ট অ্যান্ড ডসন' এই মেজাজেই লেখা।[৬৬] (দাসগুপ্ত, পূর্বোক্ত, ২০০১, পৃ ২৩, ২৪, ২৫)।

সাম্রাজ্যশাসনকে চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায় নিয়ে বিজয়ী ইংরেজ চেষ্টা করেছিল যাতে আমাদের মনে দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি ধারণা দৃঢ়মূল হয়। প্রাচীনযুগে ভারতের অধ্যাত্মগৌরব নিয়েই যেন আমরা গর্ব করি অথচ ধরে নেই

যে বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ছিল ব্যর্থ, জীবনের পরীক্ষায় পরাজিত। অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলমান আধিপত্যের যুগ সম্বন্ধে একটা বৈরি ধারণা খাড়া করা হয়েছিল যে, দেশে যাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য সেই হিন্দুরা তখন অত্যাচারিত অবহেলিত, অপমানিতজীবন যাপনে বাধ্য ছিল—আর ইংরেজ বিদেশী হলেও যেন এল তাদের পরিত্রাতা রূপে! বহুখণ্ডে মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত বিবরণগুলি (Eliot and Dowson এর সম্পাদনায়) প্রকাশ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষকে বিষাক্ত করে তোলা যায়, আর ইংরেজের পক্ষে সাম্রাজ্য সংরক্ষণের স্বার্থে ইতিহাসসিদ্ধ বিভেদনীতি—'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'—অনুসরণ করা সহজ হয়। মুসলমান আধিপত্যের কাল সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদ-প্ররোচিত এই ধারণা গণ্যমান্য ঐতিহাসিকরাও অনেকে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ করে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে এবং মূলত সমাজ ও অর্থনীতিগত আলোচনার কল্যাণে প্রকৃত তথ্য ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৬৭] (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ এগারো)

ডো. মিল. এলফিনস্টোন ছাড়াও এলিয়ট ও ডাওসন ভারতের মধ্যযুগকে প্রায় বর্বর ও অন্ধকার যুগ বলেই চিহ্নিত করেছেন যাতে ভারতীয়গণ ব্রিটিশ শাসনকে 'সুশাসনে উত্তরণ' হিসাবে মেনে নিতে পারেন। এদের মতে ব্রিটিশদের মতো মুসলমানরাও ছিল বিদেশী। কিন্তু মুসলমান শাসন যেখানে ছিল স্বেচ্ছাচারী সেখানে ব্রিটিশ শাসন ছিল সহৃদয় ন্যায্য ও আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশরাই হিন্দুদের এনে দিয়েছে মুক্তির আস্বাদ, তাই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ভারতীয়রা যখন জাতীয় ইতিহাস লিখতে শুরু করেন তখন মুসলমান শাসনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও ঔপনিবেশিক লেখকদের থেকে ভিন্ন ছিল না। এই লেখকেরা দেশের বা জাতির ইতিবৃত্ত রচনার কথা বলেছেন, জাতি বলতে কখনও বাঙালী, কখনও হিন্দু, কখনও আর্য, কখনও ভারতীয় বোঝানো হয়েছে।[৬৮] (গোস্বামী, ২০০৩, পৃ ৩০, ৩১)

ইউরোপীয় লেখক-ঐতিহাসিক-প্রশাসকদের চোখে ইসলাম ছিল বর্বর, লুঠেরা ও দখলদারের ধর্ম, যারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে একের পর এক নিষ্ঠুর আক্রমণ ও ধ্বংসকাণ্ড চালিয়ে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের হাতে দিল্লির সুলতানরা মন্দির-মূর্তি ধ্বংসকারী মূর্তিমান দুশমনে পরিণত হয়েছে। মিশনারি আলেকজান্ডার ডাও তার *হিন্দুস্তানের ইতিহাসে* (১৭৭০) বলেছেন মুসলমান শাসকরা তরবারির জোর খাটিয়ে ভারতের মানুষের দেহকে শুধু নয় মনকেও বন্দি করে ফেলে—এইভাবে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে পারে। এ দেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও তার বেঁচে থাকার পরিবেশ—এই উভয়ের কারণে—হিন্দুরা আজ 'দুনিয়ার সব থেকে পৌরুষহীন ভীরু জাতি' হিসেবে ভয়ঙ্কর মুসলমান আক্রমণকারীদের অনুগত প্রজায় পরিণত হয়েছে।[৬৯] (চক্রবর্তী, ২০১০, পৃ ৭৩)

বিশপ হেবার (১৮২৩-২৬) বারবার হিন্দুদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটিশ তো তাদের দখল করে নি, তারা আগে থেকেই মুসলমানদের অধীনে ছিল। তিনি মনে করিয়েছেন মুসলমান শাসকরা ব্রিটিশদের মতোই রক্ত সম্পর্ক বা ধর্মের দিক থেকে ভারতে বহিরাগত আগন্তুক এবং তারা ব্রিটিশদের চেয়ে ঢের বেশি অত্যাচারী ছিল।[৭০] (মুশিরুল হাসান, ২০০৭, পৃ ১৮৬-২০৮)

এখানে আমার মূল প্রতিপাদ্য : ভারতের ইতিহাস চর্চা ও রাজনীতিতে এটা মোটামুটি গৃহীত হল, মধ্যযুগ বা মুসলিম পর্ব ছিল বিদেশী শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক ও সাম্প্রদায়িক; ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতকে একটি পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে মুক্ত করে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তার সংযুক্তি ঘটিয়ে ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ভারত-ইতিহাস/দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় এর ফলাফল হয়েছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী।

ঔপনিবেশিক শাসকদের ইতিহাসের দর্শন ছিল ও আছে এরকম যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্বর (Uncivilized) অত্যাচারী, স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক মুসলিম শাসনকে তারা ধ্বংস করেছে; ভারতীয়দের স্বার্থেই ভারতীয়দের দায় ইংরেজরা কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়ে ভারত ক্রমাগত আধুনিক হয়ে উঠেছে। পলাশী যুদ্ধে ভারতীয় শাসকদের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই মধ্যযুগের অবসান ঘটেছে। প্রায় অনুরূপ বক্তব্যই অত্যন্ত জোরের সাথেই হাজির করেছেন উপনিবেশিক আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার। তিনি পলাশীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন অনেকটা থরথর কাব্যিক আবেগে;

> When the sun dipped into the Ganges behind the blood-red field of Plassey, on that fateful evening of June, did it symbolise the curtain dripping on the last scene of a tragic drama?...Today the historian, looking backward over the two centuries that have passed since then, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the line of which the history of the world has not seen elsewhere. On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began...
>
> [পলাশীর রক্ত-রাঙানো ময়দান পেছনে যখন গঙ্গানদীতে সূর্য তলিয়ে যায়, জুনের সেই ভয়াল সন্ধ্যায়, এটা কি কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা প্রবাহের শেষ দৃশ্যের যবনিকাপাত ছিল? বর্তমানে ইতিহাসবিদগণ পেছনে ফিরে দেখবেন তারপর দু'শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, জানতে পারেন সেটা ছিল সূত্রপাত, ধীরে এবং অগোচরে, এক গৌরবময় সকাল, বিশ্ব ইতিহাস অন্য কোথাও এই রেখাটি দেখে নাই। ২৩ জুন, ১৭৫৭ সাল, ভারতের মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগ শুরু হয়।]

মোগল শাসন সম্পর্কে তিনি বলেন,

> Its potency for good, its very life was gone. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient, and the mass of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance and moral degradation by a small, selfish, proud, and unworthy ruling class...Education, literature, society, religion man's handi work and political life, all felt the revivifying touch of the new impetus from the west. ...It was truly a Renaissance, wider, deeper, and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople.[৭১]
>
> [এর মঙ্গল শক্তি, জীবনী শক্তি শেষ হয়েছে। দেশের প্রশাসন নৈরাজ্যজনকভাবে অসৎ ও আনাড়িতে পরিণত হয়েছে এবং একটি ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, অহংকারী এবং অপদার্থ শাসক শ্রেণি কর্তৃক ব্যাপক জনগোষ্ঠী চরমতম দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং নৈতিক অধঃপতনে তলিয়ে যায়...। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, মানুষের হাতের কাজ এবং রাজনৈতিক জীবন সবকিছুই পশ্চিমা নতুন প্রণোদনার সঞ্জীবতার ছোঁয়া অনুভব করেছে। এটা ছিল সত্যিকার রেনেসাঁস, বিস্তৃততর, গভীরতর, এবং কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপের চেয়েও অধিকতর বৈপ্লবিক।] (যদুনাথ সরকার, ১৯৭৬, পৃ ৪৯৭, ৪৯৮)।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি (খ্যাতনামা ঐতিহাসিক) সুরেন্দ্রনাথ সেনের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

> ব্রিটিশরা ইচ্ছা করেই ভারতীয়দেরকে আঘাত করতে চান নি। তারা তরবারীর বলে ভারত জয় করলেও তরবারি দিয়ে দেশ শাসন করতে চান নি। ব্রিটিশরা বিশ্বাস করত যে, তারা একটি উন্নত জাতি ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী। প্রাচ্যের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো প্রদান করতে তারা আগ্রহী ছিল। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতামতেরই প্রতিফলন। তিনি ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণ, অত্যাচার এবং নির্যাতনের দিকটি প্রত্যক্ষ করেন নি।[৭২] (মঞ্জুর, ১৯৯৭, পৃ ১৫৯)।

আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন যেহেতু তখনকার যুগে ব্রিটেনই সর্বাগ্রগণ্য দেশ সেইজন্য ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস ও রূপান্তর ব্রিটিশ রাজত্বের মাধ্যমেই ঘটবে। ফলে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি তাঁদের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন; ব্রিটিশ শাসনকে, এমনকি, 'দেবপ্রেরিত' বলেও তাঁরা বর্ণনা করতেন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়েও এই সমর্থন অবিচলিত ছিল।[৭৩] (বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ১৯৭৩, পৃ ২৯)। অবশ্য এই সব ঐতিহাসিকরা মনে করেছেন অর্ধশতাব্দী ধরে বুদ্ধিজীবীদের বর্ণিত মনোভাব বজায় থাকলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকলে অনেকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে থাকে। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ করে কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন। তাদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই এবং নেতৃত্বও এসেছে তাঁদের কাছ থেকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে বিদ্রোহের সময় ও বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে শুধু দিল্লীতেই অন্তত ২৭,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। পরেও, বহুদিন ধরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের দেখত গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে।[৭৪] (ঐ, পৃ ৮৬)।

মনে করি, ঔপনিবেশিক শাসনের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে যে কোনো যুক্তিই নাকচযোগ্য। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন-দর্শন বা তাদের ইতিহাস দর্শনের পাল্টা কোনো ইতিহাস দর্শন দাঁড় করানো যায় নি; তবে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখতে চেয়েছেন। যে ঘরানার ঐতিহাসিকই হোক-না কেন স্পষ্ট বা ছদ্ম আবরণে, বাস্তবতার নামে ব্রিটিশ শাসনের কিছুটা হলেও ইতিবাচক ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা করেও শেষ পর্যন্ত উপনিবেশিক শাসনকেই সমর্থন করেছেন।

আমরা মনে করি উপনিবেশিক রাষ্ট্র ঐ দেশের জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কোনো বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার লুণ্ঠনের স্বার্থে পরাধীন দেশে একপেশে বিকৃত অর্থনীতি গড়ে তোলে, যে অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত হয়। তার নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকা থাকে না। ফলে অগ্রগতির পরিবর্তে পরাধীন দেশের পিছু-হটা শুরু হয়। উপনিবেশিক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড মৌলিক কোন পরিবর্তনের সহায়ক নয় বরং পরিপন্থী। যে সমাজবিপ্লব পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেবে সেই বিপ্লব সংঘটিত করতে পারলে নতুন ব্যবস্থার জন্ম হতে পারে, না হলে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। উপনিবেশিকতার কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই।

ব্রিটিশ শাসন ভারতে কোনো সৃজনশীল ভূমিকা পালন করে নি। তার ভূমিকা ছিল শুধু ধ্বংসাত্মক। বাংলায় তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল, কারণ বাংলা ছিল ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ শোষণের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজ অনড়, গতিহীন, নিস্তরঙ্গ ছিল এবং বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল—এই ধারণাও সঠিক নয়।[৭৫] (ঘোষ, ঐ, ২০০১, পৃ ২৯)।

৬

ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা। পর্ব-দুই : সাম্প্রদায়িকতা

শিরোনামটি ঐতিহাসিক গৌতম নিয়োগীর বহুল-পরিচিত একটি পুস্তকের নাম। ৯০-এর দশকে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক জিগির সৃষ্টি করা হয়েছিল তার উপর মন্তব্য করতে যেয়ে গৌতম নিয়োগী বলেন,

> শুধু অধুনা কেন, এই নানা স্তরের সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ও ব্যাপ্তির এক দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক পটভূমিকাও আছে যার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে। ইতিহাস ব্যাখ্যা বিকৃত হলে সমাজে তার কুফল পড়ে এবং তার মাশুল গুণতে হয় জনগণকেই; তাই সমাজে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিস্তারে ভারত-ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ কী ভূমিকা নিয়ে থাকে তা খোলা মনে, নির্মোহ ও অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে, আলোচনা করা দরকার।[৭৬] (নিয়োগী, ১৯৯১, পৃ ১)।...
>
> আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং আদর্শ যে সব কারণে দানা বাঁধে এবং ক্রমে বদ্ধমূল হয় তার মধ্যে ইতিহাস রচনা এবং পাঠ অন্যতম প্রধান।[৭৭] (ঐ, পৃ ২৯)।

প্রকৃতপক্ষে, একটুও অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে, ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই বরাবর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মতবাদকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে এসেছে।[৭৮] (বিপান, ১৯৭৬, পৃ ৫৩)।

বাবরি মসজিদ ভাঙা হল ও ঘটল গুজরাতে নরমেধ যজ্ঞ আবারও সেই ইতিহাস নিয়েই টানাটানি। ভারতীয় উপমহাদেশে ঐতিহাসিক, গবেষক এবং পণ্ডিতদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসটা গৌণই রয়ে গিয়েছে। এটাই যে সবচেয়ে বড় কঠিন সমস্যা তা যেন কেউ বুঝতেই চাইছেন না। ঐতিহাসিকরা ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকেই বড় করে দেখাতে চান। সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষয়টিকে তুচ্ছ ভেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।[৭৯] (*গুজরাত, নরমেধ যজ্ঞ* : ২০০২, পৃ ১০)।

এটা বিশেষভাবে সত্য যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত চরমপন্থী চিন্তা ও প্রচারের মধ্যে জোরালো হিন্দু ধর্মীয় উপাদান ছিল। বহু চরমপন্থী, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনকে অভিন্ন বলে দেখতেন, ভারতীয় সংস্কৃতি বলে মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাদ রেখে কেবল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলতেন, ভারতের ঐক্যের কথা বলতেন হিন্দু ঐক্যের ভাষায়, এবং জাতীয়তাবাদকে দেখতেন একটি ধর্ম রূপে যে ধর্ম অনিবার্যভাবে হত হিন্দুধর্ম। তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি হিন্দু মতাদর্শগত প্রভাব দিতে, বা কমপক্ষে তার দৈনন্দিন রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি হিন্দু বাক্-রীতি দিতে চেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে বাংলা, হিন্দী, উর্দু এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা এক ধরনের আধুনিক সাহিত্য, যার বক্তব্য ছিল অংশত সাম্প্রদায়িক, সেগুলোর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এই সাহিত্যের প্রতিনিধি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরের দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো; যেগুলো পরে এই ধরনের ভারতীয় সাহিত্যের মূল রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিম মুসলিমদের বিদেশী হিসাবে দেখিয়েছেন এবং জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয়ত্ব বা দেশজ সবকিছুকে হিন্দুদের সঙ্গে অভিন্ন রূপ কল্পনা করেছেন।[৮০] (বিপান, ১৯৮৯, পৃ ১৪৬)।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, তাঁরা কেউই মিলের পর্ব-বিভাগ সম্বন্ধে কোনোরকম প্রশ্ন তোলেন নি।...কিন্তু এই ধরনের পর্ব-বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের গুণগান মূলত হিন্দু যুগের গুণগান হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দুই যুগের মধ্যে পৃথকীকরণ আরো বেশি অনড় হয়ে ওঠে।...'মুসলমান যুগ'-কে অধঃপতনের যুগ বলে ধরে নেওয়া হল এবং মনে করা হল যে তার দুর্বলতার জন্যেই ব্রিটিশ শাসন স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, একথাও বলা হত যে মুসলমান যুগে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই 'জাতির' উদ্ভব হয়েছিল এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর একমাত্র পরিণতি হতে পারে সমগ্র দেশকে হিন্দু ও মুসলমান অধিকৃত দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে ভাগ করা। এ কথা বিশেষ ভেবে দেখা হল না যে ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতি সমার্থক নয়। উনিশশো তিরিশ-চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে এই ব্যাখ্যা ও বিভেদ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের সমস্যার কোনো সমাধান হল না।...ইতিহাস-চর্চা হল একটি অগ্রগামী বিদ্যা যাতে নতুন গবেষণার রীতি এবং বিশ্লেষণের কৌশল ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস রচনার ধারা পর্যবেক্ষণ করলে এই সব কৌশলের পরিবর্তন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। প্রচলিত ধারণাগুলো সর্বদাই যাচাই করা উচিত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দুর্বল হলে তাদের বর্জন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। মিথ্যা ইতিহাস রাজনীতিমূলক উপকথা রচনায় সাহায্য করেছে—ঐতিহাসিকরা তাঁদের অধীত বিদ্যায় এই অধঃপতন মেনে নিতে পারবেন না। যেহেতু ঐতিহাসিকরা সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাসের জনক হতে পারেন, সেজন্য তাঁদের ইতিহাসের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বলাভ করে।[৮১] (থাপার, ১৯৭৬, পৃ ১৬, ১৭, ২৭, ২৮)।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের প্রায় কিছুই দিতে পারে না। এর ফলে শুধু যে প্রচণ্ড ক্ষতি শুধু ভারত-ইতিহাস চর্চার প্রশ্নে হয়ে গেছে তাই নয়, ভবিষ্যতেও আরো অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। যেমন, মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রণয়নের ঢের আগেই ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা তার একটি পূর্বতন সংস্করণ খাড়া করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে একজাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতির মানে হল হিন্দুজাতি, ভারতীয় জনগণ বললে হিন্দু জনগণকে বোঝায়; মুসলমান শাসন ছিল বিদেশী শাসন সুতরাং ভারতে মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশী মাত্র ছিলেন, ইত্যাদি।[৮২] (ঐ, ১৯৭৬, পৃ ৭১)।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করার কাজে এধরনের মহাপুরুষ সৃষ্টি—রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি যাঁরা মধ্যযুগে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে উপকথা রচনা—অন্য যে কোনো মতবাদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এক কলমের খোঁচায়, প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে এই ধরনের মহাপুরুষ-পুরাণ দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মূল সাম্প্রদায়িক

দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য প্রমাণ করে দিয়েছিল। কী হিসেবে তাঁরা 'জাতীয়' নায়ক, এবং তাঁদের সংগ্রাম কী অর্থে 'জাতীয়' সংগ্রাম? তাঁরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন বলে? কী অর্থে মোগলেরা বিদেশী? কারণ তাঁরা মুসলমান ছিলেন। রানা প্রতাপ, শিবাজী এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের 'জাতীয়তাবাদের' ঐক্যসূত্র কী ছিল? তাঁরা হিন্দু বা অ-মুসলমান ছিলেন। এভাবে মহাপুরুষ-পুরাণগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল।[৮৩] (বিপান, ঐ, ১৯৭৬, পৃ ৭৭)।

যখন আমরা ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব, যখন বিশেষ কোনো শাসক বা শাসকশ্রেণীর ইতিহাসমাত্র না পড়ে সমস্ত সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করব, একমাত্র তখনই আমাদের ইতিহাসচেতনা প্রকৃতই এবং যুক্তিযুক্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবে। সমগ্র সমাজের ইতিহাস, তার চরিত্র ও গঠনভঙ্গি, যার থেকে পরস্পর-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কাছাকাছি সময়ে বা একই সঙ্গে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিরোধ, সেই সম্প্রীতি ও বিরোধের ক্ষেত্রে এই সবই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত।[৮৪] (মুখিয়া, ঐ, ১৯৭৬, পৃ ৪২)।

আধুনিক ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার অনেকটাই মধ্যযুগের সুলতানি ও বাদশাহী শাসন-সম্পর্কিত কয়েকটি বিতর্ককে ঘিরে সৃষ্ট। সে-যুগে সংঘটিত কিছু ঘটনা ও অনুসৃত কিছু নীতি সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা এ-যুগের মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।[৮৫] (গোস্বামী, ২০০৩, পৃ ৩৭)।

এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে প্রদত্ত বক্তব্যটি ভারতের সাম্প্রদায়িকতা বুঝতে আংশিক সাহায্য করে মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১৮৭০-এর পর থেকে আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার ব্যাখ্যা শুধুমাত্র মধ্যযুগ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক বক্তব্যগুলোর মধ্যেই নিহিত আছে তা মনে করবার কারণ নেই। এর সাথে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার : ভারতকে যখন থেকে আধুনিক বলা হচ্ছে অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সাধারণভাবে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বিশেষ করে দেশি ভাষার অগ্রগতি, গদ্য সাহিত্যের (সাংবাদিকতাসহ) বিকাশ হওয়া, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার নির্দিষ্ট অবয়ব গঠন, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধানত হিন্দু ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ, নানা ধরনের ভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা ও জাতি-জাতীয়তার ধারণা থেকে জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় কেন সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত বিকশিত হল এবং তা কেন বৃদ্ধি পেতেই থাকল এবং অদ্যাবধি তা বৃদ্ধিই পেল। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শহরে, বন্দরে, শ্রমিক এলাকায় ও গ্রামীণ জনজীবনে যত বেশি বেশি প্রবেশ করেছে এবং যতই তা পূর্বতন সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ পুরো সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা ও পাশ্চাত্য সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করতে থাকে, ভারতও ক্রমাগত উপনিবেশিক আধুনিক হয়ে উঠে ততই কেন আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল? এর ব্যাখ্যা

আরো গভীর ও জটিল, শুধুমাত্র মধ্যযুগই হল সাম্প্রদায়িকতার উৎস এবং তাকে ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াতেই সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়েছে—এ কনসেপ্ট্ দিয়ে আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধান রয়েছে। কিন্তু এই নিবন্ধে তা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এটুকু অবশ্য বলা চলে : আজ ভারত অর্থনীতি ও উচ্চতর শিক্ষায় পৃথিবীর একটি জনবহুল শক্তিশালী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তৃতি এবং আগ্রাসী চেহারা ভারতের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী জনগোষ্ঠী ও চিন্তাবিদদের পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বাংলা, পাঞ্জাব ও ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে (১৯৪৭), পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়েছে (১৯৭১), কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। বরং ভারত ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল ও জাতিসত্তার স্বাধীনতাস্পৃহাকে নিয়মিত বিপুল সামরিক শক্তি প্রয়োগে কেন্দ্রের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য রেখেছে। এবং এটাও ঠিক এসব কিছুর অন্তরালে শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন ধরনের নকশা কার্যকরী আছে। বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি রামুর যে ঘটনা তা নেহাতেই আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এরকম উদাহরণ আরও রয়েছে। '৪৭-এর মতো '৭১ও প্রত্যাশার বিপরীত মেরুতে। রক্তাক্ত দক্ষিণ এশিয়া ক্রমাগত আরো বেশি বেশি করে রক্তক্ষরণ অভিমুখে। শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হয় সমস্ত দায়; দিশেহারা জীবন ও অতর্কিত মৃত্যু। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বহিরঙ্গের মধ্যে শুধু এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, অন্তর্স্রোত ও মর্মার্থ অনুসন্ধানে পলাশী থেকে শুরু করে আসতেও হতে পারে। তাগিদ দেখা দেবে ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ খতিয়ে দেখার।

আমি ভারত/দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের ঔপনিবেশিক পর্বে বহুল আলোচিত এবং প্রত্যক্ষ উপনিবেশ-উত্তরকালে যেসব বিষয়গুলো নিয়ে অদ্যাবধি বিতর্ক অব্যাহত আছে এবং যা বজায় থাকলে এবং বজায় রাখলে সমসাময়িক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জোরদার করা দুরূহ হবে, তার মধ্যে থেকে মধ্যযুগ ও সাম্প্রদায়িকতা এই দুটি বিষয়কে নমুনা হিসেবে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। বিশেষ করে এই সম্পর্কে অতীতের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নির্মোহ আলোচনা-সমালোচনা করলেই সম্পূর্ণ হবে না বরং যেন বেশি দরকার হয়ে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যে ইতিহাস-দর্শন গড়ে উঠেছে তাকে নির্মমভাবে আঘাত করা। সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতন্ত্র, সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র, দেশীয় ধনিক শ্রেণি, সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস-দর্শনের পাল্টা ইতিহাস-দর্শন গড়ে তোলার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে, আসলে এটি হচ্ছে একটা বড় ধরনের সংগ্রাম ও শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গীগত সমস্যা।

ভুললে চলবে না, দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা আমাদের কম বিপদে ফেলে নি। অনেক সময় একদিকে বেশি নজর অপরিহার্য হয়ে পড়লে অন্যদিকটার গুরুত্ব কখনও এতটাই কমে যায় যে পরে সেটি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র', মূলত একটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি। এ প্রশ্নে আমাদের সুস্পষ্ট ভূমিকা হতে হবে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ। একজন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলেও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন, এই আশঙ্কা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই অনু-অধ্যায়টি শেষ করছি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের একটি ছোট মন্তব্য দিয়ে :

> যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্ত বাংলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রথা নামেই চালু ছিল। সমস্ত ক্ষমতা গুটিকয়েক সরকারি-বেসরকারি ইংরেজের কুক্ষিগত হয়। এঁরা মন্ত্রীদের তোয়াক্কা রাখতেন না। এমন কি এঁদের পরামর্শে লাটসাহেব প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে গ্রেফতার করার হুকুম পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এক সময়ে দেশবন্ধুর সহকর্মী এবং শিষ্য হক সাহেবের প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ শাসন করা। নীতিগত কারণে কংগ্রেস ওঁর বাড়ানো হাত গ্রহণ করে নি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যদি করত তবে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হত না এবং সম্ভবত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যেত না। হক সাহেবই মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন এ কথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তানের অর্থ যে দাঁড়াবে ভারতবিভাগ, তখন জিন্না সাহেবও এমন কথা চিন্তা করেন নি।[৮৬] (রায় চৌধুরী, ২০০৭, পৃ ১২৯)।

৭

কান্ট, হেগেল ও মার্কসের ইতিহাসদর্শনের বিরুদ্ধে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের আক্রমণ

ইমানুয়েল কান্ট, হেগেল এবং মার্কস-এর চিন্তা অনুসরণ করে প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে এ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা বিকশিত হয়েছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। বিদ্যাচর্চার এই ধারা অবলম্বন করে মার্কসবাদীরা প্রচার করেছিলেন ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণা।...সোভিয়েতের পতন-এর সমসাময়িক কাল কিংবা তার কিছুটা আগেই, কান্ট থেকে শুরু হয়ে হেগেল এবং তার উত্তরসূরি কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ কর্তৃক যে ইতিহাসতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, যে তত্ত্বের মূল কথা হল মানুষের সামাজিক ইতিহাসের একটি সাধারণ ধারা আছে এবং সেই সাধারণ ধারা অনুসরণ করে মানবসভ্যতা বিবর্তনের নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়—যাকে বলা যায় ইতিহাসের Grand Discourse বা মহাবাচন—আক্রান্ত হয়েছে সেই মহাবাচনের ধারণাটাই।

ইউরোপীয় তত্ত্বচর্চার এই প্রেক্ষাপটেই, ইমানুয়েল কান্ট, ফ্রেডরিখ হেগেল এবং কার্ল মার্কসকে কেন্দ্র করে ইউরোপের দর্শন-চর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, যে ঐতিহ্যের পিছনে ছিল আলোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেন্ট-এর যুগের ইউরোপের যুক্তিবাদ-নির্ভর জ্ঞানচর্চা, সেই ঐতিহ্যটিকেই বাতিল ঘোষণা করে এমন এক ইতিহাসতত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসা হল, যার মূল কথা হল ইতিহাসে আসলে কোনো মহাবাচন থাকে না। এখানে যা থাকে তা হল খণ্ডবাচন। মহাবাচনের প্রয়োজনও নেই, কারণ আধুনিককালে 'ইতিহাস' এবং 'প্রগতি' উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে। এই আধুনিককাল উত্তর-আধুনিক। এই তত্ত্বের নাম 'উত্তর-আধুনিকতা'।

মার্কসবাদী ইতিহাস তত্ত্ব ভুল, কেননা এই তত্ত্বের ভিত্তি হল Historicism বা ইতিহাসবাদ অর্থাৎ যুক্তিনির্মিত ইতিহাস-তত্ত্ব, যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়ম খোঁজার পদ্ধতি দিয়ে মানবসমাজের বিকাশের নিয়ম খোঁজে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়ম খোঁজার পদ্ধতি কেন সমাজ বিকাশের ধারা আলোচনায় প্রয়োগ করা যায় না, হেগেল এবং মার্কস-বিরোধী কার্ল পপার একটি দীর্ঘ আলোচনায় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পপারের বক্তব্য, সমাজ বিকাশের আসলে এমন কোনো নিয়মই থাকে না যার ভিত্তিতে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়। আমাদের মতে, উত্তর-আধুনিক মতবাদ যখন মহাবাচনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তখন তা কার্ল পপারের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত থাকে যে যুক্তিনির্মিত ইতিহাসতত্ত্বটি ভুল। এই অর্থে উক্ত মতবাদটি কান্ট-হেগেল ও মার্কস রচিত ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ত্বটি ভুল। এই অর্থে উক্ত মতবাদটি কান্ট-হেগেল ও মার্কস রচিত ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ত্বটি নাকচ করে।

কান্ট, হেগেল ও মার্কসের মধ্যে তফাৎ যা-ই থাকুক না কেন, এদের মধ্যে একটি মিলের জায়গাও আছে। তিনজনই একটি মহাবাচনিক ইতিহাসতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনজনই মনে করতেন, ঘটনার ঘনঘটা মানুষের ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া রচনার উপাদান সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের গতি বুঝতে হয় 'essential' বা সার উপাদানের বিকাশের গতিপ্রকৃতি দিয়ে। এই মহাবাচন সার্বজনীন, সর্বত্রই মানবসভ্যতার গতি এই মহাবাচন দিয়ে বর্ণনা করা যায়। মহাবাচনের তত্ত্বটিকে যাঁরা অস্বীকার করেন, সারবত্তার দিক থেকে তাঁরা যুক্তিনির্ভর ইতিহাসতত্ত্বের এই ধারা—যা গত আড়াইশ' বছর ধরে গড়ে উঠেছে সেটিকেই নাকচ করেন। উত্তর-আধুনিক দর্শন মহাবাচনিক ইতিহাসে বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদীরা যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন, তা তাঁদের অপছন্দ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অবশ্য মার্কসবাদ-বিরোধী সমস্ত তাত্ত্বিকরাই নাকচ করেন।

মার্কসবাদের অন্যান্য সমালোচনার তুলনায় এই উত্তর-আধুনিক সমালোচনা অনেক বেশি রক্ষণশীল, এই মতবাদ আসলে প্রগতিবিরোধী, প্রাক্-আলোকপ্রাপ্তির

যুগের মতবাদ, যদিও তার সর্বাঙ্গে জড়ানো আছে আধুনিক পোশাক। তাঁদের খণ্ডবাচনের তত্ত্ব আসলে বিদ্যমান সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক। প্রাক-আলোকপ্রাপ্তির যুগের মতবাদের সাহায্যে বিদ্যমান সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সবচেয়ে কার্যকরী দার্শনিক হাতিয়ারের নাম হল উত্তর-আধুনিকতা।

আসলে ইতিহাসের কোনো তত্ত্ব হয় না। আধুনিক যুগে এই বক্তব্যটি বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত করেন কার্ল পপার (Poverty of Historicism)। পপার ছিলেন মার্কস-বিরোধী, হেগেল সম্পর্কেও তাঁর অশ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ইতিহাসতত্ত্বের বিরোধিতা করে তিনি যে যুগপৎ মার্কস এবং হেগেলের তত্ত্ব-কাঠামো দু'টিকেই আক্রমণ করছেন, এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। পপারের মতে ইতিহাসের কোনো তত্ত্ব হয় না যা দিয়ে ইতিহাসের বিকাশের একটি সাধারণ গতিপথ আবিষ্কার করা যায়, কারণ ইতিহাসের কোনো সাধারণ নিয়ম থাকে না। তত্ত্বটির বংশগত উৎস খোঁজা যায় প্রাক্-এনলাইটেনমেন্টে, যখন সমাজ ও প্রগতি নিয়ে মানুষের কোনো দর্শন ছিল না, অর্থাৎ সেই মধ্যযুগে। তত্ত্বটিকে তাই বলা যায়, উত্তর-আধুনিক নয়, প্রাক্-আধুনিক।[৮৭] (খাসনবিশ, ২০০৭, পৃ ৪৭-৫৮)।

উপরে খাসনবিশ আধুনিকতাবাদীদের মূল দর্শন হিসেবে গণ্য করেছেন প্রাক-আধুনিকতাকে। উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা আধুনিকতা'কে অস্বীকার করতে গিয়ে প্রাক-পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু এদের উদ্ভব হয়েছে ইতিহাসের এমন একটি পর্বে যা ঐ পর্বেরই একটি বিশেষ লক্ষণ হিসেবেই প্রথমে গণ্য করা দরকার। সমকালীন পুঁজিবাদের ভয়াবহ নৈরাজ্যিক অবস্থাজাত একটি অস্থির পৃথিবী যার সমালোচনা করতে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা বাধ্য হয়েছে কিন্তু পুঁজিবাদের পাল্টা কোনো সমাজব্যবস্থার প্রস্তাব করতে তারা রাজি নন। এটা তাদের কাছে পরিষ্কার, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে কান্ট, হেগেল ও মার্কসের মহাবাচনিক ইতিহাসতত্ত্বের কাছে নত হতে হবে। এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ফলে ইতিহাস-বিরোধিতা ও মার্কসবাদ-বিরোধিতা উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের কাছে সমার্থক।

আসলে ইতিহাস অবলুপ্তির, বিখণ্ডতার, অন্যতার, বিক্ষিপ্ততার, অনিষ্পন্নতার এই আপাত-বিচ্ছিন্ন উত্তরাধুনিক categoryগুলোকে একসূত্রে গাঁথলে যে অখণ্ডতাটা পাওয়া যায় সেটা হলো পুঁজির পরিব্যাপ্ত বাস্তবের (আখ্যান নয়) সামনে উত্তরাধুনিকতার নতজানু সমর্পণ এবং পুঁজির নিজস্ব dynamic-কে যাথার্থ্য দেওয়ার নিঃশর্ত হলফনামা।[৮৮] (জলধর গুপ্ত, ২০০৭, পৃ ৬৮-৮৭)।

বিষয়টি অত্যন্ত বড় জেনেও শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অতিসংক্ষিপ্তভাবে এই নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থনির্দেল

১. বদরুদ্দীন উমর, 'আমাদের গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্কট এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি', *সংস্কৃতি*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ ৪৫-৪৬

২. জে বি এস হ্যালডেন, *বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন*, ১৯৮৬ চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ ১

৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রজা ও তন্ত্র, ২০০৫, *অনুষ্টুপ*, কলকাতা, পৃ ৫৭, ৬৩

৪. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ ২৩২

৫ক, খ Bernard S. Cohn, *An Anthropologist among the Historians and Other Essays*, 1996, Oxford, India, p 1

৬. Daniel Lord Smail, *On Deep History and the Brain,* University of California Berkeley, 2008

৭. বিপানচন্দ্র, *আধুনিক ভারত: ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ*, ১৯৮৭, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৬

৮. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, 1992, Penguin Books, England, p xi

৯. Asim Roy ed, *Islam in History and Polities, Perspectives from South Asia*, 2006, Oxford, India, p 3

১০. Fukuyama, *ibid*, p 58-65

১১. Marx, Marx-Engels, *SW*, vol-1, 1973, p 477

১২. *ibid* p 15

১৩. *ibid* 504-505

১৪. *মার্কস-এঙ্গেলস, রচনা সংকলন* (৪ খণ্ড), দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃ ৪১

১৫. Marx, Marx-Engels, *CW*, vol-3, 1975, Moscow, p 56

১৬. Karl Marx-Capital, Vol-1, Penguin Books, 1990, pp-915-916
সহায়ক গ্রন্থ : মার্কস, পুঁজি, খণ্ড-১, অংশ-২, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮, পৃ ৩১০
মার্কস, *ক্যাপিটাল*, দ্বিতীয় খণ্ড (৬ খণ্ড), বানী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ৪৫৭

১৭. Fukuyama-*ibid,* p 153

১৮. নূর মোহাম্মদ, মার্কস-এঙ্গেলস : যোদ্ধা ও সংগঠক (১৮৪৩-১৮৫২), সংস্কৃতি, মার্চ ১৯৯৬, পৃ ১২

১৯. Marx-Engels, *SW* vol. 1, 1973, Moscow, p 398

২০. Fukuyama-ibid, p 44

২১. Marx, *Marx-Engels, C W.* vol. v, 1976, Moscow, p 208

২২. H. J. Laski, *The Rise of European Liberalism*, 2005, AAKAR Books, India, p 33

২৩. *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড-২, ১৯৮৭, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ ২২৮-২৪৪

২৪. ড. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, রুশো থেকে সমকাল*, ২০০৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ ৭৪-৭৫

২৫. Leo Strauss and Joseph Cropsey, ed- *History of Political Philosopy*, The University of Chicago Press, Chicago and London. p 603

২৬. ibid, 1987, p 610
২৭. *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড-২, ১৯৮৭, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ ২৩৯, ২৪৩-৪৪
২৮. এঙ্গেলস, *মার্কস-এঙ্গেলস, রচনা সংকলন*, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, ১৯৭২, মস্কো, পৃ ৪৪, ৪৫, ৪৬
২৯. ঐ, পৃ ৪৬-৪৭
৩০. Leo Strauss and Joseph Cropsey-eds; pp754, 755
৩১. *মার্কস-এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ ১৮৬
৩২. *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড-২, ১৯৮৭, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ ২৬৬-৬৭
৩৩. *Marx-Engels, SW*. vol.1, 1973, Moscow, pp 396-397
৩৪. ibid, p 400
৩৫. Fernand Braudel, *A History of Civilizations*, Penguin Books, USA, 1993, P xxxvi, xxxvi
৩৬. তরফদার, পূর্বোক্ত পৃ ২২৯
৩৭. ড. এস, দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, প্রতীক, ঢাকা, ২০০২, পৃ ৩, ৫
৩৮. আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল*, মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ ৯৪
৩৯. সলিমুল্লাহ খান সত্য, *সাদ্দাম হোসেন ও স্রাজেরদ্দৌলা*, এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতিসভা, ঢাকা, ২০০৭, (ইতিহাস কারখানা-১)
৪০. ঐ, *আদমবোমা*, আগামী প্রকাশনী ঢাকা, ২০০৯ (ইতিহাস কারখানা-২), প্রবন্ধ সংকলন দুটির সম্পাদক : আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান
৪১. অমর্ত্য সেন, *ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে*, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ১, ৫, ৬
৪২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (প্রথম খণ্ড), সুবর্ণ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ ৭, ৮
৪৩. অশীন দাশগুপ্ত, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ ৩৯, সম্পাদনা : উমা দাসগুপ্ত
৪৪. দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি, *ভারত ইতিহাস চর্চার ভূমিকা*, ২০০২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, পৃ xi।
৪৫. Amiya Kumar Bagchi, *Perilous Passage*, Oxford University Press, India, 2006, p xiii
৪৬. ই এইচ কার, *কাকে বলে ইতিহাস*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ২৫। সম্পাদনা : আর ডবলিউ ডেভিস
৪৭. Eric Hobsbawm, *On History*, Abacus, London, 1999, p 32
৪৮. তরফদার, *ইতিহাসের দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৬, ৭
৪৯. Engels, *Marx-Engels, SW*, vol. 1, Moscow, 1973, p 396
৫০. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন-কোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ ২১২-২১৩
৫১. *Dictionary of Philosophy*, 1984, Progress Publishers, Moscow, P 324, ed. 1. Frolov

৫২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০১, ভূমিকা, *কালের কল্লোল* (পূর্বোক্ত)
৫৩. হীরেন মুখার্জী, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ ২১ (ভূমিকা)
৫৪. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতের বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজগঠন* (অনুবাদ, গৌতম নিয়োগী), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ১৩-১৭
৫৫. নীহাররঞ্জন রায়, *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*, ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৪-২৬
৫৬. অশীন দাসগুপ্ত, ঐ, পৃ ১৭, ২১, ২২
৫৭. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, প্রথম খণ্ড, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ ৬৭, ৬৯, অনুবাদ: গোলাম সামদানী কোরায়শী
৫৮. এঙ্গেলস, *মার্কস-এঙ্গেলস–রচনা সংকলন*, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, মস্কো, পৃ ৭৫
৫৯. মার্কস, *মার্কস-এঙ্গেলস–রচনা সংকলন*, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, ১৯৭১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ ২৫
৬০. এঙ্গেলস, ঐ, ১৯৭, পৃ ৩১, ৩২, ৩৬
৬১. সুনীতিকুমার ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, নিউ হরাইজন বুকট্রাস্ট, কলিকাতা, ২০০১, মুখবন্ধ
৬২. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, *উপন্যাসে অতীত; ইতিহাস ও কল্পইতিহাস*, থীমা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ২৩
৬৩. নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাস চর্চা*, কৃষ্টি, কলকাতা, ২০০১, পৃ ৩৪, ৩৫
৬৪. মীনাক্ষী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯, ৪০
৬৫. কালিকারঞ্জন কানুনগো, *রাজস্থান-কাহিনী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ ২
৬৬. অশীন দাসগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩, ২৪, ২৫
৬৭. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ এগারো
৬৮. অঞ্জন গোস্বামী, ২০০৩, *ইতিহাস চর্চা : বিষয়, সাম্প্রদায়িকতা*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ ৩০, ৩১
৬৯. রাজকুমার চক্রবর্তী, *ইতিহাস চর্চা, নির্মাণ বিনির্মাণ বিকৃতি, এবং মুশায়েরা*, কলকাতা, ২০১০, পৃ ৭৩
৭০. মুশিরুল হাসান, 'দি মিথ অব ইউনিটি, কলোনিয়াল অ্যান্ড ন্যাশনাল ন্যারেটিভস'—ডেভিড লাডেন সম্পাদিত *মেকিং ইন্ডিয়া হিন্দু* গ্রন্থে সংকলিত ২০০৭-পুনর্মুদ্রণ, পৃ ১৮৫-২০৮, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, নিউ দিল্লী
৭১. যদুনাথ সরকার, *The History of Bengal*, vol. II, Dacca University, ১৯৭৬, পৃ ৪৯৭, ৪৯৮
৭২. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ১৫৯
৭৩. বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (অনুবাদ : ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়), ২০০০, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ ২৯
৭৪. ঐ, পৃ ৮৬
৭৫. সুনীতিকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯
৭৬. গৌতম নিয়োগী, *ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা*, ১৯৯১, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, পৃ ১

৭৭. ঐ, পৃ ২৯
৭৮. রমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্র, *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা*, ১৯৭৬, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, পৃ ৫৩
৭৯. *গুজরাত নরমেধযজ্ঞ* : সংকলন ও সম্পাদনা, রুদ্রদেব মিত্র, ২০০২, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ ১০
৮০. বিপানচন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*, ১৯৮৯, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ ১৪৬
৮১. রমিলা থাপার, *এবং অন্যান্য*, ১৯৭৬ পূর্বোক্ত, পৃ ১৭, ২৭, ২৮
৮২. বিপান, *এবং অন্যান্য*, ১৯৭৬, পূর্বোক্ত, পৃ ৭১
৮৩. ঐ পৃ ৭৭
৮৪. হরবংশ মুখিয়া, ঐ, পৃ ৪২
৮৫. অঞ্জন গোস্বামী, ঐ, পৃ ৩৭
৮৬. তপন রায় চৌধুরী, *বাঙালনামা*, ২০০৮,আনন্দ, কলকাতা, পৃ ১২৯
৮৭. রতন খাসনবিশ, *কালান্তরের পৃথিবী, এবং মুশায়েরা*, কলকাতা, ২০০৭, পৃ ৪৭-৫৮
৮৮. জলধর গুপ্ত, *এবং জলার্ক*, কলকাতা, ২০০৭, পৃ ৬৭-৬৮

সিভিল সোসাইটি
পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি বিকাশ ও আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে শ্রদ্ধাভাজন কমরেড বদরুদ্দীন উমরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংস্কৃতি' তে 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সিভিল সোসাইটি ও এর এনজিও ভাষ্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালের মাঝামাঝি কারো কারো তাগিদে ও নিজের কিছুটা ইচ্ছে হয় প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারে ছেপে দেবার জন্যে। নভেম্বর মাসেই ১৯৯৮-২০০৬ পর্যন্ত সিভিল সোসাইটির সংগঠনগত বিকাশ ও এর উপর লেখালেখির কিছুটা ফিরিস্তি দিয়ে একটা ভূমিকা লিখে ফেলি। এর পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রকাশনার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৮ সালে যেমন মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন ছাড়া অধিকাংশের কাছেই বাংলাদেশে বা বিশ্বব্যাপী তো বটেই সিভিল সোসাইটির সম্ভাব্য ভূমিকা কি হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে খুব খুব সামান্যই ধারণা ছিল বলে তখন মনে হয়েছিল। যেমন এখন বাংলাদেশে সব ধরনের মিডিয়া বারংবার নাগরিক সমাজ/সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে জ্যান্ত বার্তা পৌঁছে দিলেও তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াগতভাবে কী চরিত্রে চলমান তা মনে হয় খুব একটা পরিষ্কার হয় নি। হওয়া খুবই দরকার। এক্ষেত্রে পুস্তিকাটি সামান্য ভূমিকাও পালন করতে পারবে কি না জানিনে, তবে পারলে ভালো—এই আরকি! বিভিন্ন উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদের ব্যাপারে ড. সলিমুল্লাহ খান পুরো কাজটিই করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য।

প্রস্তাবনা

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় 'সিভিল সোসাইট' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ২৪শে জুলাই ১৯৯৭, এনজিওদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সিভিল সোসাইটি ফোরামের দ্বিতীয় সম্মেলনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, ১৯৯৬'র কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেন মূলত বাংলাদেশের এনজিওদেরকেই এখনকার সিভিল সোসাইটির মূল শক্তি ও প্রেরণা বলে অভিহিত করে তাদের কাজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ও রাষ্ট্রের এলাকাসহ সমাজের

সর্বক্ষেত্রে আরও বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে বর্ণিত সম্মেলন ও এনজিওদের অন্যতম প্রধান সংগঠক ফ. র. মাহমুদ হাসান দাবি করেন এনজিও+ঢাকা ও প্রধান জেলা শহরগুলির নাগরিক সংগঠন+দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ = সিভিল সোসাইটি।

সম্মেলনের পর পরই প্রধানত রাষ্ট্রপতির ভাষণকে কেন্দ্র করে কয়েকমাস ধরে 'ভোরের কাগজে' বিতর্ক চলতে থাকে। তবে ফ. র. মাহমুদ হাসান ও ফরহাদ মজহারের লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর সংগত কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে এ বিষয়ে বক্তব্য হাজির করা। যদিও মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে আরও আগেই আলোচনা-পর্যালোচনা ও লেখালেখির শুরু করার দরকার ছিল, কেননা বিশ্বব্যাপী ততদিনে বিষয়টি শুধু বহুল আলোচিতই নয়—দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সিভিল সোসাইটি আন্দোলনের ক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত হয়েই চলছিল—সংগঠনগত শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আমি জানি আমি কি লিখেছিলাম। কিন্তু আট বছর হয়ে গেল লেখাটি সম্পর্কে প্রায় কেউই কোন আগ্রহ দেখাননি; লেখাটি কবরে চলে গেছে বলে ধারণা করি। এ নিয়ে আরো লেখার ইচ্ছে থাকলেও তা উবে যায়।

তবে পুরনো অভ্যাসমত শুধু বাংলাদেশেরই নয়—বিশ্বব্যাপী সিভিল সোসাইটি আন্দোলন ও এনজিওদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত থাকার চেষ্টা করি।

১৯৯৮ সাল নাগাদ বিশ্ব পরিসরে সিভিল সোসাইটি আন্দোলন একটা বিশেষ পর্বে প্রবেশ করেছিল। বাংলাদেশে ঐ সময়কালেই আন্দোলনটি সংগঠিত হতে থাকে। বর্তমান বিশ্ব পরিসরে সিভিল সোসাইটি আন্দোলনের ব্যাপকতা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস, স্ট্যানফোর্ড ইউ-নিভার্সিটি, জন হপকিন্স, ওয়ারউইকসহ বিশ্বের আরো অনেক খ্যাতনামা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। শত শত গবেষণামূলক পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জার্নালে নিয়মিত অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সাথে সাথে ব্রেটন উড প্রতিষ্ঠান (বিশ্বব্যংক, আইএমএফ ইত্যাদি)সহ এডিবি, ইউএসএইড, ফোর্ড ফাউন্ডেশন এর মতো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সাহায্য ও সুপরিকল্পিত সহযোগিতার সাথে জাতিসংঘের মতো প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সহ-য়তায় দেশে দেশে ক্রমাগত আরো বেশি বেশি সংগঠিত, প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের পক্ষে এই সিভিল সোসাইটি প্রকল্প এখন প্রায় দৈত্যাকারে আবির্ভূত হয়েছে। কোন অবস্থাতেই এর সর্বগ্রাসী বহুমুখী অভিযান থেকে যে কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই নিরপেক্ষ থাকতে পারবে

না। স্মর্তব্য, এনজিও ও এই ধরনের আরো সব সংগঠন সিভিল সোসাইটিকে নেতা সংগঠনের মান্যতা দিয়েছে। যদিও এনজিও সংগঠনসমূহ বলতে ঠিক কোন কোন ধরনের সংগঠন বোঝাবে বা সিভিল সোসাইটি সংগঠন বলতে ঠিক কোন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংগঠন বোঝাবে তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, শ্রেণি, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানবিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সম্প্রদায়, নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ; রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, সরকার ও রাষ্ট্রের প্রশ্নেঃ মানবাধিকার, জবাবদিহিতা, সুশাসন, ট্রান্সপারেন্সি (স্বচ্ছতা), দুর্নীতি নির্মূল, আইনের শাসন, সংবিধান, সুষ্ঠু নির্বাচন, যোগ্যপ্রার্থী প্রশ্ন, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সাক্ষরতা ও সকলের শিক্ষার অধিকার, সর্বজনীন ও প্রাথমিক শিক্ষা, কথিত দাতাগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক, বৈদেশিক সাহায্য (ঋণ ও অনুদানসহ) এবং বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তদের ঋণ পাওয়ার অধিকার প্রশ্ন, ঋণ বিতরণ, জেন্ডার সমস্যা, শিশু শ্রম, বয়স্ক সমস্যা, যৌনকর্মীদের অধিকার, নারী শিশু পাচার, মাদক, বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা, সমুদ্র-নদী-বন পাহাড় ও পরিবেশ, বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি, বাঁধ, জলাবদ্ধতা, এইচআইভি, এইডস, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শিশুমৃত্যু, মাতৃস্বাস্থ্য, বস্তি ও বস্তি উচ্ছেদ, দলিত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, বর্জ্য, বেকার, কথিত অদিবাসী সমস্যা, শিল্প ও কৃষি (সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ, কৃষি শ্রমিক ইত্যাদি সমস্যাসহ), মৎস্য ও পশু পালন, নৃতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব ধর্ম-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ভাষা ও সংস্কৃতি, মিডিয়া ও ইনফরমেশন টেক, যোগাযোগ, বিয়ে, সন্তান, জন্মনিরোধ, স্বাস্থ্যসেবা (স্যানিটেশনসহ)-ঔষধ নীতি ইত্যাদি সমস্যাসহ যুদ্ধ ও শান্তি, উত্তর-দক্ষিণ, বিশ্ব বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, স্থানীয়, জাতীয় ও বিশ্ব পরিসরে নানা চরিত্রের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-সমঝোতা, অস্ত্র (সব ধরনের মাইনসহ), পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, জাতি, বর্ণ, গোত্র সমস্যা—মোট কথা বিশ্বের প্রতিটি সমস্যার (মূলত প্রাণ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত) যথাযথ সমাধানে এনজিও ও সিভিল সোসাইটি এমনভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সংগঠিত হতে পারছে যেন তারাই সৃষ্টি করে চলেছে এক নতুন যুগের। এ যুগ হবে এনজিও ও সিভিল সোসাইটির যুগ। ফলে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের নতুন নতুন প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দাবি করা হয়েছে সিভিল সোসাইটি হল তৃতীয় শক্তি (Third Force)

বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির প্রবক্তরা বলেছেন, এনজিওরা হলো the major arm of civil society in Bangladesh.[১] এবং the work of non-govt. development of organizations do is by defination the sector of civil society.[২] তাছাড়া Non-State Actors হিসেবে বলা হয়েছে, "Non-State Actors; like civil society corporate bodies, community based organization, NGOs, community of students ..."[৩]

এসব সমাজতন্ত্রের সাময়িক পিছু হটা ও বিশ্বায়নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সিভিল সোসাইটি ও গ্লোবাল ফাইনান্স এখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। (উপরোক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

২

এরকম একটা অবস্থায় মনে হল সেই আগের লেখাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করি। এবার অবশ্য কেউ কেউ আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার; civil society-র বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধে উদ্দেশ্যমূলক অনুবাদ 'সুশীল সমাজ'-এর বিরোধিতা করা হয়েছে। তথ্য নির্দেশে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। Civil-এর প্রকৃত অর্থ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 'burger'-এর উদ্ভবের মধ্যেই খুঁজতে হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দর্শন এর যে ইতিহাস তার ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করে এই অনুবাদটি করা সমীচীন মনে করেছি। প্রবন্ধে 'নাগরিক সমাজ'কেই যথার্থ অনুবাদ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে সিভিল সোসাইটি এখন তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই তৃতীয় অধ্যায়ের সিভিল সোসাইটি আন্দোলন এমন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা ও দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করেছে যার বিস্তৃত বিবরণ একান্তই কাম্য। অথচ ভূমিকার এই অংশে কিছুটা ইঙ্গিত বা অতি সংক্ষিপ্ত খাপছাড়া কিছু চিত্র তুলে ধরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৯৮ সালের প্রবন্ধে খুবই ছোট একটা ভূমিকা ছিল। যেখানে বলা হয়েছিল:

"প্রথমত, সাম্প্রতিককালে পূর্বইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা সিভিল সোসাইটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পশ্চিমে বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত রাষ্ট্রের ভূমিকা, নাগরিকত্ব, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইস্যুগুলোতে 'সিভিল সোসাইটি' ধারণাটির নতুন অর্থ প্রদানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। ধারাবাহিক আলোচনা চললে পুরোটা বোঝা যাবে।"

এই প্রত্যাশা যে পূরণ হয় নি তা আগেই বলেছি।

যা হোক নতুন পর্যায়ে এই যে সিভিল সোসাইটি আন্দোলন তার সময়কাল নিয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে তেমন কোন মতপার্থক্য দেখা যায় না। সকলেই মোটামুটি ধরে নিয়েছেন এই অধ্যায়ের শুরু ৮০'র দশক থেকে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে ১৯৮০-৮৯ পোলান্ডে সলিডারিটি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আজকের সিভিল সোসাইটির 'পুনরাগমন'—কারো কারো মতে 'পুনরাবিষ্কার'। বাংলাদেশে

এর ব্যবহার হয়েছে 'Come back', 'Return'।[৪]

এর বিকাশ দ্রুত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় থেকে। সোজা কথায়, এমনভাবেও বলা যায় পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং বর্তমান বিশ্বায়নের উগ্রযাত্রা থেকে সিভিল সোসাইটি পরিণত হয়েছে সিভিল সোসাইটি সংগঠনে অর্থাৎ ইংরেজিতে ব্যাপারটা দাঁড়ায় instead of civil society–civil society organizations বা সংক্ষেপে CSOs। এখানে 'তৃতীয় অধ্যায়' কেন বলা হলো তার একটা ব্যাখ্যা এমনভাবেও দেয়া যেতে পারে :

প্রথমত ধ্রুপদী দার্শনিকদের সময়; সিসেরো, সেন্ট অগস্টাইন ইত্যাদি; দ্বিতীয়ত হবস্ থেকে হেগেল ও মার্কস-এঙ্গেলস এর সময় পর্যন্ত অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্মেষকাল থেকে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত; তৃতীয়ত পোলান্ডে সলিডারিটি আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও বিশ্বায়নের অগ্রযাত্রা থেকে।

তবে এখন দেখা যাচ্ছে, সলিডারিটি থেকে সিয়াটল এবং সিয়াটল থেকে সিভিল সোসাইটির সাথে বিশ্বব্যাংকের বিকশিত সম্পর্কের সর্বশেষ প্রতিবেদন (২০০৬) পর্যন্ত (এই পর্যায়ের) সিভিল সোসাইটি আন্দোলনকেও কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা যাবে।

যদিও 'নেটওয়ার্ক' সিভিল সোসাইটি আলোচনার প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে তবুও আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের পর ঐ ধরনের দেশে সরকার, সুশাসন, উন্নয়ন, মানবাধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা কি হবে সে প্রসঙ্গে কেউ কোনো আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া বৈশ্বিক লগ্নি-পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের সামরিক আগ্রাসনের অধীনস্থ দেশগুলিতে সিভিল সোসাইটির কার্যক্রমের কোনো সমালোচনামূলক লেখালেখি ও মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত আমি দেখিনি।

একথা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই হলো সিভিল সোসাইটির ভিত্তি ও ক্ষেত্র। ফলে অর্থনীতির প্রসঙ্গটি ঘুরে ফিরে কেন্দ্রে চলে আসতে বাধ্য।

আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার: তা হল গ্রামশি ও পরবর্তীতে হাবারমাস প্রসঙ্গ। গ্রামশির রচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রকাশ হতে থাকলেও মূলতঃ ইংরেজিতে *Selections from Prison Notebooks* প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পর তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন ও বহুল আলোচিত হন। সিভিল সোসাইটিকে তিনি মার্কস থেকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামশিকে নিয়ে পশ্চিমা মহলে আলোচনা যখন বেশ জমজমাট সেই সময়কালে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের পণ্ডিতরাও নির্দিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন। হাবারমাস ৫০-এর দশকে এই স্কুলে যোগদান করেন। হাবারমাসকে বলা হয়ে থাকে এই ধারার শেষ মহীরুহ। বিভিন্ন গবেষকরা এদের দু'জনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তৃতীয়

অধ্যায়ের সিভিল সোসাইটির আলোচনাতে সম্পর্কিত করেছেন।

লক্ষণীয় তা হল প্রথম অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সময়কালের পার্থক্য অনেক বেশী। যেমন সিসেরো ১০৬-৪৩ খৃস্ট পূর্বাব্দ এবং হবস্ ১৫৫৮-১৬৭৯। হেগেলের 'আইনের অধিকার' প্রকাশিত হয় ১৮২০-এ এবং হেগেলের সমালোচনা করে মার্কস এর বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হন ১৮৪৩ সালে। গ্রামশি'র প্রিজন নোটবুকস্ প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ১৯৭১ এ আর হাবারমাসের *The theory of Communicative Action* ১৯৮৭-তে ও *The Structural Transfomation of the Public Sphere* ১৯৮৯-তে প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ হবস্ থেকে হাবারমাস পর্যন্ত—ইউরোপের প্রায় এই সাড়ে তিনশ বছর কমবেশি পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর (CMP) সময়কালের মধ্যেই পড়ে। আমরা এই পর্বের সারাংশের প্রবণতা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি : (ক) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় রেখে পুঁজিবাদের ক্রিটিক হওয়ার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। যেমন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে সাথে সাথে আলোচনা সমালোচনার বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যা বিবেচ্য : পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তথা বর্তমান কথিত বিশ্বায়নের কাঠামোর মধ্যে থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার আলোচনা-পর্যালোচনা সমালোচনা এমনকি কঠোর সমালোচনা থেকে মিছিল-সমাবেশ করা ও আরও এমনকি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে যাওয়া; (খ) পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও দালালদের উৎখাত করা।

বিভিন্ন লেখক অবশ্য এডাম ফার্গুসন, এডাম স্মিথসহ আরো অনেক রাজনৈতিক দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য শাখার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতামতকেও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় সম্পৃক্ত করেছেন।

বর্তমানে সিভিল সোসাইটির সংজ্ঞা ও কাজের পরিধি সম্পর্কে আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, দুটি বিষয় নিয়ে কোন ঐকমত্য (Consensus) নেই। কেউ কেউ মনে করেন ভবিষ্যতেও এর কোন সম্ভাবনা নেই। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, London School of Economics, USAID, Ford Foundation, UN, World Bank, IMF, ইত্যাদি এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গবেষকরা (প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকসহ) কিন্তু যেমন সংজ্ঞা (defiration) তেমনি কাজের পরিধি/কর্মক্ষেত্রের প্রধান প্রধান দিক—এসব নিয়ে মতামত দিয়েই চলেছেন। এসব পরীক্ষা করলে দেখা যায় ভিন্নতা থাকলেও ঐকমত্যের উপাদান বরং বেশি (mainstream conception of civil society) তাছাড়াও যা ক্রমাগত লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তা হল CSOs, ICSOs, NGOs, INGOs সাথে Global finance (গ্লোবাল ফাইন্যান্স) এর সাথে দ্রুত আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। WTO/বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্পর্কের যে টানাপোড়েন (বিক্ষোভ থেকে সংঘর্ষ পর্যন্ত যার প্রকাশ—সিয়াটল এই সংঘর্ষের প্রধান প্রতীকে পরিণত হয়েছে) বা MNC, TNC দেশে দেশে যেসব কার্যক্রম চালাচ্ছে (যা প্রধানত

পরিবেশ ও জনজীবনের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে) তার বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সমঝোতা বৃদ্ধির বিষয়টিও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসছে। রাষ্ট্রের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে সিভিল সোসাইটিকে হাজির করার চেষ্টা চললেও কার্যত পুঁজিবাদী অর্থনীতির চলাচলকে যেমন অবাধ তেমনি দৃশ্যতঃ একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে কথিত গণতন্ত্রীকরণ (democratizaliow) প্রক্রিয়াতেই সিভিল সোসাইটি সংগঠনকে কাজে লাগানোর কর্মনীতি নিয়ে বোধ হয় এদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

তৃতীয় পর্যায়ে সিভিল সোসাইটির সংজ্ঞা, কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি নিয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের সামান্য কিছু মতামত নিচে দিয়ে দেয়া হল :

By Civil Society, we understand, very broadly, the social domain, small or large, which lies between restrictive enclosures of family, kinship and the like of one side and the coercive powers of the state on the other.[৫]

[সিভিল সোসাইটি বলতে আমরা মোটা দাগে ছোট হোক বড় হোক সমাজের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাটাই বুঝি। এই এলাকার এক সীমায় পরিবার, আত্মীয়-পরিজন ও সেই জাতীয় ঘেরাটোপ, আর অন্যসীমায় রাষ্ট্র শক্তির জবরদস্তিমূলক ক্ষমতাবলয়।]

Civil society is, simply, the associational activity of people outside their families, friends and work places that is not profit making purposes (the private sector) nor for governing (the government, or public sector). Association means the voluntary coming together of people to pursue their own interest or wishes either physical coming together for common activities or a more spasmodic or remote form of association. What is important is that people feel that they belong.[৬]

[সিভিল সোসাইটি মানে পরিবার, বন্ধুবান্ধব আর কর্মস্থলের বাইরে মানুষ জনের সংঘবদ্ধ কর্মকাণ্ড। এই সব কর্ম মুনাফাধর্মী (বা ব্যবসাবাণিজ্য নির্ভর) নয়, আবার নয় প্রশাসনধর্মীও (সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান নির্ভর)। সংঘ শব্দের অর্থ মানুষের একত্র অবস্থান, উদ্দেশ্য: স্ব স্ব স্বার্থ বা কামনাবাসনা পূরণ। একত্র অবস্থান মানে গায়েগতরে একত্র হওয়া হতে পারে আবার সাময়িক দেখা সাক্ষাতের মতো সভাসমিতিও হতে পারে আবার হতে পারে। একেবারে দূরদূরান্ত থেকে যোগাযোগ ও অভিন্ন কর্মকাণ্ডে সামিল হওয়াটাই আসল।]

Civil society comprises organizations (that may not have legal recogniation) and less tangible institutions such as neighborliness, clan loyalty, or the tradition of free speech. CSOs include interest groups (ranging from cultural and sports societies to gangs and crime syndicates), churches and other religious organizations professional associations, trade unions, mass organizations and social movements (such as

peasants associations, or feminist movements), pressure groups and NGO's of various kind.[৭]

[পাড়াপ্রতিবেশীর সদ্ভাব, নীরব আনুগত্য কিংবা আওয়াজ করার অধিকার—এই রকম যে সব ব্যবস্থা খালি চোখে তেমন একটা ধরা পড়ে না তেমনি প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানযোগে সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠে (এ সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিধিগত স্বীকৃতি নাও থাকতে পারে)। সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি তালিকায় আছে বিবিধ কায়েমিস্বার্থ (একদিকে সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া-চক্র থেকে আর একদিকে সংঘবদ্ধ অপরাধী দল ও অপরাধ সংঘ), আছে ধর্মগোষ্ঠী, নানা প্রকার ধর্মীয় সংগঠন, পেশাভিত্তিক সমিতি, শ্রমিক সংগঠন, গণসংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলন (যথা: কৃষক সমিতি বা নারী আন্দোলন) মতলববাজ চক্র বা নানান কিসিমের বেসরকারি সংস্থা।]

An important function of civil society is...providing a nucleus of independent political activity, hence, the term grew in prominence during the popular struggle against East European authoritarianism and the eventual fall of the Berlin wall.[৮]

[দলবহির্ভূত রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ভ্রূণকোষ হিসেবে কাজ করা ও সিভিল সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতার তালিকায় পড়ে।]

A strong civil society provides the means by which interest of citizens are represented in relation to the state and market.[৯]

[রাষ্ট্র এবং বাজারের সামনে নাগরিক স্বার্থ প্রকাশ করার হাতিয়ার শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি।]

Civil society then, is a market place, but it is also the result of market failure.[১০]

[তা হলে দেখা যাচ্ছে, সিভিল সোসাইটি মানে বাজার। তবে মনে রাখতে হবে এ বাজার সে বাজারের ব্যর্থতার ফসলও।]

Civil society as I used the term and still do, is an ideal-typical category (an idealtype in sense of Max Weber) that both describes and envisages a complex and dynamic ensemble of legally protected non-govenmental institutions that tend to be non-violent, self-organizing, self-reflexive, and permanently intension with each other and with the state institutions that 'frame' constrict and enable their activities.[১১]

[সিভিল সোসাইটি কথাটি আমি নমুনা বা গদ আকারে ব্যবহার করেছি এবং এখনও করছি (নমুনা—গদ কথাটা এই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন ম্যাকস-ভেবার)। এর কাজ দুই প্রকার। একদিকে বিবরণ দেয়া অন্যদিকে গড়ে তোলা।

আইনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি সংগঠনের সাথে অনুরূপ অন্যান্য সংগঠনের এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর টানাটানি এর বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আকার ঠিক করে আর আয়তন আরোপ করে তাদের কাজকর্মের সুযোগ করে দেয়। আর এই সংগঠনগুলিও হয় শান্তি-পথিক, স্বকীয় শক্তিভিত্তিক এবং স্ব স্ব বিচারনিষ্ঠ।

Where there are no markets, civil societies find it impossible to survive, But the converse rule also applies:where there is no civil society, there can be no markets.[১২]

[যে দেশে বাজার ব্যবস্থা অচল সে দেশে সিভিল সোসাইটি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। উল্টাবিধিও সমান সত্য: যে দেশে সিভিল সোসাইটি নাই সে দেশে বাজার খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়।]

Civil society is understood in the present context as a political space where voluntary associations seek deliberately to shape policies, norms and deeper social structures.[১৩]

[স্বেচ্ছায় গঠিত নানান সমিতি যেখানে পরিকল্পনামাফিক নীতি ও মূল্যমান নির্ধারণ করার চেষ্টা চালায়, সমাজ কাঠামোর গভীরে পর্যন্ত হাত বাড়ায় সেই রাজনৈতিক জায়গাকেই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি বলা হচ্ছে।]

Global finance has become a key element in today economy and civil society has become a key element in today's polity.[১৪]

[এখনকার অর্থনীতিতে যেমন বৈশ্বিক লগ্নি-পুঁজি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি রাজনৈতিক সমাজের মূল চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে সিভিল সোসাইটি।]

Civil society encompasses efforts to shape rules through academic institutions, business forums, clan and kinship circles, consumer advocates, development cooperation initiatives, environmental movements, ethnic lobbies, faith-based circles, farmers groups, human rights promoters, labour unions, local community groups, peace movements, philanthropic foundations, professional bodies, relief organizations, think tanks, women's networks, youth associations and more; clearly this notion of civil society streteches much wider than NGOs and other professional non profit organizations.[১৫]

[শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সমিতি, আত্মীয়গোষ্ঠী ও পরিবার পরিজনের যোগাযোগ, ভোক্তাস্বার্থের প্রতিনিধি; উন্নয়ন সহযোগিতার উদ্যোগী মহল, পরিবেশ আন্দোলন, জাতিগোষ্ঠী স্বার্থ, ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক উপদল, কৃষক মহল, মানবাধিকার গোষ্ঠী, শ্রমিক সংঘ, স্থানীয় সামাজিক চক্র, শান্তি আন্দোলন, মানবদরদী প্রতিষ্ঠান, পেশাদার সমিতি, সাহায্য সংস্থা, পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান, নারীমৈত্রী, যুবসমিতিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে মূল্যমান তৈরির

চেষ্টার নামই সিভিল সোসাইটি। বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যবসা বা মুনাফাধর্মী নয় এমন প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায় এই সংজ্ঞা তার চেয়ে বেশ ব্যাপকতর।]

CSOs encompass the range of non-state actor that are committed to the democratization of political, economic, social, cultural and environmental policies, at all levels from the local to global.[১৬]

[গ্রাম থেকে বিশ্ব পর্যন্ত সকল স্তরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক জগতে গণতন্ত্র প্রসারের অঙ্গীকারে আবদ্ধ অথচ রাষ্ট্রের ভেতরে গণ্য নয় এমন শক্তিকেই সিভিল সোসাইটির সংগঠন ধরা হয়।]

Civil society is a project where by individuals can realize there self through engagement. contestation and affirmation.[১৭] (Neera, P-28)

[সিভিল সোসাইটি নামক প্রকল্পের মধ্যে ব্যক্তি-সাধারণ স্ব স্ব অঙ্গীকার, স্পর্ধা ও প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপ দিতে পারে।]

Unprecedented flows of capital originating in core states of western Europe and the US across national boundaries have rendered the third world state powerless,...the overwhelming role of the NGOs in civil society—have occurred at the same historical time.[১৮]

[বিশ্বের কেন্দ্রস্থানীয় পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এলাকার রাষ্ট্র থেকে নজিরবিহীন পরিমাণ পুঁজি সীমান্ত প্লাবিত করে তৃতীয় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকেই অক্ষম শক্তিতে পরিণত করেছে,...সিভিল সোসাইটিতে বেসরকারী সংগঠনের ক্ষমতার শ্বাসরুদ্ধকর বিকাশ ইতিহাসের এই সময়টাতেই ঘটেছে।]

Civil society has fitted onto this framework in three important ways: first, civil society organizations have been targeted ass effective via media to channel aid for development to poor countries,...second, as recipants of aid, Civil society organization are also under obligation to fulfil their funder's agenda of furthering neo-liberalism...And third. following the tradition of Tocqueville and Putnam, civil society is viewed as an effective watchdog that can curb any authoritarian tendencies of the democratic state.[১৯]

[এই কাঠামোর মধ্যে সিভিল সোসাইটি জায়গা তৈরি হয়েছে গুরুতর তিন দিক থেকে; প্রথমত, গরিব দেশে উন্নয়ন সাহায্য পাঠাবার বাহন হিসাবে সিভিল সোসাইটি সংগঠনকে নিশানা করে কাজ শুরু হয়েছে; দ্বিতীয়ত সিভিল সোসাইটি সংগঠনের টাকাপয়সার যোগান যারা দেয় তাদের লক্ষ্য অবাধ বাজার নীতি প্রবর্তন করা; তাই সাহায্য গ্রহীতা হিসেবে এই সব সংগঠন তাদের তহবিলদাতাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেছে; আর তিন নম্বরে, সিভিল সোসাইটি সংগঠনের কাজ গণতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্রের একনায়ক হয়ে

ওঠার প্রবণতা রোধ করার যোগ্য নাদুস-নুদুস প্রহরী কুত্তার ভূমিকা পালনের দায়িত্বও রয়েছে। একথা তোকভিল আর পুটনাম বহু আগেই বলে রেখেছেন।]

World Bank (1992)-এর মতে, 'Governance is the manner of which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development.

[বিশ্ব ব্যাংকের মতানুসারে গভর্ন্যান্স মানে কোন দেশের আর্থিক ও সামাজিক সহায়সম্পদ উন্নয়নের কাজে লাগাতে ও পরিচালনা করতে হলে ক্ষমতার ব্যবহার করার উপায়কে বুঝানো হয়।]

৫

প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য ও তথ্য :

The defeat of the WTO in Seattle now shows that a third force has emerged with elemental strength to contest the monopoly of world economic and political leaders over the fate of the earth. This third force is what we now know as global civil society.

[এই পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে বিশ্ব পর্যায়ের যেসকল আর্থিক ও রাজনৈতিক নেতার হাতে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি নিয়ে একেবারে গোড়ার স্তর থেকে তৃতীয় শক্তি উঠে দাঁড়িয়েছে। সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখন এটা জানা যে, এই তৃতীয় শক্তি হল বৈশ্বিক নাগরিক সমাজ।]

It was global civil society as the third force that actuality determined the out come of the WTO talks on Seattle. We now live is a tripolar world of large business, powerful governments and global civil sociery. If we are to learn the central lesson of the defeat of the powerful WTO in Seattle, it is now the time to understand the nature of global civil society as the third force.[২০]

[সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দরকষাকষির পরিণতি কি হয়েছে তা নির্ধারণ করেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় শক্তিস্বরূপ বিশ্বজনীন সিভিল সোসাইটি। এখন পৃথিবীতে তিন মেরু: বড় বড় পুঁজি, বড় বড় সরকার এবং বিশ্ব সিভিল সোসাইটি। সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কেন পরাস্ত হলো? এর প্রকৃত উত্তর যদি জানতে হয় তো কবুল করতে হবে বিশ্বজোড়া সিভিল সোসাইটি এখন তৃতীয় পক্ষ।]

The influence of civil society in the management of global change, in turn, could never have reached their present breadth and scope without the concomitant rise of citizen action, the growth of private action

for the public good is a recent, massive almost universal phenomenon.[২১]

[দুনিয়া জোড়া পরিবর্তন ব্যবসার প্রশাসনে সিভিল সোসাইটি এখন যত ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে তা বুঝতে হলে বোঝা দরকার একই সঙ্গে নাগরিক আন্দোলনও কিভাবে বেড়েছে। দশের ভালোর জন্য এদের আন্দোলন বিকশিত হওয়া ব্যাপারটি একেবারে হাল আমলের ব্যাপক ঘটনা, বলা যায় বিশ্বজনীন।]

Flexible arrangements that enable the UN system to value civil society's ideas, proposals and resources, along patterns of 'variable geometry', may be more effective and workable strategy be substantive civil society participations than straight forwad political confrontation.[২২]

[জাতিসংঘের কার্যকলাপের মধ্যে যদি সিভিল সোসাইটির ধ্যানধারণা, প্রস্তাব ও সহায়সম্পদ যদি নমনীয় পদ্ধতিতে—অনেকটা পরিবর্তনসহ জ্যামিতির মত—কাজে লাগানো যায় তো বেশি ফল পাওয়া যাবে। সরাসরি রাজনৈতিক মোকাবেলার তুলনায় সিভিল সোসাইটিকে আচ্ছামত খাটিয়ে কার্যোদ্ধার হবে বুদ্ধিমানের নীতি।]

When ministers adopted the Marrakesh agreement they also decided to include a specific reference to non-governmental organization (NGOs) in Article V : 2 on 18 July 1996 the general council further clarified the framework for relations with NGOs by adoption a set of guidelines (WT/L/162) which `recognizes the role NGOs can play to increase the awareness of the public in respect of WTO activities'...since 1996 arrangements for NOGs have essentially focused on attendance at ministerial conferences. Participation in issue specific symposia and the day to day contact btween WTO secretariat and NGOs. More recently, the director-general has announced a number of new initiatives designed to improve the dialogue with civil society.[২৩]

[মারাকেশ চুক্তি সম্পাদনের সময় মন্ত্রী-মহোদয়রা ৫:২ ধারায় বেসরকারী সংস্থার উল্লেখ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে করেন। ১৯৯৬ সালের ১৮ জুলাই সাধারণ পরিষদ গৃহীত নির্দেশনায় (WT/L/162) বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয় 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার কাজে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে।' ১৯৯৬ সন থেকে বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার মানে দাঁড়ায় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বেসরকারী সংস্থার উপস্থিতি, বিষয় কেন্দ্রিক সম্মেলনে ও সভায় তাদের শরিকানা হবে আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখবে। আরও সম্প্রতি সিভিল সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দেন।]

বিশ্বব্যাংকের 'সিভিল সোসাইটি টিম' অতি সম্প্রতি 'World Bank'- civil society engagement.–Review of fiscal years 2005 and 2006 নামে ১২৫ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই দলিলটি পর্যালোচনা করলে সাম্রাজ্যবাদী প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সিভিল সোসাইটির অতি ঘনিষ্ঠতার একটা চিত্র পাওয়া যাবে। এখানে উক্ত প্রতিবেদন থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি :

Two significant events in 2005—the publication of Bank paper on civil society engagement and hosting of Bank civil society global policy forum—allowed the Bank to assess its relation with civil society and build consensus around next Steps.[২৪]

[২০০৫ সালে দুটি বড় ঘটনা ঘটে। সিভিল সোসাইটি কাজে লাগানোর বিষয়ে বিশ্বব্যাংক একটি দলিল প্রকাশ করে। আর বিশ্বজনীন সিভিল সোসাইটি বিকল্পের নীতিনির্ধারণী সভায় বৈঠকের দায়িত্ব বিশ্বব্যাংক গ্রহণ করে। ফলে সিভিল সোসাইটির সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হয়।]

One significant policy dialogue event of the past two years was three day world bank—civil society global policy forum held in Wasgington, D.C, in April 2005. The event brought together some 200 civil society leaders, government officials, parliamentarians, donor agency representatives, International Monetary Fund staff and Bank executive director—to discus Bank—civil society relations at the global level.

[২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের ওয়াশিংটন শহরে তিনদিন ব্যাপী বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্ব জোড়া সিভিল সোসাইটি নীতিনির্ধারণী সভা বসে। গত দু'বছরের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই সভায় প্রায় ২০০ জন সিভিল সোসাইটি নেতা, সরকারী কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য, দাতা সংস্থার দূত, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক একত্র হয়ে বিশ্ববিস্তৃত ব্যাংক-সিভিল সোসাইটি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।]

The Bank maintained a high level civil society involvement in the financial Projects, documenting that 217, or 72 percent, of the 302 loans approved by the board during 2006 had involvement by civil society."

[বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (বিনিয়োগ) প্রকল্পে সিভিল সোসাইটির অংশীদারিত্ব খুবই বেশি। ব্যাংকের দলিলপত্র অনুসারে দেখা যায় ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলী ২০০৬ সালে মোট ৩০২টি ঋণ প্রকল্প অনুমোদন করে। এর মধ্যে ২১৭টি বা শতকরা ৭২টিতে সিভিল সোসাইটি জড়িত।]

Although the Bank's primary forms of assistances are loan to government, the Bank has continued to expand mechanisms for making grants directory to thousands of CSOs throughout the world.

[ব্যাংক সহায়তা দেয় মূলত সরকারের হাতে ঋণ তুলে দেওয়ার মাধ্যমে- একথা সত্য। তবে সারা পৃথিবীব্যাপী হাজার হাজার সিভিল সোসাইটি সংস্থাকে সরাসরি অনুদান দেওয়ার কলাকৌশলের সম্প্রসারণ প্রতিদিনই করা হচ্ছে।]

At the regional level, the Bank continued to engage civil society through variety of mechanisms and programs.

[অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যাংক হরেকরকম কলাকৌশল আর কর্মসূচির সাহায্যে সিভিল সোসাইটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় বিরাম দেয় নাই।]

In every region, engagement of civil society on Bank related policy reforms and in national dialogue processes such as the PRS (Proverty Reduction Stragegy) and CAS (Country Assistance Strategy) has helped inform and refine national Policies and Bank strategies.

[দুনিয়ার সমস্ত অঞ্চলেই, যে সব নীতিগত পরিবর্তনের পেছনে বিশ্বব্যাংকের হাত আছে সেসব পরিবর্তনের কাজে এবং দারিদ্র্য হ্রাস নীতি আর দেশকেন্দ্রিক সহায়তা নীতির মতো জাতীয় সংলাপ প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটিকে জড়ানোর ফলে জাতীয় নীতি আর ব্যাংকের রণনীতি দুটোই লাভবান এবং উন্নততর হয়েছে।]

ভূমিকা হলেও যেহেতু এখন বহুল আলোচিত সেজন্য Civil Society, Public Sphere বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। এ ব্যাপারে শুধু একটি মতামত উল্লেখ করা হলো:

If civil society is construed broadly to include political society and public sphere then we posses a political conception of civil society linked to active citizenship. If it is construed narrowly as focusing only on relations between individuals primarily in their private capacity, then the term civil society refers to a eagerly non-political sphere and a separate concept is required to capture a distinctively political domain outside formal state institutions.[২৫]

নবম সংসদীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়া ও তার কার্যকারিতা নিয়ে যখন তুমুল বাদানুবাদ, মিছিল-মিটিং থেকে সংঘর্ষমূলক অবস্থা চালু ছিল সেই সময় সম্ভবত চ্যানেল আইর এক অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি এখন তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এবং সম্ভবত গত ৭-০২-০৭ তারিখে চ্যানেল আই এর এক টক শোতে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ দাবি করেন 'বাংলাদেশের বর্তমান সরকার হলো সিভিল সোসাইটির সরকার।'

অবশ্য বর্তমান সরকার শুরু থেকেই নিজেদেরকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলেই দাবি করে আসছেন। দেশের ভেতরে বর্তমান সরকারের উদ্ভবের পেছনে প্রধান শক্তি হিসাবে সেনাবাহিনীও এই সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলেই অভিহিত করে আসছেন। তবে উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নির্বাচন, সংবিধান, গণতন্ত্র ও সুশাসনসহ দেশের প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে দাতা দেশসমূহের প্রতিনিধিদের প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দাবিসহ দর্নীতিমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, বেকারমুক্ত ও অতিস্বচ্ছ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যে তৎপরতা চালাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে আদরের ডোনার ও সিভিল সোসাইটি এখন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের একমাত্র ইজারাদার।

ইউনুস সাহেব তো 'দারিদ্র'কে জাদুঘরে পাঠিয়ে দিবেনই, অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা এমন মহাব্যবস্থা নিবেন যাতে হয়ত আমাদের জীবনের অভিধান থেকে দুর্নীতি শব্দটি অচিরেই উঠিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। নোবেল কমিটি এখন বাংলাদেশ ল্যাবরেটরিকেই খুঁজছে! অর্থাৎ দেশকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে ও দুর্নীতি মুক্ত করতে জনগণ ও অন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন নেই!

বাংলাদেশে সুশাসনের সন্ধান করতে গিয়ে 'নাগরিক সমাজ ও সুশাসন' অধ্যায়ে ড. আতিউর রহমান উল্লেখ করেছেন; সাহায্য দাতারা এখন আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের দেয়া সাহায্যনির্ভর প্রকল্পগুলো রূপায়ন করতে আগ্রহী নন।

ব্যক্তিগত অলাভজনক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য তারা তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়নে এখন বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়। পাশাপাশি নাগরিক সমাজের নানা সংগঠন ও সমিতির ভূমিকা জোরদার করতেও তাদের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। বাধ্য হয়েও সরকারকেও এমন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে হচ্ছে। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে যৌথভাবে সরকারকে কর্মসূচি কিম্বা প্রকল্প গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই নাগরিক সমাজ ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করে।...'উন্নয়ন সহযোগীদের সুশাসন বিষয়ে ভাববার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।...' এই জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করা দরকার সে সবের দিকে নজর দিতে তারা নিজেদের স্বার্থই বলে থাকে। তাদের দেশের পণ্য, প্রযুক্তি, সার্ভিস এদেশে বিক্রী করার প্রয়োজনে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার প্রয়োজন। বিনিয়োগের পরিবেশ রক্ষা করা চাই। নানা ধরনের দাতা দেশ ও সংস্থা নানাভাবে এই শাসন ব্যবস্থা বা কাঠামোর মান উন্নয়নের তাগিদ দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের একমাত্র চিন্তা বাজার শক্তির বিকাশ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর আগ্রহ অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার, ইউএসএআইডি চায় তার কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা, ডিএফআইডিসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। হরেক রকমের এই

সব লক্ষ্য পূরণে চাই কার্যকর শাসন কাঠামো বা সুশাসন।[২৬]

ড. রংগলাল সেন মনে করেন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের কছে সিভিল সোসাইটি পুনর্গঠন প্রকৃতপক্ষে মুক্তির পরিকল্পনা তুল্য।...সিভিল সোসাইটি যতই আত্মসচেতন হবে ততই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে। সিভিল সোসাইটির প্রতি আমাদের আবেদন আসলে আমাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা দাবি করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার পথ সুগম হবে এবং এভাবে প্রগতিশীল রাজনীতির পুনর্জাগরণ ঘটবে।[২৭]

বিশ্বব্যাপী সিভিল সোসাইটির উদ্যোক্তা সংগঠন ও তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ এখন এত বেশি আক্রমণাত্মক ভূমিকায় এসেছেন যে, তাঁরা মনে করছেন Alternative/Another বিকল্প বিশ্ব নির্মাণের তাঁরাই যুগের সেরা প্রকৌশলী।

মার্কসবাদী বিপ্লবের যুগ শেষ বলে ধরে নিয়ে এবং নতুন এক ধরনের বিপ্লবের সম্ভাবনা সামনে রেখে বলা হয়েছে Civil society began where revolution ended.[২৮]

Despite its limited experiance as a worldwide dissenting force, global civil society already plays a significant role in developing a world conscience, formulating humanity's needs and aspirations and building a new world order...'without professional revolutionaries,' ...This is new type of revolution, like no other century has ever seen ... Global collective consciousness capable of crying out; ANOTHER WORLD IS POSSIBLE![২৯]

২০০২ সালে বোস্টনে বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত প্রশ্নে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে প্রচারপত্রে বলা হয় : This is the beginning of a revolutionary movement to create a new society built out of a new logic that breaks from the system of exploitation,...we will build our movement and a new society out of a humanistic logic based on principles of solidarity, democracy and cooperation.[৩০]

লক্ষ করলে দেখা যাবে ১৯৯৮-এর মূল প্রবন্ধে সেই সময় প্রধানত *ভোরের কাগজ* মারফত যে বিতর্ক চলছিল তা খণ্ডন করতে যেয়ে *ভোরের কাগজের* দোহাই দিয়েছিলাম। আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আমি প্রধানত রাজনৈতিক দার্শনিকদের মূল গ্রন্থের শরণাপন্ন হই। কিন্তু এই ভূমিকাতে আমি যেসব তথ্য ব্যবহার করেছি তা সবই ১৯৯৮ সালের পরের। মূলত ২০০০-২০০৫ সালের মধ্যেকার। অর্থাৎ সর্বশেষ তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি।

আগেই বলা হয়েছে, সিভিল সোসাইটির সংজ্ঞা ও এর কর্মপরিধির ব্যাপারে ভিন্নমত থাকলেও mainstream concept of civil society-র ব্যাপারে মোমুটি একটা ঐকমত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবুও যা বিশেষভাবে নজর কাড়ে তা হলো ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সিভিল সোসাইটি শেষ

পর্যন্ত গ্লোবাল ফাইন্যান্সের বিশ্বস্ত পাহারাদারের কাজে নিয়োজিত। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা—ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে ভাবখানা যেন তাদেরও অসন্তুষ্টি আছে—তবে আসল কথা হলো ড. আতাউরের ভাষায়, দাতা দেশ ও তাদের বিভিন্ন সংস্থার স্বার্থ রক্ষার্থেই নাগরিক সমাজের নানা সংগঠন ও সমিতির ভূমিকা জোরদার করতে তাদের আগ্রহ। অনেকেই বেশ খুশি খুশি ভাবে বলেছেন নাগরিক সমাজ হলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিশয় সাধু বটে বেশ! দৃশ্যত এনিয়ে অহেতুক বিব্রত হওয়া ছাড়া অন্য কোন ফায়দা নেই। ব্যক্তিগতভাবে কে কতখানি ধোয়া তুলসী এবং তাদের সংগঠন কতখানি পরিষ্কার তা আমজনতার কাছে প্রকৃত অর্থে অর্থহীন। সাম্রাজ্যবাদ ও তার নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্বিক পরিল্পনার নিরিখেই সববিছু বিচার করতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সারা বিশ্বকে শোষণ ও পদানত রাখার যে মহা রণপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সিভিল সোসাইটি মূলত এই রণনীতিরই উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পর্কিত। আরো বিপদের কথা দক্ষিণ এশিয়ার ভারত এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের Global Strategy-র প্রধান বিশ্বস্ত সহযোগী ও মিত্রে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সিভিল সোসাইটির তাত্ত্বিকরা হেগেল ও মার্কস বর্ণিত সিভিল সোসাইটির অর্থান্তর ঘটাচ্ছেন। হেগেল ও মার্কস যে 'বুরগার্লিশে গেজেলশাফট' এর অর্থ করেছেন তা বর্জন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। Interestingly, even in the German language a neologism *zibil Gesellschaft*, Which is a literal translation of English 'civil Society', has now been introduced. This development is evidently due to the need felt by German scholars for a term to distinguish between 'bourgeois society', and 'civil society', as *burgerliche Gesellschaft,* used by Hegel and Marx, is not only unsuitable but even misleading in the contemporary context.[৩১]

গ্রন্থনির্দেশ

১. Khan, Mizan, R. and Kabir, M.H. eds 2002. *Civil Society & Democracy in Bangladesh*, Academic Press & Publishers Ltd, in collaboration with Bangladesh Institute of International & Strategic Studies. Dhaka. p. 6

২. Ibid, p. 140

৩. Rahman, Mizanur eds 2005. Human Rights and Non-state Actors, Empowerment through Law of the Common People (ELCOP), and AED, Washington, Preface.

৪. Khan and Kabir. p.15

৫. Jayaram, N, eds. 2005, *On Civil Society Issues & Perspectives*, Publications. New Delhi. p. 11

৬. Clark, John, 2003, *Worlds Apart: Civil Society and the Battle for Ethical Gobalisation,* Earthscan Publications Ltd. London. p. 92

৭. Ibid, p.19
৮. Carotheas, T. 1999, "Civil Society Think Again", *Foreign Policy* (Winter), 18-19, Quted in ibid, p. 95
৯. Clark p. 95
১০. Ibid. p. 96
১১. Keane, J. 1998, *Civil Society Old Images,* New Visions, Stanford Press. p. 6
১২. Ibid, p. 19
১৩. Schnabel, A, and Scholte, A.J.eds, 2002, *Civil Society & Gobal Finance,* Routledge, p. 3
১৪. Ibid, p. 2
১৫. Ibid, p. 3
১৬. Ivid, p. 69
১৭. Chandhoke, Neera, 2003, *The Conceits of Civil Society,* Oxford University Press, New Delhi, p. 28
১৮. Ibid. 80
১৯. Rajesh Tandon. and Ranjita Mohanty 2003 eds, *Does Civil Society Matter*? Sage Publications, New Delhi, p. 13
২০. Perlas, N. *Civil Society_ The Third Global Power,* http/southerncrossreviw. org/4/wto.html
২১. High Level Panel on Civil Society 13 June html www.un . org/reform/Ptfs/.crdosopaper
২২. ibid
২৩. Relations with Non-governmental Organizations/Civil Society. www.wto.org/english/forum–e/ngo–e/intro–e.html
২৪. Civil Society Team, The World Bank, Washington.
২৫. Bhargave, R. and Reifeld.H. eds. 2005. Civil Society. Public Sphere and Citizenship, p. 24
২৬. রহমান, আতউর, *সুশাসনের সন্ধানে*, ২০০৩, অন্য প্রকাশ পৃ. ১৩২
২৭. সেন, রংগলাল ড., *সিভিল সোসাইটি*, ২০০৬, পৃ. ৪৭-৪৮
২৮. Neera. p. 29. Quoted in Mohanty. R and Tandon. R eds. *Does Civil society Matter*
২৯. Gelinas, J. 2003, *Juggernaut Politics,* ZED, p. 195, 201
৩০. <http:/www.biodev.org/index 2.htm>
৩১. Jayaram. N. ed. *On Civil Society,* p. 18

ইতিহাসের আলোকে 'সিভিল সোসাইটি' এবং এর এনজিও ভাষ্য প্রসঙ্গে

প্রাক-কথন :

[এনজিও আয়োজিত সিভিল সোসাইটির সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ভাষণকে কেন্দ্র করে *ভোরের কাগজ* মারফত যখন বিতর্ক বেশ তুঙ্গে তখন ছোট কলেবরে বর্তমান লেখাটি ছাপানোর জন্য *ভোরের কাগজে* পাঠিয়েছিলাম। লেখার ধরনটাও এর থেকে ভিন্ন ছিল। *ভোরের কাগজ* ও তার সম্পাদক এনজিওদের নেতৃত্বে যে সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজ আন্দোলন চলছে তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও আমার লেখাটি ছাপেননি। লেখাটাতে অবশ্য *ভোরের কাগজ*-এর বিখ্যাত সম্পাদকের বক্তব্যেরও সমালোচনা ছিল। আমার লেখাতে আমি আশঙ্কা করেছিলাম লেখাটি ছাপা হবে না বলে। আমি লেখক নই, আমার পেশার সাথে লেখাপড়ার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই জেনেও বন্ধুবর রাশেদ খান মেনন ও আবেদ খান লেখাটি যাতে প্রকাশিত হয় তার জন্যে 'তদ্বির' করেছিলেন, তাতে কাজ হয় নি। আমি 'কলাম' উপযোগী করতে রাজি হয়েছিলাম তাতেও 'বাতিল' বলবৎ থাকল। কমরেড বদরুদ্দীন উমর ব্যাপারটি জানতে পেরে *সংস্কৃতিতে* ছাপার জন্য বলেন। বর্তমান কলেবরে প্রস্তুত করে দিতে বেশ দেরি হয়ে গেল। *সংস্কৃতির* সম্পাদক নিয়মিত তাগিদ না দিলে আদৌ লেখাটি তৈরি হত কিনা জানিনে। আমি কখনোই ক্রেমলিন, বেজিং নির্ভর সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলাম না, আজো নেই। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে অন্তত এই কথাটি জোরের সাথে বলবার সাহস হারাই নি।

এই লেখার পাঠকদের উদ্দেশ্যে আরো দুটো বিষয় জানিয়ে রাখা দরকার। তা হল: প্রথমত, সাম্প্রতিক কালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা 'সিভিল সোসাইটি'কে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন এবং পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত রাষ্ট্রের ভূমিকা, নাগরিকত্ব, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইস্যুগুলোতে 'সিভিল সোসাইটি' ধারণাটির নতুন অর্থ প্রদানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। ধারাবাহিক আলোচনা চললেই কেবল পুরোটা বোঝা যাবে; দ্বিতীয়ত, লেখাটি তৈরি করতে আমি মূল বইয়ের সাথে সাথে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি বইয়ের সাহায্য নিয়েছি তবে 'অনুবাদ' একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে থাকল। আমার মনে হয় 'অনুবাদ সমস্যা' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া খুবই জরুরি।

আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসে 'সিভিল সোসাইটি' একটি অতি পুরাতন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ সামরিক শাসনের বিপরীতে বা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কথিত গণতান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে আরো বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলতে নতুন করে বিষয়টি অবতারণা করেছেন। কিছু কিছু বক্তব্য ও আলাদাভাবে কিছু লেখা প্রকাশিত হলেও গত ২৪ জুলাই ১৯৯৭ এনজিওদের উদ্যোগে ও নেতৃত্ব গঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সিভিল সোসাইটি ফোরামের দ্বিতীয় সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, ১৯৯৬ সালের কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেন মূলত বাংলাদেশের এনজিওদেরকেই এখানকার সিভিল সোসাইটির মূলশক্তি ও প্রেরণা বলে অভিহিত করে তাদের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে আরো বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য আহবান জানিয়ে যে বক্তব্য দেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে কয়েক মাস ধরে এ নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে। এর আগে ও এই সময়কালে যাঁরা এই সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যে ভাবে তা হাজির করেছেন তা তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বুঝতে গেলে যথেষ্ট বিব্রত হতে হচ্ছে এই জন্য যে, মনে হচ্ছে যেন তাচ্ছিল্য সহকারে গুরুত্ব না দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ এরাই আজ আমাদের সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী হবে সে সম্পর্কে কখনো নবীর ভাষায়, কখনো খলিফাদের ভাষায় প্রতিনিয়ত বাণী বিতরণ করে চলেছেন। আমি পাঠককূলের অন্তর্ভুক্ত, আমার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ—তবুও লিখতে হচ্ছে কারণ এই সব আলোচনার ভেতর দিয়ে বিষয়টিকে ইতিমধ্যে যেমন যথেষ্ট ঘোলাটে করে তোলা হয়েছে তেমনি এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় বড় শক্তিধর এনজিও নেতৃত্বের ভূমিকা ও তাদের কর্মপদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর সাথে সাথে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতির অপরিহার্যতার দিকে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করানোর যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা বুঝবার চেষ্টা করা এবং দেশের নেতৃস্থানীয় এনজিওরা অতীত থেকে চলে আসা একটি ধারণাকে বর্তমান জাতীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতির এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে অতি চাতুর্য্যের সাথে সুপরিকল্পিত ছকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে জনগণের কল্যাণের প্রশ্ন সামনে এনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রমাগত দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাসহ পুরো সমাজের উপর কর্তৃত্ব কয়েমের যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তার স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াসে।

স্বভাবতই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর দুটি দিক রয়েছে: এক, সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে ইতিহাসগত একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র; দুই রাষ্ট্রপতির ভাষণকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের মূল দিকের আলোকে প্রধান এনজিও নেতৃত্বের দুরভিসন্ধির প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

অধ্যায় : এক

১

ইতিহাসপর্ব আলোচনার প্রয়োজনেই প্রথমে সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে কয়েক বছর ধরে দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সাম্প্রতিক বিতর্কের বেশ আগে বিচারপতি কে এম সোবহান এক প্রবন্ধে বলেন, সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দটির আলোচনা করলে বাংলায় এর যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক সমাজ'।[২]

মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত রায়ের সংজ্ঞা : সামরিক শাসন বা সামরিক সমাজের বিপরীতে রাষ্ট্রে, সমাজে নিরস্ত্র মানুষের কর্তৃত্বকেই মূলত সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধারণাটির ইতিহাস জানাতে গিয়ে বলেছেন, সপ্তদশ শতকের হবসের লেখা থেকে 'সিভিল সোসাইটি' ধারণার উদ্ভব। এঁরা ইংরেজি সিভিল সোসাইটির বাংলা করেছেন 'সিভিল সমাজ'।[৩]

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ২৯/১২/৯৬ *বাংলাবাজার পত্রিকায়* এক প্রবন্ধে সিসেরো ও মার্কস থেকে উদ্ধৃতি দেন এবং মার্কস সম্পর্কে বলেন, মার্কস অবশ্য সিভিল সমাজকে একটা সীমিত অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সহজ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আমাদের প্রয়োজন একথা উল্লেখ করেছেন বটে তবে নিজে কোন সংজ্ঞা না দিয়ে বলেছেন, সারা বিশ্বে বর্তমানে গবেষক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে যে, সিভিল সমাজের ভিত্তি ছাড়া গণতন্ত্রায়ন ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব নয়।

২৪ জুলাই ৯৭ এনজিও আয়োজিত সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন:

—A civil Society represents the ordinary Members of a society.

—জনগণের বৃহদংশ তাদের শ্রেণি, ধর্ম, জাতীয়তা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে একটি দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

একই বক্তব্যে তিনি রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন।

একই সম্মেলনে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, সামাজিক চুক্তির মতবাদ থেকে আঠারো শতকে পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধারণাটি বিশেষ ব্যাপ্তি অর্জন করে এবং এনজিওরা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে যে সিভিল সমাজ আন্দোলন চলছে তাকে শক্তিশালী করে তুলেছে।

রাশেদ খান মেনন: সংবাদপত্রে এই সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশের পর রাশেদ খান মেনন রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ও এনজিওদের কার্যকলাপের বিরোধিতা করে লেখা প্রকাশ করেন। এই বক্তব্যে তিনি বলেন, এই সিভিল সোসাইটির কনসেপ্ট গ্রামশি হতে বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে। তিনি নিজে সংজ্ঞা দেন : এনজিও ও আমলা

নেতারা যাকে 'সুশীল সমাজ' বলেছেন তা আসলে 'জনসমাজ'। সভ্য-ভব্য বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিপরীতে শ্রেণি সংগ্রামে আগুয়ান সংগঠিত পেশা ও শ্রেণির সংগঠনই এই 'জনসমাজের' ভিত্তি। (মেননের কাছে বুর্জোয়া সমাজ ও 'জনসমাজ' দুটো আলাদা সমাজ এবং 'জনসমাজ' হল মেহনতি মানুষের প্রত্যাশিত সিভিল সোসাই-টির—লেখক)।[৪]

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : আমি প্রথমে এই শব্দবন্ধটির উল্লেখ শুনেছিলাম একজন ভারতীয় মনীষী ব্যক্তির মুখে। এরপর নিজের সংজ্ঞা : রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে যে সমাজ সে হল নাগরিক সমাজ, সুশীল বা সুভদ্র সমাজ নয়। নাগরিক সমাজের কাজ হচ্ছে গণতন্ত্রকে সংহত করা।[৫] (উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার সময় সিভিল সোসাইটির বাংলা করা হয় সুশীল সমাজ। এয আগে 'সিভিল সমাজ' বলেই চালানো হতো।)

আবুল মাল আব্দুল মুহিত : প্লেটো ও গ্রিক নগর রাজ্যের বর্ণনা ও আগের লেখাগুলো অস্বচ্ছতার বর্ণনা এবং নিজে কোন সংজ্ঞা বা বক্তব্য না দেয়া এবং উপদেশ: সার্বিক রাষ্ট্রযন্ত্র যাতে জন বিচ্ছিন্ন না হয় তা নিশ্চিত করা সিভিল সমাজের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।[৬]

ফ.র.মাহমুদ হাসান : রাশেদ খান মেননের বক্তব্য প্রকাশের প্রায় দুই মাস পর দুই কিস্তির লেখাতে মেননের বক্তব্যকে তীব্র আক্রমণ করেন এবং নিজে সিভিল সোসাইটির মূল শক্তি কারা তা ব্যাখ্যা করে যা বলেন তার মর্মার্থ হল: এনজিও + ঢাকা এবং প্রধান জেলা শহরগুলির নাগরিক সংগঠন + দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ= সিভিল সোসাইটি। তিনি অবশ্য 'সিভিল সমাজ' এ বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন।[৭]

ফরহাদ মজহার: দুই কিস্তির দীর্ঘ বক্তব্যে তিনি সিভিল সোসাইটি নিয়ে যে একটা নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে এর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে পরে আলোচনা করবেন জানিয়েও বললেন:

—আঠারো শতকে এর যে অর্থ ছিল এখন তা নেই;

—রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ভূমিকার বিপরীতে অন্যান্য পরিমণ্ডলের ভূমিকা ও সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে সিভিল সোসাইটি নামক একটি ধারণা কাজে লাগে।

—'সিভিল সোসাইটি' মানে হচ্ছে 'সমাজ'

—এও জানান দিয়ে গেলেন, নিজের গুরু হেগেলের কাছ থেকে ধার করে মার্কস নিজে যখন জার্মান *burgerliche gesellschaft* (সিভিল সোসাইটি) ব্যবহার করলেন তখন তার সঙ্গে তাঁর নিজের গুরুরই গরমিল হলো। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি আর স্বার্থ এক রকম ছিল না।[৮]

'সিভিল সোসাইটি' ধারণাটির যে কয়েকশো বছরের একটা ইতিহাস আছে এবং একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসই যে এর মর্মবস্তু তা কি উপরোক্ত আলোচকদের অজানা? মনে করি অজানা নয়, কিন্তু হেগেল, মার্কস ও গ্রামশি এড়িয়ে বা বাদ দিয়ে সিভিল সোসাইটি বা উদ্দেশ্যমূলক অনুবাদ

'সুশীল সমাজ' নিয়ে অর্থব্যয় করে, সময় ব্যয় করে আলোচনা-পর্যালোচনার নিশ্চয়ই কোন ভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

এখানে আসলে যে বিষয়টি তলিয়ে দেখা দরকার তা হলো, এ কথা বলা হচ্ছে যে, আঠারো শতকে সিভিল সোসাইটির যে অর্থ ছিল এখন তা আর নেই; কিন্তু একথা মোটেই বলা হচ্ছে না পুরো ঊনিশ শতকে ও বিশ শতকের শেষ দশক পযন্ত এর অর্থ কি ছিল? আর আঠারো শতকেই বা সিভিল সোসাইটি বলতে কি বুঝানো হত এবং কয়েক শ' বছর পর ইউরোপে এবং বাংলাদেশে বিষয়টি নিয়ে এনজিও তহবিলের উপর নির্ভর করে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

উপরে বিভিন্ন আলোচকদের যে সব সংজ্ঞা ও উপদেশ তুলে দেয়া হয়েছে তার আলাদা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করবার কোন প্রয়োজন এখানে নেই, তবুও সেগুলো সামনে রাখা দরকার বিবেচনায় অতি সংক্ষেপেই তার উল্লেখ থাকল।

২

আমি নিজে 'সিভিল সোসাইটি' বুঝতে চেষ্টা করেছি Mode of Production (উৎপাদন প্রণালী) সংক্রান্ত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বড় রকমের পিছু হটা ও পুঁজিবাদের একটা রমরমা দৃশ্যপটে মেহনতি মানুষের দুষমনদের বেশকিছু অতিরিক্ত সুযোগ এসেছে, এমনকি academic point of view থেকেও মার্কস-এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণকে একেবারে বাদ দেবার ব্যাপারে রীতিমত বেয়াদবি শুরু হয়েছে—এর ছাপ এখন সর্বত্র।

ইউরোপে ফিউডাল উৎপাদন প্রণালীর (F.M.P.) জায়গায় পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর (C.M.P) স্থান করে নেবার সময়কাল থেকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের যে শুরু সেখান থেকে যাত্রা শুরু করলে দেখা যাবে বর্তমানের যে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ তা দ্বন্দ্বসংঘাতময় বুর্জোয়া সমাজেরই এক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিভাষা মাত্র, যার ভেতর দিয়ে বুর্জোয়া স্বার্থকে রক্ষা করাই হল বুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাবাদর্শীদের কাজ। বাংলাদেশে বর্তমানে সেই কাজ হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্র, শোষকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বন করে তাদের সাফাই গাওয়া, জনগণের দুশমনদের ঘৃণ্য চেহারাকে পালিশ করা এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা।

আমি ইতিহাসের এই পর্ব আলোচনা করতে গিয়ে মেকিয়াভেলী, হবস, লক, রুশো, হেগেল, মার্কস-এঙ্গেলস ও গ্রামশি-র মতামতকেই শুধু প্রাধান্য দিয়েছি। যাতে করে গ্রামশি পর্যন্ত ধারাবাহিকতার যোগসূত্র অক্ষুণ্ন থাকে।

রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ে যখন থেকে আলোচনা শুরু তখন থেকেই নাগরিক সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা অল্প বিস্তর শুরু হলেও আমরা আজ যে নাগরিক সমাজ নিয়ে

কথাবার্তা বা তর্ক-বিতর্ক শুনছি তা আধুনিক কালের রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। ইউরোপে (প্রথমে ইতালি, নেদারল্যান্ডস, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের সময়কালটাই হল সেই পর্ব যেখান থেকে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা তথা বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব। বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতবাদ বিকাশের ধারাতে ব্যক্তিসত্তা ও রাষ্ট্রের সমস্যা সব সময়ই কেন্দ্রবিন্দু, রাষ্ট্রকে ঘোষণা করা হয় মানব মুক্তির সম্ভাব্য গ্যারান্টি বলে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রপাটের সার্বভৌমত্ব, তার উৎস আর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি বিবেচিত হতে থাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক মতবাদে একটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে 'সামাজিক চুক্তির ধারণাটা'। নানাবিধ তার ব্যাখ্যা। 'সামাজিক চুক্তি' বিষয়ক ধারণাটার গ্রহণ ও পরিবর্ধন কিংবা তার সমালোচনা ও বর্জন প্রতিফলিত হয়েছে ষোল থেকে উনিশ শতকের রাষ্ট্র বিষয়ক অনেক মতবাদে।[৯]

যেহেতু প্রথম থেকেই বুর্জোয়ারা একটি অখণ্ড সামাজিক সত্তা বা সমপ্রকৃতির সামাজিক গ্রুপ হিসেবে সমতালে অগ্রসর হয় নি সেজন্য আইন, নৈতিকতা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন সামনে রেখে রাষ্ট্রর সাথে ব্যক্তির, সরকারের, রাজনৈতিক দলের, শ্রেণির ও ব্যাপক অর্থে সমাজের সম্পর্ক কেমন হবে বা হওয়া উচিৎ সেটাই এই নতুন রাজনৈতিক মতবাদের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হলেও মত পার্থক্য, তর্ক-বিতর্কের অস্তিত্ব ও গতিময়তা স্বাভাবিকভাবেই বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করেছে। অসম বিকাশের নিয়ম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরস্পর প্রতিযোগিতা তথা দেশকাল পাত্রভেদে এইসব পার্থক্য ধরা যায় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক আশাবাদের ভিত্তি হিসেবে যুক্তিবাদী পদ্ধতির প্রাধান্যই সব সময় বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে কার্যকরী থেকেছে।[১০]

এই নতুন ধারার পথিকৃৎ হলেন নিকোলো মেকিয়াভেলী। ১৯৬৯ সালে পূর্ণ হয়েছে মেকিয়াভেলীর ৫০০তম জন্মবর্ষ। মোটামুটি এই সময়কাল থেকে বুর্জোয়ারা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়েছে 'প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী' হিসেবে নিজেদেরকে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে ও রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরিণত করে নিজেদের শ্রেণি স্বার্থে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার রূপে তা ব্যবহার করতে।

আঠারো শতকের শেষ নাগাদ বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তাধারা পূর্ণতা পেলেও ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপ পরিসরের নিরিখে অসম বিকাশের প্রক্রিয়াসহ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশক পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। বলা যায়, শিল্প বুর্জোয়ারা নেতৃত্বে আসার মধ্য দিয়ে এই ধারা তার যথার্থ সাবালকত্ব অর্জন করে। এই যে দীর্ঘ সময় এই সময়েই ইউরোপ ভারতসহ পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল দখল করে উপনিবেশে পরিণত করে।

যা হোক, এই কয়েক শো বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা যেমন পেয়েছি বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতিনিধি হিসেবে মেকিয়াভেলী, হবস, স্পিনোজা, লক, রুশো,

জেফারসন ইত্যাদি হয়ে হেগেল, তেমনি তার বিরোধী সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতিনিধি হিসেবে টমাস মূর, কাম্পানেল্লা, মরেলি, বারেফ, কাবে, ব্লাঙ্কি, ভাইতলিং ইত্যাদি হয়ে মার্কস-এঙ্গেলসকে।

৩

মেকিয়াভেলী তাঁর বিখ্যাত *দ্য প্রিন্সেস* (১৫১৩) 'নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট রাজ্য সম্পর্কে' অধায়ে বলেন, রাষ্ট্রে দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণির দেখা মিলবেই, জনগণ চায় সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের দ্বারা পীড়িত না হতে, তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে, অভিজাতরা চায় যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা দখলে রাখতে, অত্যাচার বাড়িয়ে তুলতে, এই দুটি ভিন্ন প্রবণতার ফল সাধারণত দাঁড়ায় চরম শাসন ব্যবস্থায় কিংবা স্বাধীনতা, নয়ত নৈরাজ্যের প্রাধান্যে।[১১] ষোল শতক থেকে আজ পর্যন্ত 'মেকিয়াভেলীজম' বলে যে বিকৃত অভিধাটি চালু আছে সেটিই তার মূল কথা নয়, গ্রামশির মন্তব্য অনুসারে, তিনি কেবল মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছেন ফলপ্রদ হতে হলে ঐতিহাসিক শক্তিগুলির কাজ করা উচিত কিভাবে। মেকিয়াভেলীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে ছিল রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর মতবাদ। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত সমস্যা তিনি আগেই অনুমান করেছিলেন।[১২]

হবসের (১৫৮৮-১৬৭৯) *Decive* ও বিখ্যাত *Leviathan* প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৬৪২ ও ১৬৫১ সালে। *লেভিয়াথান*-এ তিনি তাঁর রাজনীতি ও রাষ্ট্রের তত্ত্ব পূর্ণাকারে হাজির করেন। হবস মনে করেছেন মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই হিংস্র ও স্বার্থপর। উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের সম্পত্তির মালিকদের চরিত্রকে ভিত্তি হিসেবে ধরেছিলেন হবস।[১৩] তিনি বলেন, Where every man is enemy to every man সেখানে, without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called warre; and such a warre, as is of every man, against every man,[১৪] সুতরাং where there is no common, power, there is no law, where no law, no justice.[১৫] এর জন্য দরকার an agreement or contract সম্মতির ভিত্তিতে প্রাকৃতিক অধিকারকে ছাড় দিয়ে would have to transfer them to some person or body who can make the agreement stick.[১৬] কিন্তু চুক্তিসমূহ তরবারির শক্তি ছাড়া কথামালামাত্র—একটি লোকেরও যা নিরাপত্তা দিতে পারে না। Within the sword, are but words,[১৭] এবং লোক যে ব্যক্তি বা সভার অধীনতা গ্রহণ করছে তাকে বলা হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা—সার্বভৌম, বাদবাকিরা হল প্রজা।[১৮] এইভাবে হবস সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের ভিতপত্তন করেন, যাকে আঠারো শতকে পরিবিকশিত করেন রুশো।[১৯] Civil society is constituted by the social contract এবং There is no set limit to the size of a civil society.[২০] (Strauss and Cropsy), প্রাণ হরণের অধিকার ছাড়া প্রজাদের উপর সীমাহীন ক্ষমতা হবস দিয়েছেন সার্বভৌমত্বকে। তাঁর কাছে সমাজ

জীবনের একমাত্র রূপ রাষ্ট্রীয় সংগঠন। The sovereign state he has justified is a bourgeoise state.[২১] তিনি মনে করেন রাষ্ট্র ও সমাজ এক। বুর্জোয়া সমাজের ঊষাকালে কর্তৃত্বপরায়ণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা মডেল রচনা করেন তিনিই প্রথম।[২২] Since the main body of his science was produced by deduction from these models, it is a science of bourgeoise society. And it is clear that the prescription he deduced from his models would suit bourgeoise man.[২৩]

গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে হবস পার্টিগুলিকে ভেঙ্গে দেবার প্রস্তাব করেন। সেদিক হতে হবসকে সংগত কারণেই বলা যায় দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া র‍্যাডিকেলিজমের প্রবর্তক।[২৪] হবসের কাছে সমাজ একটি কৃত্রিম সংস্থা তথা একটি যৌথ নাম সেখানে বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে তাদের পণ্য ও কার্য বিনিময় সুবিধাজনক ভাবে সম্পাদন করতে পারে। এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাই হবসের মতবাদকে তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবাত্মক মতবাদে উন্নীত করে।[২৫]

সংগতকারণেই বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পত্তির ধারণার ক্ষেত্রে হবসের সাথে লকের (১৬৩২-১৭০৪) কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু ফিলমারের সমালোচনার আড়ালে তিনি রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তার প্রবক্তা হবসের বিরোধিতা করেন। ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষণ ও অলঙ্ঘনীয়তার যে ধ্বনিটা ছিল সতেরো শতকের ইংরেজ বুর্জোয়ার কাছে অতি জরুরি, রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে অবিরাম সংঘাতের মূল কারণ, সেটাকে লক স্রেফ তুলে ধরেছেন তাঁর তাত্ত্বিক পটে। Locke's theory of property explains the necessity for the transition from the state of nature to civil society[২৬] এবং state of nature বলতে Locke বুঝিয়েছেন before the advent of civil society.[২৭] সম্পত্তির ব্যাপারে লকের ধারণা বুর্জোয়া চরিত্র অসাধারণ প্রকট।[২৮] তাকে গণ্য করা হয়েছে প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সমর্থক বলে। লকের কাছে চুক্তির যে মর্মার্থ তা হবসের ধারণা থেকে ভিন্ন। সামাজিক চুক্তিতে উদ্ভব হচ্ছে রাষ্ট্রের, যাকে লক, নাগরিক সমাজ (Civil society) ও রাজনৈতিক সমাজ (Political society) বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯] সমাজের সঙ্গে, নাগরিকের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পর্কই হলো লকের আলোচনায় বিষয়বস্তু। লক 'নাগরিক সমাজ' (civil society) 'রাজনৈতিক সমাজ' (Political society) ও 'রাষ্ট্র' (State) একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যুক্তির অনুসরণে তিনি রাষ্ট্রকে দেখেছেন নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসেবে, তার যে একটা স্বাধীন তাৎপর্য আছে, তার যথার্থ মূল্যায়ন করেন নি, পরবর্তীকালে যা করেছেন রুশো ও হেগেল।[৩০] লক ও রুশোর চিন্তার এক অভিন্নতা হলো এই যে, নৈতিক বৈধতা ও শক্তি হলো স্বতন্ত্র।[৩১] ইংল্যান্ডের ১৬৮৮ সালের বুর্জোয়া 'গৌরবোজ্জল বিপ্লবের' তাত্ত্বিক হলেন লক। যেমন ধর্মে, তেমনি রাজনীতিতে লক ছিলেন ১৮৬৬ সালের শ্রেণিগত আপোষের সন্তান।[৩২] তবুও তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজে উল্লম্ফনকে জ্বলজ্বলে ও

সঙ্গতিশীল রূপে মূর্ত করে তুলেছেন।

রাজনীতি ও সম্পত্তি বিষয়ে লকের মূল্যায়নে মার্কস বলেন, বুর্জোয়া সমাজের আইনি ধারণায় ক্লাসিকাল অভিব্যক্তি তিনি।[৩৩] লকের তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে কার্পেন্টার বলেন, The theory proved admirably suited to the practical politics of the eighteenth and nineteenth centuries.[৩৪]

বিখ্যাত সামাজিক চুক্তির মতবাদ রুশোতে (১৭১২-১৭৭৮) বিস্তৃত ও পরিণিত হয়েছে। যদিও বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যায় তা দীর্ঘকাল ধরে যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।[৩৫] রুশোর মতো অসাম্যের ভিত্তিতে গঠিত যে সমাজ এবং যে সমাজের অস্তিত্ব জন্ম দেয় অপরাধ, যুদ্ধ, হত্যা আর বীভৎস অবস্থার সেই হল 'সিভিল সোসাইটি' বা 'নাগরিক সমাজ'। It is how that someone among rich, aware of the constant danger to his property and wretched condition of the people, suggests a contract for establishment of civil society.[৩৬] তিনি মনে করেন অসাম্য আবির্ভাবের প্রথম পর্যায় হল সম্পত্তির উদয়। প্রথম যে লোকটা এক খণ্ড জমিতে বেড়া তুলে ঘোষণা করার কথা ভাবল: এটা আমার, এবং সেটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট সহজ সরল লোকও পেল, সেই হল সিভিল সোসাইটির সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা।[৩৭] Man is naturally free, and civil society takes his freedom away from him; he is dependent on law, and the law is made in favor of the rich-atleast in its origin it was meant to favor them.[৩৮] রুশো বলেন, Look in the motives which have induced men, once united by their common needs in a general society, to unite themselves still more intimately by means of civil societies: you will find no other motive than that of assuring the property.[৩৯] অসাম্যের উদ্ভব বিষয়ে বিচার এ রুশো রাষ্ট্রের উদ্ভবের তত্ত্ব বিকশিত করেন। তিনি দেখান ব্যক্তিগত মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের শতবদ্ধতা, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র বুঝতে পারেন নি, রাষ্ট্র যে উৎপীড়নমূলক কাজ চালায় মনীষী সেটাকে দেখেন রাষ্ট্রের সত্যিকার কাজ থেকে বিচ্যুতি, ধনীদের চক্রান্তের ফল বলে।[৪০] রুশোর রাজনৈতিক আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তার সামাজিক আদর্শের সঙ্গে। ক্ষুদ্র উৎপাদকের স্বার্থ প্রতিফলিত করে তিনি সমমাত্রিক বণ্টনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।[৪১] রুশো সাম্যবাদী ভাবধারা ও তার আন্দোলন সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থাকা সত্ত্বেও সেদিকে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন নি। কারণ রুশো তাঁর Political Economy তে বলেন It is certain that the right of property is most sacred of all rights than liberty itself, ... property is the true foundation of civil society.[৪২]...রুশোর এই অভিমত সম্পর্কে Strauss বলেন Private property is almost inextricably found up with civil society and attaches men to it.[৪৩]

ফান্সে মেসলিয়ার (Meslier), মাবরি (Mably) ও মরেলি (Morelly) থেকে বাবেফ পর্যন্ত শক্তিশালী সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাবেফ ও তার

ঘনিষ্ঠ সহযোগী আলেকজান্ডার ডার্থেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় রুশোর কোন অবদানই ছিল না।[৪৪] তবু জ্যাকোবিনদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে ও ফরাসি বিপ্লবে রুশোর প্রভাব ছিল বিরাট। এঙ্গেলস মনে করেছেন রুশোর সমতার দাবি বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দেলনে প্রচারমূলক ভূমিকা পালনে সাহায্য করেছিল।[৪৫]

৪

মেকিয়াভেলীর *দ্য প্রিন্স* প্রকাশিত হওয়ার তিন'শ বছর ও রুশোর মৃত্যুর বিয়াল্লিশ বছর পর হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) আইনের দর্শন প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে। রাজনৈতিক মতবাদের গোটা ইতিহাসের মধ্যে অসামান্য একটি রচনা রাষ্ট্র, আইন, সমাজ বিষয়ে হেগেল তাঁর মতবাদ প্রণালীবদ্ধ রূপে সংরচিত করেছেন আইনের দর্শনে।[৪৬] 'নাগরিক সমাজ' ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন হেগেল। স্বকীয়তা সত্ত্বেও পূর্বসূরিদের দ্বারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হন। 'নাগরিক সমাজ' বলতে মূলত ধরা হয়েছে 'বুর্জোয়া সমাজকে'।[৪৭] তিনি লিখেছেন, The creation of civil society is the achievement of the modern world which has for the first time given all determinations of the idea their due. If the state is represented as a unity of different persons, as a unity which in only a partnership, then what is really meant is civil society.[৪৮] হেগেলের নাগরিক সমাজে স্বাধীনতা তখনো অর্জিত হয় নি, কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থ—সংঘাতের ভৌত শক্তি সীমিত হচ্ছে সাধারণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার দ্বারা সুবিবেচনায় নয়, আপতিকতায়।[৪৯] হেগেল বলেন, When luxury is at its height, distress and depravity are equally extreme.[৫০] কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগরিক সমাজের অগ্রগতি হতে পারে, When civil society is in a state of unimpeded activity, it is engaged in expanading internally in population and industry.[৫১] কিন্তু তবুও...despite an excess wealth civil society is not rich enough, i.e. its own resources are insufficient to check excessive poverty and creation of a penurious rabble,[৫২] ফলে এই সমাজের দ্বান্দ্বিকতায় তাকে বাধ্য করে নিজের পরিসীমার বাইরে যেতে, This inner dialectic of a civil society thus drives it ... or at any rate drives a civil society—to push beyound its own limits and seek markets, and so its necessary means of subsistence, in other lands, civil society is thus driven to found colonies,[৫৩] হেগেলের বর্ণনায় নাগরিক সমাজ হল বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত, বিপরীত স্বার্থে বিদীর্ণ—বৈরী সমাজ। Civil society is the battlefield where everyone's individual private interest meets everyone else's, এবং অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধ সংগঠিত হওয়া এই সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য—ফলে A penal code, then is primarily the child of its age and the state of civil

society at the time.[৫৪]

হেগেলের নাগরিক সমাজের তিনটি প্রধান দিক হলঃ System of needs (চাহিদার ব্যবস্থা), Administration justice (ন্যায়বিচার), Police & Corporation (পুলিশ ও কর্পোরেশন/নিগম)।

হেগেলের প্রধান আগ্রহ ছিল, civil and economic."[৫৫] এবং দ্বান্দ্বিকতার ভিত্তিতে চলমান অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনায়। তিনি বার্গার ও তাদের সমাজকেই কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। Individuals in their capacity as burgers in this state are private persons whose end is their own interest.[৫৬]

তিনি বলেন, In (abstract) right, what we had before us was person, in the sphere of morality, the subject, in the family, the family member, in the civil society as a whole, the burger or bourgeoisie,[৫৭]

এবং এই Burger-bourgeoisie, burger of a town as distinct from the citizen (citoyen) of a state civil society (burgerliche gesellschaft) is a society of burgers or civilians.[৫৮]

পঞ্চদশ শতকের মধ্যে থেকে সমগ্র রেনেসাঁ যুগ মূলতই নগরের অতএব বার্গারদের নাগরিকদের অবদান, তেমনি পরবর্তী নব জাগ্রত দর্শনের বেলাতেও একই কথা। তবে বিষয়বস্তু মূলতই হল ছোট ও মাঝারি বার্গারদের পক্ষে বড় বুর্জোয়ায় বিকশিত হবার পর্যায়োপযোগী চিন্তার দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। (এঙ্গেলস, *ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান*)

নাগরিক সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে হেগেল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রসংগটি উথাপন করেছেন এবং এ ব্যাপারে এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো ও জ.ব. সেইয়ের ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। Political economy সম্পর্কে তিনি বলেন This is one of the sciences which have arisen out of the conditions of the modern world.[৫৯] 'নাগরিক সমাজ' যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র সেটা বুঝতে হেগের Adam smith'র অবদানকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। Hegel derived from Smith the theory of progress and the notion of civil society which he used in his theory of the state. Hence a definition of political economy as the theory of civil society is still broadly valid.[৬০]

নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে হেগেল আইন প্রণয়ন, আদালত ও পুলিশের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন তা আসলে রাষ্ট্রেরই ক্ষেত্র। নাগরিক সমাজকে অবশ্য হেগেল external state বলেছেন, রাষ্ট্রেরই প্রসারিত এলাকা হল, নাগরিক সমাজ; সেই অর্থে Civil society is the state.[৬১]

হেগেল রাষ্ট্রকে গণ্য করেছেন নাগরিক সমাজের ভিত্তি হিসেবে। তিনি মনে

করেন রাষ্ট্র রূপ ভাবসত্তাটাই নিজেকে বিভক্ত করে দু'দিকে। It is within the state that family is first developed into civil society, and it is the idea of state itself which disrupts itself into these two moments.[৬২]

সুতরাং হেগেলের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য হল রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে অরাষ্ট্রীয় সমাজ (civil society) হতে শ্রেষ্ঠ। তিনি সমগ্র সমাজ প্রক্রিয়ার রাষ্ট্রের মধ্যেই একমাত্র নৈতিক উপাদানকে প্রত্যক্ষ করেছেন যা অরাষ্ট্রীয় সমাজের অরাজকতা সহজেই দূর করতে পারে। হেগেল ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজনৈতিক চিন্তায় ছিলেন খাঁটি বুর্জোয়া ; ফলে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রতি তাঁর সহজাত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় সমাজের সম্পর্ক হল পারস্পরিক।[৬৩]

মার্কসের প্রথম দিককার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখাটিই ছিল (১৮৪৩-৪৪) Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. এই লেখাটি মার্কস বিস্তৃতভাবে সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্র নিয়ে হেগেলের বক্তব্যের পর্যালোচনা করেন এবং সম্পূর্ণ এক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৬৪] মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে বিপ্লবী গণতন্ত্রী থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্বের শুরু ছিল এই সময়টা। মার্কস-এঙ্গেলসের প্রথমদিককার অনেক রচনাতে সিভিল সোসাইটি প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা থাকলেও পরের দিককার গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলিতে এ বিষয়ে খুব কমই মন্তব্য পাওয়া যায়।[৬৫] পরবর্তী সময়ে হেগেলের বক্তব্যর বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় মার্কস কি ধরনের সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন তা বলতে যেয়ে এঙ্গেলস বলেন, Proceeding from the Hegelian philosophy Marx came to the conclusion that it was not the state which Hegel had described as the 'top of the edific but 'civil society' which Hegel has regarded with disdain that was sphere in which a key to the understanding of the process of historical development of mankind should be looked for.[৬৬]

এঙ্গেলস আরো বলেন, It is not the state which conditions and regulates civil society but civil society which conditions and regulates the state; and consequently, that policy and its history are to be explained from the economic relation and their development and not vice versa. এবং Therefore, here at least, the state- the political order is the subordinate, and civil society–the realm of economic–the decisive element. The traditional conception to which Hegel, too, pays homage, saw in the state the determining element, and in civil society the element determined by it, … If we enquire into this we discover that in modern history he will of the state is, on the whole, determined by the changing needs of civil society, by the supremacy of this or that class, in the last resort, by the development of the productive forces and relation of exchange.[৬৭]

[রাষ্ট্র নাগরিক সমাজকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না বরং নাগরিক সমাজই রাষ্ট্রকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার বিকাশ থেকেই রাজনীতি ও ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিপরীতভাবে নয় এবং অতএব অন্তত এই ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল গৌণ, এবং নাগরিক সমাজ, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটাই হল নির্ধারক। হেগেল ও তার চিরাচরিত ধারণাকে শ্রদ্ধা করেছেন, সেই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র হল নির্ধারক বস্তু এবং নাগরিক সমাজ হল তার দ্বারা নির্ধারিত।
এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নাগরিক সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদার দ্বারা, এই শ্রেণি বা ঐ শ্রেণির কর্তৃত্ব দ্বারা, শেষ বিচারে উৎপাদন শক্তির ও বিনিময় সম্পর্কের বিকাশ দ্বারা।]

মার্কস নিজে ১৮৫৯ সালে, *অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে* গ্রন্থের ভূমিকাতে ১৮৪৪ সালে তিনি অধিকার সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা মারফত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, My investigation led to the conclusion that legal relations as well as forms of state are to be grasped neither from themselves nor from so-called general development of the human mind, but rather have their roots in the material conditions of life, the sum total of which Hegel, following the example of the Englishmen and Frenchmen of the eighteenth century, combines under name of 'civil society'; that however, the anatomy of civil society is to be sought in political economy.[৬৮]

[আমার অনুসন্ধান থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, বিভিন্ন আইনগত সম্পর্কের তথা বিভিন্ন রাষ্ট্ররূপের অনুধাবন করতে হলে সেই সম্পর্ক ও রূপ দেখেই বা মানব মনের তথাকথিত সাধারণ বিকাশ দেখেই তা সম্ভব হয় না; এদের মূলে রয়েছে বরং মানব জীবনের বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে, যার সমস্তটাতে একত্র করে হেগেল আঠারো শতকের ইংরেজ ও ফরাসিদের দৃষ্টান্তর অনুসরণের নাম দিয়েছেন নাগরিক সমাজ বা (Civil society), কিন্তু এই নাগরিক সমাজের শারীর সংস্থান খুঁজে বার করতে হবে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে।]

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে হেগেল ও মার্কস এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বোঝা গেলেও 'সিভিল সোসাইটি' বলতে মার্কস-এঙ্গেলস প্রথম থেকেই কি বুঝেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ১৮৪৫-৪৬ সালে *জার্মান ভাবাদর্শ* গ্রন্থে উভয়ে বলেন, The term `civil society', *(burgerliche gesellschaft) emerged in the eighteenth century, when property relationship had already extricated themselves from the ancient and medieval communal society, civil society as such only develops with the bourgeoise, the so-

cial organization evolving directly out of production and commerce, which in all ages forms the basis of the state and rest of the idealistic superstructure, has however, always been designated by the same name. Note এ বলা হয়েছে 'burgerliche gesellschaft' can mean either 'bourgeoise society' or 'civil society'[৬৯]

> [সিভিল সোসাইটি প্রত্যয়টির উদ্ভব হয় আঠারো শতকে যখন সম্পত্তি-সম্পর্ক নিজেকে নিযুক্ত করে এনেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় যৌথ/এজমালি সমাজ থেকে। সিভিল সোসাইটি উৎপাদন ও বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্য দিয়ে কেবল বুর্জোয়াদের সাথেই বিকশিত হয়—যা সকল যুগেই গঠন করে থাকে রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং অবশিষ্ট ভাববাদী উপরিকাঠামো; যা একই নামে অভিহিত করা যায়।]

সুতরাং যাহা 'সিভিল সোসাইটি' তাহাই 'বুর্জোয়া সোসাইটি'।

১৮৪৬ সালেই মার্কস লিখলেন, What is society, whatever its form may be? The product of men's reciprocal action. Are men's free to choose this or that form of society? by no means, assume a particular level of development of men's productive forces and you will get a particular form of commerce and consumption and you will have a corresponding social system, a corresponding organization of the family, of social estates or of classes, in a word, corresponding civil society. Assume such a society and you will get a political system appropriate to it, a system which only official expression of civil society.[৭০]

> [সমাজের রূপ যাই হোক না কেন, সমাজটি কি? মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। খুশিমতো সমাজ বেছে নেবার ক্ষমতা কি মানুষের আছে? কোন মতেই না। মানুষের উৎপাদন শক্তির বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে এরা পাবে বাণিজ্য ও পণ্যভোগের একটি ঠিক তদনুযায়ী রূপ। উৎপাদন বাণিজ্য ও পণ্যভোগের বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ের কথা ধরে নিলেই এসে যাবে সামাজিক গঠনের একটি তদনুযায়ী প্রথা; পরিবারবর্গ বা শ্রেণি সংগঠনের তদনুযায়ী রূপ, এক কথায় একটি তদনুযায়ী নাগরিক সমাজ। একটি বিশেষ নাগরিক সমাজের সরকারি অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।]

সমাজ বিকাশের ধারা বুর্জোয়া সমাজের যে অভ্যুদয় তা গড়ে উঠে সামন্ত সমাজের ভাঙনের প্রক্রিয়ায় এবং এই যে Change from feudal to bourgeoise society তা অনুধাবন করতে মার্কস এঙ্গেল্‌স Mode of Production এর উপর জোর দিয়েছেন। এই বিষয়টির ফয়সালা মার্কস এঙ্গেলস *জার্মান ভাবাদর্শেই* সেরে ফেলেন—যা ক্রমাগত বিকশিত হয়ে চলেছিল।

উপরে এঙ্গেলসের 'economic relation and development,' 'civil society .... ralm of economic' ও 'the development of productive forces and

relation of exchange' এবং মার্কসের 'The anatomy of civil society is to be sought in political economy' সহ এই ধরনের আরা সব বক্তব্য Capitalist Mode of Production সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা যায়।

মার্কসের ভাষায়, The mode of Production of material life conditions the general character of the social, political and intellectual life process in general, (বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে)[৭১] আর এই Mode of Production represents the unity of two closely interrelated elements: the productive forces and the relations of production. (উৎপাদন পদ্ধতি প্রতিনিধিত্ব করে দুইটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্যের উপাদানকে: উৎপাদন শক্তিসমূহ এবং উৎপাদন সম্পর্ক/সম্পত্তি সম্পর্ক)[৭২] মার্কসীয় এই termটি has since been elaborated as the core element of a systematic account of history as the succession of different modes of production[৭৩] এবং যা হল one of the most important categories of historical materialism.[৭৪] এই দুটি বিষয়ের পর্যালোচনা স্বভাবতই সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, Base and superstructure সংক্রান্ত এই মার্কসীয় প্রত্যয়টির সাথে। The building like metaphor of base and superstructure is used by Marx and Engels to propound the idea that the economic structure of society (the base) conditions the existence and forms of state and social consciousness (superstructure).[৭৫] সিভিল সোসাইটি/নাগরিক সমাজ বা বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয় ও বিকাশের গতির নিয়মের সূত্রসমূহ যথাযথভাবে বুঝতে গেলে উপরোক্ত বিষয়গুলির পর্যালোচনা অতি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে—যদিও এখানে সে অবকাশ নেই। স্বল্প পরিসরে যে বিষয়টি একান্তই পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হলো মার্কস-এঙ্গেলস 'civil society' ও 'bourgeoise society' সমার্থক মনে করেছেন—তার বেশি কিছু নয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমাজে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির একটি যথাযথ বুর্জোয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অবশ্য উপরোক্ত বিষয়ে বিশেষ করে, *অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে* (১৮৫৯) গ্রন্থের ভূমিকাতে মার্কস যে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি হাজির করেন তা নিয়ে অদ্যাবধি যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক অব্যাহত আছে তা মার্কসের মৃত্যুর পর যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির কারণ হিসেবে দেখা দেওয়াতে পরবর্তী সময়ে এঙ্গেলস প্রধানত তার একাধিক পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে তুলে ধরেন। যেমন, এই সব পত্রাবলির একটিতে তিনি উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক—শিল্পগত ইত্যাদির বিকাশ ঘটে অর্থনৈতিক বিকাশকেই ভিত্তি করে। কিন্তু এদের সবগুলিই পরস্পরের উপর এবং অর্থনীতির উপরও ক্রিয়া করে। অর্থনৈতিক ভিত্তিই হল একমাত্র সক্রিয় কারণ, অন্য সবকিছু নিষ্ক্রিয় ফলাফল মাত্র মোটেও তা নয়।[৭৬]

নাগরিক সমাজ বা বুর্জোয়া সমাজ কখনোই অবিভাজ্য বা এককাট্টা নয়— বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় শাসক শ্রেণি হিসেবে যেমন বুর্জোয়া তেমনি সব থেকে শোষিত ও প্রতিপক্ষ শ্রেণি হিসেবে প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন হয়েছে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে তেমনি তার প্রতিপক্ষ শ্রেণি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণিকে ক্ষমতাসীন হতে হবে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমেই। Bourgeoisie and proletariat both arose in the consequence of a transformation of the economic conditions, more precisely of the mode of production.[৭৭] সন্দেহ নেই এই সমাজে বুর্জোয়ারাই অধিপতি শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণি তার প্রতিপক্ষ কিন্তু শুধুমাত্র দুটি শ্রেণি নিয়েই বুর্জোয়া সমাজ গঠিত নয়। এই বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্য কি? এঙ্গেলস বলেন, বড় বড় পুঁজিপতিদের শ্রেণি, সেটা সমস্ত সভ্য দেশে ইতোমধ্যে প্রায় সমগ্রভাবেই সমস্ত জীবনোপায় এবং এইসব জীবনোপায় উৎপাদনের জন্য আবশ্যক কাঁচামাল, আর সাধিত্রের (যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, ইত্যাদির) মালিক। এই হল বুর্জোয়া শ্রেণি বা বুর্জোয়ারা (bourgeoisie);[৭৮] And as the class of modern capitalists, owners of the means of production and employers of wage labour.[৭৯] এবং এই অর্থে The Bourgeoise, as in this sense the economically dominant class which also controls the state apparatus and cultural production, stands in opposition to and in conflict with the working class, but between these two great classes of modern society there are 'intermediate and transitional strata' which Marx also referred to as middle class,[৮০] স্পষ্টতই Dominant class হিসেবে শিল্প বুর্জোয়াদের কথাই বলা হচ্ছে, অর্থাৎ তখনই পূর্ণাঙ্গ সিভিল সোসাইটি যখন শিল্প বুর্জোয়ারা সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃত অধিপতি শ্রেণি।

'সিভিল সোসাইটি' প্রসঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা শেষে মার্কস এঙ্গেলস এই ঘোষণা দেন যে, শ্রমিক শ্রেণি তথা মেহনতি জনগণের কর্তব্য হল একে ধ্বংস করা। ১৮৪৩-৪৪ সালেই মার্কস বলেন, acquire genuine freedom by the throwing off the imposition of both the bureaucratically organized state and of a civil society resting on the egostic principles of private property. এবং for a new constitution a real revolution has always been required। তিনি প্রলেতারিয়েতকেই চিহ্নিত করেন সেই অগ্রগামী বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে যারা সিভিল সোসাইটি উৎখাতে আগুয়ান হবে।[৮১] মার্কস *Poverty of Philosophy* তে বলেন, in the course of its development, the working class will replace civil society with an association which will abolish classes and their anatagonisms.। মোদ্দা কথা হল মার্কস এঙ্গেলস সিভিল সোসাইটি ও বুর্জোয়া সমাজকে সমার্থক মনে করেছেন ও তার উৎখাতের আহবান জানিয়েছেন। For the conflict of civil society to be truly superseded and for the full potential of human beings to be realized both civil society and its product, political society, must be abolished, necessitating a social as well a political revolution to liberate mankind.[৮২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে ইতালিয়ান কমিউনিস্ট নেতা গ্রামশি (Antonio Gramsci) রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কস এঙ্গেলসের বক্তব্যকে ইতালির অভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আর এই আলোচনাতে অত্যন্ত বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন 'সিভিল সোসাইটি'কে। তিনি রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটি সংক্রান্ত ধারণাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। Although Gramsci continues to use the term to refer to the private or non-state sphere, including the economy, his picture of civil society is very different from that of Marx.[৮৩]

এই নিবন্ধে তুলনামূলক পর্যালোচনা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। তবে এ বিষয়ে সরাসরি গ্রামশির বক্তব্যে প্রবেশের আগে এই কথাটা বলে রাখা ভালো যে, গ্রামশিকে নিয়ে প্রধানত ইউরোপে কয়েকদশক ধরেই নানাভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা তথা ভারতে গ্রামশি চর্চার বেশ অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশে তুলনামূলক কম চর্চা হয়েছে। ভারতে রণজিৎ গুহরা গ্রামশির বক্তব্যের আলোকে subaltern studies সিরিজ রচনা করেছেন ও বিপানচন্দ্র মূল্যায়ন করেছেন গান্ধি ও কংগ্রেসের। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামশির প্রতি আন্তরিক থাকা এক জিনিস এবং নিজেদেরকে গ্রামশিবাদী মনে করে মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন আর এক জিনিস। গ্রামশিবাদীরা মনে করেন বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিধারা বুঝতে ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণে গ্রামশি অপরিহার্য ও অনিবার্য। এরা মনে করেন এঙ্গেলসই প্রথম মার্কসের মতবাদকে যান্ত্রিক ও নিয়তিবাদে পরিণত করেন এবং স্ট্যালিন এই পথ ধরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের কবর রচনা করেছেন। এরা মার্কসকে এঙ্গেলস থেকে আলাদা করে বিচার করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। তা ছাড়া ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হচ্ছে এই কংগ্রেসে স্ট্যালিনের সমালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গণতন্ত্রের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচিত হতে শুরু করে এবং এভাবেই গ্রামশি চিহ্নিত হন মার্কসবাদের বিকাশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার স্রষ্টা হিসেবে।

যাহোক, আমি নিচে শুধু গ্রামশির সুবিখ্যাত *Selections from the Prison Notebooks* (1978) থেকে রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটি বিষয়ে তাঁর মতামতের কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।[৮৪]

"...What we can do, for the moment, is to fix two major superstructaral 'levels' : the one that called 'civil society', that is the ensemble of organism commonly called 'private', and that of 'political society' or 'the state', These two levels correspond on the one hand to function of 'hegemony' which the dominant group exercises throughout society and on the other hand to function of 'hegemony' which the dominant group exercises throughout sociely and on the other hand to that

of 'direct domination' or command exercised through the state 'juridical' government. The functions in question are precisely organizational and connective. The intellectuals are the dominant groups 'deputies' exercising the subaltern functions of social hegemony and political government."P.12

[আপাতত আমরা একটা কাজ করতে পারি; সমাজের উপরের ঘরে আমরা দুই দুইটা তলা আলাদা করতে পারি; এক তলার নাম 'নাগরিক সমাজ'- সমাজদেহের যে অংশকে 'অন্দর' বলা হয়ে থাকে সেই অংশ; আর অন্য তলার নাম রাজ্যসমাজ বা রাষ্ট্র। এই দুই তলার সঙ্গে তুলনীয় হবে একদিকে সমাজের প্রভুশ্রেণী সারা সমাজ জুড়ে যে 'আধিপত্য' বিস্তার করে সেই আধিপত্যের কর্মকাণ্ড এবং অন্যদিকের রাষ্ট্রের বিধিসম্মত সরকারের তরফে একই শ্রেণি 'সরাসরি প্রভুত্ব' বা হুকুমদারির জন্য যে সকল কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নেয় সেই সব। উভয় ধরনের কর্মকাণ্ডই খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে আসলে সংগঠন ও সংযোগের ব্যাপার। সামাজিক আধিপত্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রবর্তন করতে যে সকল মুখপাত্রের ডাক পড়ে বুদ্ধিজীবীরা সেই মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন; তাদের কর্মকাণ্ড অধিপতি শ্রেণীর অধীনস্থ কর্মচারীর ভূমিকা পালন করার সামিল।]

... ".Since in actual reality civil society and state are one and the same, it must be made clear that laisses faire too is a form of state 'regulation', introduced and maintained by legislative and coercive means." P-160

[... প্রকৃত প্রস্তাবে নাগরিক সমাজ যে জিনিস রাষ্ট্রও সেই জিনিসই , এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। সুতরাং অবাধ বাণিজ্য নীতিও যে এক ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি একথা পরিষ্কার উপলব্ধি করা দরকার। এই নীতি আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয় আর শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে জারি রাখতে হয়।] (পৃ. ১৬০)

"....the general notion of state includes elements which need to be referred back to the notion of civil society (in the sense that one might say that state = political society + civil society, in otherwords hegemony protected by the armour of coercion)." P-263

[...সাধারণভাবে রাষ্ট্র বলতে যা বোঝান হয়ে থাকে তার ভেতর পড়ে এমন সব উপাদান যার উৎস পাওয়া যাবে যাকে বলা হয় নাগরিক সমাজ তার ভেতরে (যে অর্থে রাষ্ট্র= রাজ্যসমাজ +নাগরিক সমাজ বলা হয় সেই অর্থে বা অন্য কথায়,বলা যায়,[রাষ্ট্র মানে] শক্তি প্রয়োগের কর্ম দিয়ে ঘিরে রাখা আধিপত্য)।] (পৃ. ২৬৩)

"...two forms in which the state presents itself in the language and culture of specific epochs, i.e. as civil society and as political society..." P-268

[... বিশেষ বিশেষ যুগের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুসারে রাষ্ট্রের পরিচয় দেওয়া হয় দুই বিশেষ চেহারায়; এক চেহারার নাম নাগরিক সমাজ আর অন্যটার নাম রাজ্য সমাজ।] (পৃ. ২৬৮)

"...The basis for the state in the narrow sense of governmental coerive apparatus." p-265

[কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগের যন্ত্র এই সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রের ভিত্তি...] (পৃ. ২৬৫)

"The states does have and request consent, but it also 'educates' this consent, by means of political and syndical associations; these, however, are private organism, left to the private initiative of the ruling class. P-259

[সম্মতি নিয়েই রাষ্ট্র এবং সম্মতির সন্ধানে থাকে রাষ্ট্র, তবে এই সম্মতি তৈরিও করে রাষ্ট্র, করে দেশব্যাপীও গোষ্ঠীগত সভাসমিতির ভিত্তিতে। এইসব সভাসমিতি কিন্তু অন্দরের অঙ্গ, শাসকশ্রেণীর অন্দর মহল থেকেই এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।] (পৃ. ২৫৯)

"...In the case of the most advanced states, where "civil society" has become a very complex structure and one which is resistant to the catastrophic 'incursions' of the immediate economic element (crises, depression, etc). The superstructures of civil society are like the trench system of modern walfare." p-235

[যে সকল রাষ্ট্র অনেক বেশি উন্নত সেই সব রাষ্ট্রের বেলায় দেখা যায় 'নাগরিক সমাজ' সাংঘাতিক জটিল দালানে পরিণত হয়েছে আর হুমড়ি খেয়ে পড়া অর্থনৈতিক বিষয় (সংকট মন্দা ইত্যাদি) থেকে আগত মারাত্মকভাবে ভূমিকম্পটিও তার ভিত নড়াতে পারে না। নাগরিক সমাজের উপরের বাড়িগুলিকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার পরিখা পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা চলে।] (পৃ. ২৩৫)

"The massive structures of the modern democracies, both as state organization, and as complexes of associations in civil society, constitute for the art of politics as if it were the "trenches" and the permanent fortifications of the front in the war of position : they render merely 'partial' the element of movement which before used to be 'the whole' of war etc."

[আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সুবিস্তৃত দালানকোঠা—তা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই হোক আর নাগরিক সমাজভুক্ত সভাসমিতি হিসেবেই হোক—রাজনীতি বিদ্যার ক্ষেত্রে 'পরিখা' এবং মুখোমুখি যুদ্ধক্ষেত্রে নির্মিত চিরস্থায়ী দুর্গের মতন: এককালে যুদ্ধ বলতেই বোঝাতো সৈন্য বাহিনীর ছোটাছুটি, এইসব পরিখা ও দুর্গ এখন সেই ছোটাছুটির ভূমিকা ছোট করে ফেলেছে, 'একাংশে' পর্যবসিত করেছে।]

This question is posed for modern states, but not for backward countries or for colonies. P-243

[এ কথা শুধু আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই খাটে, পশ্চাৎপদ দেশ বা উপনিবেশের বেলায় খাটে না] (পৃ. ২৪৩)

In the phase of struggle for hegemony it is the science of politics which is developed, if one is not to risk the dissolution of the state. p-404

[আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যখন চলে সেই সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই বিকাশ ঘটে; অন্যথায় রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়ার বিপদ দেখা দেয়।] (পৃ. ৪০৪)

Lawrence and Whishart-এর প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদক ও সম্পাদকদ্বয় State & Civil Society অধ্যায়ের Introduction-এ বলেছেন, what is, however, true is that Gramsci did not succeed, in finding a single, wholly satisfactory conception of 'civil society' or the state. (p-207)

In his notes, the metaphors he uses to describe the precise relationship between the state and civil society vary.[৮৫] গ্রামশি মনে করেন, any distinction between civil society and the state is only methodological.[৮৬]

গ্রামশির কাছে আধিপত্য ও একনায়কত্বের ধারণা এবং নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যেকার পার্থক্যটি শুধুমাত্র পদ্ধতিগত, মৌলিক নয়।[৮৭]

পশ্চিমের দেশগুলোতে, পুঁজিবাদ যেখানে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত, সেইসব দেশে তিনি অসংখ্য অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে গঠিত উন্নত নাগরিক সমাজের এমন এক কার্যকর ভূমিকার কথা বিশ্লেষণ করেছেন যা অনেকখানি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার মজবুত বেষ্টনী। ধন্যবাদ যে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পেরেছে তার অন্যতম কারণ হল এই নাগরিক সমাজ। নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনকে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুঁজিবাদ নিজেদের মতাদর্শ বা স্বার্থের অনুকূলে নিপীড়িত মানুষের সম্মতি আদায় করে। নাগরিক সমাজের মাধ্যমে পুঁজিবাদের এই সূক্ষ্ম ও ঘৃণ্য কৌশলের ব্যবহারকে গ্রামশি বলেছেন, 'আধিপত্য'। আর 'প্রভুত্ব' হল রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের দিক। গ্রামশি 'প্রভুত্ব' ও 'আধিপত্য' শব্দ দুটির যে ব্যবহার করেছেন তা তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান দিক।

সহজভাবে বলতে গেলে এ হল 'area of consent' and 'area of constraint' (Botomore, 1966) 'আধিপত্য' হল নাগরিক সমাজ ও 'প্রভুত্ব' হল রাজনৈতিক সমাজ। তবে গ্রামশির কাছে 'আধিপত্যের' ধারণাটি একনায়কত্ব বা 'প্রভুত্বের' ধারণাটির চেয়ে অর্থের দিকে ব্যাপকতর। Most commentators agree that hegemony is the key concept in Gramsci's prison notebooks and his most important contribution to Marxist theory.[৮৮]

সুতরাং যেখানে a class maintains its dominance not simply through a special organization of force সেখানে অন্যকোন শ্রেণি বা প্রতিপক্ষ যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা করায়ত্ত করতে চায় তবে প্রয়োজন মতাদর্শগত লড়াই ও অন্যান্য তৎপরতা চালিয়ে সরাসরি আক্রমণ করে 'রাজনৈতিক সমাজ' কে দখল করার আগে আধিপত্যের প্রতীক 'নাগরিক সমাজ' কে কব্জা করা অর্থাৎ প্রথমে প্রয়োজন 'আধিপত্য' প্রতিষ্ঠা তারপর পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র দখল বা 'প্রভুত্ব' কায়েম করা।

গ্রামশির কথা হল ঠিক এই একই প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণিকেও ক্ষমতা দখলের পথে এগুতে হবে। শ্রমিক শ্রেণিকে আগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে 'আধিপত্য' তারপর কায়েম করতে হবে 'প্রভুত্ব'। This implies that the proletariate must create a continuous expansion of consent in which the interests of various groups come together to form a new historical block. A fully extended hegemony must rest on active consent, on a collective will in which various groups in society unite.[৮৯]

গ্রামশি 'পশ্চিমের' উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর জন্য এই যে বক্তব্য পেল করেছেন তা তিনি 'পূর্বের' বা 'যথাযথ' পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র নয়' এমন দেশে প্রযোজ্য বলে মনে করেন নি। যেখানে ইতিহাসগত কারণেই নাগরিক সমাজ মুখ্য ভূমিকায় যায় নি সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কর্মকৌশল ভিন্ন হবে বলে তিনি মনে করেছেন।

দুই

এখন যেটা দেখা দরকার তা হলো বাংলাদেশের মত একটি দেশে এনজিওরা কোন পরিস্থিতিতে ও কি উদ্দেশ্যে নাগরিক সমাজ নিয়ে জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে ও যথাসম্ভব সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তাকে দৃঢ়ভাবে সংহত করে একটা সামগ্রিক যুৎসই কর্মকাণ্ডের কাঠামো দাঁড় করাতে। আর কেনইবা নাগরিক সমাজের নামে এনজিও আয়োজিত সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি নাগরিক সমাজের একটা সংজ্ঞা প্রদান করলেন এবং নাগরিক সমাজের করণীয় কি হওয়া উচিত তার দিক নির্দেশনা দিলেন। এটাও উল্লেখ্য এই সম্মেলনের জাতীয় স্বাগতিক পর্যদের (National Host Committee) আহ্বায়ক ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং '৯৬ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর

রহমান।

এনজিওদের পক্ষ থেকে 'নাগরিক সমাজ' নিয়ে বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় ও বিরাট আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে আলোচনা, তা করতে হচ্ছে সম্মেলনে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হাজির করার মধ্য দিয়ে। এই বিতর্কের মাধ্যমেই নাগরিক সমাজ সম্পর্কে এনজিওদের পক্ষ থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান যেমন পরিষ্কার হয়েছে তেমনি ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন এবং এনজিও বিশেষজ্ঞ ও মার্কসের শিষ্য ফরহাদ মজহারের বক্তব্যের আলোকে অতঃপর আমার মন্তব্য উপস্থিত করা সংগত হবে বলে মনে করছি।

তবে এই আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অতিক্ষুদ্র হলেও একটা আলোক চিত্র থাকা দরকার—দরকার রাষ্ট্রপতির ভাষণের মূল দিকটা একটু খতিয়ে দেখা। স্বভাবতই এই চিত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত রাষ্ট্র ও রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি। অথচ সবদিক স্পর্শ করে যেতে গেলে অতি ক্ষুদ্র হলেও তা সম্ভব নয়। ফলে মাত্র দু'একটি বিষয়ের উপর কিছু মন্তব্য করতে হল এনজিওদের 'সিভিল সোসাইটি' বা 'নাগরিক সমাজ' নিয়ে যে আন্দোলন তার জাতীয় প্রেক্ষাপটটা অসম্পূর্ণ হলেও সামনে রাখার জন্য।

—একেবারেই আমলা কেন্দ্রিক (বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি যারা আর্থিক সুবিধার ভিত্তিতে কোন না কোনভাবে প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের সহ) বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোটি গড়ে তোলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। দীর্ঘদিন ধরে 'ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র' হিসেবে এই যন্ত্রটি গড়ে তোলা হয়। প্রথমাবধি এই রাষ্ট্রের চরিত্র গণবিরোধী। ১৯৭১ সালে জনগণের বিপুল রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও এই রাষ্ট্রযন্ত্রটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার নির্ভেজাল আনুগত্য ও গণবিরোধী চরিত্রটি শুধু বজায় রেখেছে তাই নয়—ক্রমাগত তার ঔদ্ধত্য ও দাপট বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্র নিজেই এক ধূর্ত ও নিষ্ঠুর শোষকে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু এ যাবৎকালের প্রতিটি সরকার ধারাবাহিকভাবে এই রাষ্ট্রের গণবিরোধী চরিত্রকে আরো শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে।

—১৯৪৭ থেকে ১৯৯৮। ৫০ বছর অতিক্রান্ত হল। বিশেষ করে ৬০-৭০ এর সময়টাতে নিজেই একজন সামান্য কর্মী হিসেবে জানি 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' এই আওয়াজ কোন দল বা গোষ্ঠী না তুললেও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এতো বছর পর এখন মনে হচ্ছে অলিখিতভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানে একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে—'সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক।'

এখন আবার গদগদ চিত্তে বলা হয় 'দাতা দেশ বা ডোনার'। অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়লদের বিরুদ্ধে কথা বলার কোন নৈতিক অধিকারও আর রাখা

যাবে না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের 'Consultant inlellceluals'দের ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদের তস্য দালালদের চেয়েও নিকৃষ্ট। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠিন শপথে উজ্জ্বল এক সময়ে ঘৃণার মুখ আজ আভূমি নত কৃতজ্ঞদাসের মুখে পরিণত। বিভিন্ন খাতে ও বিভিন্ন নামে 'দাতা'দের দান গ্রহণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে কথিত জাতির বিবেকরা।

—দেশের অর্থনীতিতে শিল্পায়নের বিপরীতে তাস্করিক বাণিজ্যায়নের (Predatory Commercialisation, বাগচী, ১৯৯৫, পৃ ২৬৪) প্রবল প্রতাপ, শিল্প-পুঁজি ও শিল্পপুঁজিপতিদের ভূমিকা সর্বত্র দুর্বল। জাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ লুটেরা ধনিক-বণিকরা দখল করে ফেলেছে—এদের লুম্পেন ধরনের আচরণে সমস্ত পরিবেশ আজ ভয়ঙ্কর রকমের কলুষিত। প্রতিনিয়ত রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে।

—কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক উপকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ও পুরানো সম্পত্তি সম্পর্কের ভাঙ্গন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মালিকানা সম্পর্কের কোন মৌলিক পরিবর্তন না হওয়াতে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের দুর্ভোগ চরমে। গ্রামের মানুষের এক বিরাট অংশ যেমন কৃষিতে থাকতে পারছে না তেমনি অকৃষি খাতে কোন সংগত সুরাহা না হওয়াতে ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভয়াবহ দারিদ্র্য পুরো অর্থনীতি তথা জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে।

—সংবিধানের ব্যবহারিক গুরুত্ব অতীতেও ছিল না বটে, তবে শাসকগোষ্ঠীর নিত্য প্রয়োজনে বর্তমানে এর গুরুত্ব টয়লেট পেপারের নিচে। কালো টাকা, পেশী শক্তি, ধর্মের ব্যবহার ও যে কোন ধরনের পন্থা অবলম্বনে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়াটা এখন সংসদীয় রাজনীতির সব থেকে গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত। স্বভাবতই এইসব সাংসদদের অতি নিকৃষ্ট আড্ডাখানা হচ্ছে সংসদ।

—শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনের দুরবস্থা, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, ঘুষ-দুর্নীতি, চোরাচালান, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, ধর্মের ব্যাপক রাজনৈতিক ব্যবহার, ফতোয়াবাজী প্রভৃতি বিষয় এতবেশি প্রকাশ্য ও প্রকট যে এখানে পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য আর এর স্বতন্ত্র বিবরণ দেওয়া গেল না।

—এবং সরকার? আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকার অনভিজ্ঞ, অযোগ্য, অদূরদর্শী ও আমলানির্ভর।[৯০] একথা অতীতের সব সরকার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবু এই কথা দিয়ে সত্যের মাত্র একাংশ প্রকাশ করা হয় বা মূল সত্য চাপা দেয়া হয়। বর্তমান সরকারসহ অতীতের প্রতিটি সরকারই হল মেহনতি মানুষের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী অত্যাচারী সরকার। প্রতিটি সরকারই প্রথম থেকেই শুরু করে গণবিরোধী কার্যক্রম। পুলিশ ও বিচারব্যবস্থাকে সরাসরি লাঠিয়াল বাহিনীর মতো ব্যবহার করা হয়—এসব জায়গায় সাধারণ মানুষ যেতেও ভয় পায়। প্রতিটি সরকারই দস্যু লুটেরাদের অবাধ অভিযান চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তদারকি কমিটি মাত্র।

দেশের এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এনজিও সম্মেলনে আহবান করলেন, 'সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র বিকাশের কাজে সুশীল সমাজ রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিদের সহায়তা দেয়।' সরকারের দলীয় কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক দলগুলিকে নয়—কারণ তাঁর মতে রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ফেয়ার এন্ড ফাউল গেমে বিশ্বাসী। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, একদিকে এনজিও প্রতিষ্ঠান ও অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মিলে দেশে গণতন্ত্র কায়েম করবে! রাষ্টপতি তার ভাষণে দেশের দুরবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিলেও সমাজের যে সব শ্রেণি ও গোষ্ঠী দেশকে শোষণের জাঁতাকলে নিঙড়ে নিঃশেষ করে এনেছে তারা ও তাদের আন্তর্জাতিক দোসরদের বিরুদ্ধে তেমন কোন অর্থবহ কথা বলেন নি। সহজভাবেই বোঝা যায় 'শ্রেণী শোষণ' ও 'রাষ্ট্রীয়শাসন' এই দুটি ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কোন আপত্তি নেই—থাকবার কথাও নয়। যে আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতির মতো 'পতিকুলের' (বিচারপতি, সেনাপতি, সচিব, আমলাপতি ইত্যাদি) 'প্রাক্তন' ও 'অবসরপ্রাপ্ত' হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে নিজেদের ও নিজ নিজ পরিবারকে ঠিকমতো গুছিয়ে নিতে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বা কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু তাই নয় যে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলছেন সেই রাজনীতিবিদদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে তিনি দুই দুইবার রাষ্ট্রপতি হলেন। এরপর থেকে দুর্নীতি ও বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলছেন সেই রাজনীতিবিদদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে দুই দুইবার রাষ্ট্রপতি হলেন। এরপর থেকে দুর্নীতি ও বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি নিয়ে যে সব কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে এই দেশে এই সবেমাত্র এসব ঘটছে এবং এটা হল তাঁর এক মহা বিবেকীয় আবিষ্কার। বিচারপতি থাকার সময় ও অবসরকালীন সময়ে তিনি হাজারো অন্যায়ের একটিরও কোন প্রতিবাদ করেন নি। আজ তিনি কথিত 'সুশীল সমাজ'কে আহবান জানাচ্ছেন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য, রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের সাথে জোট বেঁধে কাজ করার জন্য। কেন? তিনি মনে করেন এই প্রক্রিয়াতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে ও উন্নয়নের জোয়ার বইবে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেবার কত প্রচেষ্টা ও প্রতিশ্রুতিই না দেশবাসীকে সহ্য করতে হচ্ছে। আসলে রাষ্ট্র ও শোষকশ্রেণীকে সংহত ও সংকটমুক্ত দেখতেই রাষ্ট্রপতির আগ্রহ। ফলে যে শ্রেণির ভয়াবহ শোষণের জন্য দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত, যে রাষ্ট্রের হিংস্র নখ ও দাঁতের আক্রমণে সাধারণ মানুষ দিশেহারা তার কোন আমূল পরিবর্তনের আহবান তিনি দিতে পারেন নি—তিনি ক্ষুব্ধ, রাগ দেখিয়েছেন সবকিছুর বাড়াবাড়িতে। অতএব দরকার কিছুটা 'সাইজ' করা। দেশের মধ্যে যদি ক্রমাগত অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলার যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তাহলে এক চরম নৈরাজ্যিক অবস্থার মধ্যে দেশ চলে যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি চান শাসন চলুক, শোষণ চলুক, ভদ্রলোকেরা মহানিশ্চিন্তে আয়েশি জীবন যাপন করুক—এজন্যেই দরকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ—দুশ্চিন্তাহীন

নতুন জীবন। ঠিক এই জায়গাতে আমলা, উপরতলার বুদ্ধিজীবী, উঁচুপদের অবসরপ্রাপ্তরা, এনজিওদের একান্তই মিল। রাষ্ট্রপতি একজন সংস্কারকের ভাষায় দামিদামি কথাবার্তা বলে দেখাতে চান তিনি শ্রেণি, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেরদারদের কার্যক্রমের ঊর্ধ্বে বাস করেন। রাষ্ট্রপতি জানেন কিনা জানিনা তবে এসব অতি পুরাতন কেচ্ছা। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ভাষণ নিয়ে এত কথা বলতে হল কারণ প্রধানত এনজিওদের নেতৃত্ব এটা প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে যে, এখন তিনিই হলেন বাংলাদেশের 'জাতির বিবেক' ও 'দেশবরেণ্য'দের সর্বশ্রেষ্ঠ অফিসিয়াল রিপ্রেজেনটেটিভ।

বাম আন্দোলনের পিছুহটা অবস্থায় অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের নিদারুণ এক অবক্ষয়ের সময়কালে কথিত 'দাতাদেশ' ও ঐসব দেশের বিভিন্ন অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে চরিত্রগতভাবে চলমান শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে সংগঠিত শক্তি হিসেবে বাংলাদেশে এনজিও সেক্টরের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। শুরুতে যাই থাকুক না কেন বর্তমানে এদের প্রধান প্রতিনিধিরা দেশের সব থেকে সংগঠিত নব্য ধনিক গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এটা একটা বাস্তবতা।

উন্নতমানের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীর এরকম অস্তিত্ব মানে সেই শক্তি আরো বিকশিত হওয়ার স্বার্থে নিজেদের অনুকূলে চলতি ব্যবস্থার নানা দুর্বলতা ও অসংগতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে, প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবিও তুলতে পারে—নতুন কোন প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তির পক্ষে এই ধরনের কার্যকলাপ হঠাৎ বা সংগতিবিহীন নয়।

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যে হালচাল সেখানে 'দাতা' দেশ সমূহের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে নিজেদেরকে আরো বিকশিত করতে ও গৃহীত কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে এনজিওরা খুব নিশ্চিন্ত নন। তাঁরা চাচ্ছেন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে, রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষের যে সাধারণ ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে—তাহলেই তাঁরা পারবেন নিজেদের ইচ্ছেমতো সুন্দরভাবে সবকিছু সাজিয়ে নিতে, অন্তত সেটাই তাঁদের খায়েস। রাষ্ট্রপতি রাজনীতিবিদদের এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। স্পষ্টতই 'রাষ্ট্র', 'এনজিও', 'বুদ্ধিজীবী' ও 'উঁচুপদের অবসরপ্রাপ্তদের' একটা সমঝোতাই এখন সবদিক থেকে কাম্য। এই প্রয়োজন মেটাতেই কথিত 'সুশীল সমাজ' এবং এর রহস্য এখানেই। এর সাথে যোগ হয়েছে *ভোরের কাগজসহ* কয়েকটি সংবাদপত্র।

এখন দেখা যাক রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া। মন্তব্যসহ এখানে চুম্বক আকারে মাত্র তিনজনের বক্তব্য দেয়া হল :

রাশেদ খান মেনন :

— 'সিভিল সোসাইটি'র সুশীল সমাজ নামকরণ হয়েছে আমলাতন্ত্রের হাতে এবং 'সুশীল সমাজ' সংগঠিত করছে এনজিওরা। দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে এনজিওরা সিভিল সোসাইটির নামে জবাবদিহিতা বিহীন তহবিল সংগ্রহ, তার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রকে কিনে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভাগীদার হতে চাচ্ছে। ভাগীদার হওয়ার সাথে আর্থিক লেনদেনের বিষয় জড়িয়ে আছে।

— রাষ্ট্রপতি নিজের সুনাম ও তার প্রতি জনআস্থাকে এমন বিষয়ে ব্যবহৃত হতে দিলেন যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজের বি-রাজনীতিকরণ (de-politicisation)।

— এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা গণ সাহায্য সংস্থার ফ.র. মাহমুদ হাসান এর আগে এই মর্মে আমার জানামতে দুটি সেমিনারের আয়োজন করে রাজনৈতিক দলের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে রাজনীতিকরা তাঁর বিদেশী টাকার মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন।

— এন.জি.ও'র উত্থান সামরিক শাসনের হাত ধরে। এনজিও নেতৃত্বে সংগঠিত 'সুশীল সমাজ' সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতায় 'সুশীল সমাজ' উল্লসিত বোধ করলেও জনসমাজকে সতর্কতা নিতে হবে অধিকার রক্ষার জন্য। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে মেনন নিজেও 'সিভিল সোসাইটি'র অনুবাদ ও বিষয়বস্তু নিয়ে যথেষ্ট ঘোট পাকিয়ে ফেলেছেন। তবে এটা বলা যায় তাত্ত্বিক গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও মেনন মোটাদাগে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এনজিওদের কার্যকলাপের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দ্রুতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ফ.র মাহমুদ হাসান :

— বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সংস্কৃতি চর্চার মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগী হওয়া এবং গ্রাম ও শহরে সর্বব্যাপী নাগরিক উদ্যোগ ও তৎপরতার মাধ্যমে রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার শর্ত নির্মাণের লক্ষ্যে অবাহত কর্মযজ্ঞ সাধারণ মানুষের অর্থাৎ সিভিল সমাজের আন্দোলনের পশ্চাদ্ভূমি।

— রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ও '৯৬ এর কেয়ার টেকার সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা আজ সিভিল সমাজের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এদের কীর্তি ও মূল্যবোধ জাতির কাছে বারবার পরীক্ষিত।

— ঢাকা এবং প্রধান জেলা শহরগুলির প্রায় প্রতিটি নাগরিক সংগঠনের প্রধান ব্যক্তিত্ব সিভিল সমাজের এই প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

— এনজিও সমাজ ও নাগরিক সমাজ অভিন্ন।

— এনজিওরা সাম্রাজ্যবাদের টাকা নিচ্ছে এঠা ঠিক এবং নুন খেলে তো গুণ গেতেই হবে—এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে, অভিযোগ করারই বা কি আছে! উন্নয়নের টাকা তো অনেক খাত মারফত আসছে।

— এনজিওদের এত দোষ হলে বাম আন্দোলনের হতাশ নেতা কর্মীরা এনজিওদের দ্বারস্থ হচ্ছে কেন? বাম নেতারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে চাঁদা নেয় কার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য?

— মেনন নিজেও এনজিওদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে বা হুমকি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের দেয়া টাকা নিচ্ছেন, মেনন নেবার পর সেই টাকার চরিত্র কি হয়?

অতঃপর ফ.র মাহমুদ হাসান অথরিটি ও অডাসিটির ভাষায় সর্বশক্তি নিয়ে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী আন্দোলনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।

মাহমুদ হাসানের বক্তব্যের সারকথা হল: (ক) সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে অহঙ্কারী ঘোষণা দিয়ে অবস্থান গ্রহণ, (খ) বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী আন্দোলনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উদ্ভটত্বে নামিয়ে এনে ভুয়া ও ক্ষতিকর প্রমাণ করা, (গ) অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি তথা রাষ্ট্রযন্ত্রসহ পুরো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবিনামা পেশ করা।

জবাবদিহিতার প্রশ্নে মাহমুদ হাসান যে দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন ও দারুন গোস্বা প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হচ্ছে বড় পরিমাণ টাকা হজম করার ব্যাপার আছে, থলের বিড়াল বেশ লাফালাফি শুরু করেছে।

মাহমুদ হাসানের বক্তব্যগুলো একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, (ক) দেশটার উন্নয়নের জন্য সাম্রাজ্যবাদ টাকা দিচ্ছে এবং সেই টাকারই ভাগবাঁটোয়ারা করা হচ্ছে তো তাতে অন্যদের চোখ টাটায় কেন? তাছাড়া যাদের বেশি টাটায় সেই 'বাম'রাও তো ভাগ নিচ্ছে! এনজিওরা সাম্রাজ্যবাদের টাকা নিয়ে আসে এবং তার বিলিবণ্টন করে, এটা তো অতি সত্য কথা—এ ব্যাপারে অন্যরা জবাব চাইবার কে? মাহমুদ হাসান খুবই ন্যায্য কথা বলেছেন। সাধুবাদ জানাতেই হবে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে বিদেশী প্রভুরা ঋণ অনুদান দেয় উন্নয়নের নামে, উন্নয়নের জন্য নয়—দেয় কাদের জন্য? দেয় প্রধানত তাদের পোষ্যদের জন্য। এই পোষ্যরা হল আমলা, ব্যবসায়ী, ব্যাংক কর্মকর্তা ইত্যাদি—অর্থাৎ ডলার যে পথ দিয়ে টাকা হয়ে ঘুরছে সেখানে নির্দিষ্ট collection point-এ যাঁরা মোতায়েন আছেন তাঁরাই হলেন সেই টাকার প্রধান ভাগীদার। এনজিওরাও সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে টাকা আনছে—কাদের কথা বলে? এই দেশ ও দরিদ্র জনগণের নামে—কি জন্য? না—উন্নয়নের জন্য। এই সংগৃহীত Fund-এর প্রধান অংশ কারা পাবে? কেন এনজিওদের মধ্যে যারা রাঘববোয়াল আছে তারা পাবে, পাবে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। জলবৎতরলং। আর এই যে দেশ ও জনগণকে নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের কাছে বন্ধক রেখে লুটপাট হচ্ছে তা হল মাহমুদ হাসানদের কাছে খুবই মামুলি ব্যাপার। মি. হাসান অব্যশ 'ডান' বলে কথিত

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা কর্মীদের দোষেননি—কারণ তাদের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই।

(খ) মেনন ও মেননের সহযাত্রীরা এনজিও ও তাদের স্বগোত্রীয় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে দল গড়লে ও বিদেশ ভ্রমণ করলে তার জন্য যে দণ্ড তাদের প্রাপ্য হবে তাতো কোন না কোন ভাবে তাদের ভোগ করতেই হবে, বাম আন্দোলনের ক্ষতি করেই তার বড় রকম খেসারত দিতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেননের বক্তব্যে অর্থবহ যুক্তি থাকলে বা আশঙ্কার বাস্তব কারণ থাকলে তা বস্তা বস্তা গালিগালাজ ও তথাকথিত 'দেশবরেণ্য'দের নিয়ে মাতম করলে মিথ্যে প্রমাণিত হয় না। মেননের অভিযোগ বা সুনির্দিষ্ট সেই অভিযোগ অন্যায্য হলে তা অবশ্যই বাতিল হতে পারে। কিন্তু মাহমুদ হাসান সেদিকে না যেয়ে এনজিওদের টাকাখোর মেনন বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রমাণ করতে। কমিউনিস্ট আন্দোলন যে খুবই নিচুমানের তাৎপর্যহীন ভুয়া ব্যাপারমাত্র তা তিনি প্রমাণ করতে সর্বধরনের নিকৃষ্টপন্থা অবলম্বন করেছেন। এতে করে অবশ্য ব্যাপারটা খুবই খোলসা হল : বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির ধ্বজাধারীদের অন্যতম কাজ হল কমিউনিস্ট আন্দোলন যে পর্যায়েই থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে কুৎসিৎ অপপ্রচার চালানো—তাকে সবদিক দিয়ে ধ্বংস করা। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিতে গেলে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা একটা ফরজ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তবে মেনন বি-রাজনীতিকরণ সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন সেটা দৃশ্যত কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেও এনজিও কর্তাব্যক্তিরা যে লক্ষ্যে আটঘাট বেঁধে নেমেছ তা highly political এবং name of the game is power.।

মাহমুদ হাসান বলেছেন বিশ্বব্যাপী বাম আন্দোলনের অর্জন হচ্ছে একটি। এবং তাহলো বাম আন্দোলন বিশ্বব্যাপী তরুণদের (অর্থাৎ মার্কসবাদ ছিলো তারুণ্যের মতাদর্শ!) সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সাম্যবাদী আন্দোলনে যোগ দিলে দুনিয়াদারী সম্পর্কে অনেককিছু জানা যায়—তবে তাও এখন শুধু কাহিনী। এই ভাষ্যে বোঝানো হয়েছে বাম আন্দোলনে যোগ দিলে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখা যেত। তাহলে দাঁড়ায় তরুণ লেনিন থেকে ক্যাস্ট্রো পর্যন্ত এদের নেতৃত্বে সৃষ্ট অক্টোবর বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান বিজয়, লংমার্চ শেষে জাপ চিয়াংদের পরাজিত করে নতুন চীন প্রতিষ্ঠা, ভিয়েতনামের মাটিতে শক্তিধর মার্কিনিদের করুণ পরাজয়, আজো কিউবার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই—সবই হল ইতিহাসের কল্পকথা মাত্র—নিছক অতীত। সার কথা হল সমাজতন্ত্র ব্যর্থ—পুঁজিবাদ ছিল, আছে ও থাকবে। সুতরাং, তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

বিশ্ব পরিসরে সাম্যবাদের ব্যর্থতা এখন ইতিহাসের অন্তর্গত—এই রায় দিয়ে বাঙলার তরুণদের স্বপ্নকাহিনীর বর্ণনা দিতে যেয়ে তিনি স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসেবে চারজনের নাম করেছেন। এরা হলেন ভাসানী, চারু মজুমদার, সিরাজ সিকদার ও

কর্ণেল তাহের। এখানেও চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রগতিশীল মহান কোন আদর্শ ও তার বাস্তবায়িত ক্ষেত্রগুলি যদি সাময়িকভাবে পিছু হটে বা পরাজিত হয় তবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে এমনকি তার তৃতীয় সারির কেনা গোলামরাও মহাউল্লাসে প্রলাপ বকতে শুরু করে। প্রভুদের নজর কাড়তে এরা পরণের বস্ত্র পরিত্যাগে একবিন্দু কুণ্ঠাবোধ করে না।

মওলানা ভাসানী কৃষকদের রাজনীতির অংগনে এনেছিলেন কিন্তু তা ধরে রাখা যায় নি—ঠিক তেমনি চারু মজুমদার, সিরাজ সিকদার ও কর্নেল তাহেরের দেখানো স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাঁরা লড়তে গিয়েছিলেন তাঁরা হয় মৃত্যুবরণ করেছেন নতুবা অন্যভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। ফলে সাম্যবাদী স্বপ্ন মানে হচ্ছে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের দেখানো স্বপ্ন মাত্র এবং সেই স্বপ্নে উজ্জীবিত হলে তা অর্জন বলতে বুঝাবে অর্থহীন মৃত্যু নতুবা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া—খতিয়ান নিতে গেলে ব্যর্থতা ও হতাশাই হল যার শেষ কথা। অন্য আর একটি ধারার কথাও বলা হয়েছে—তাহলো সুবিধাবাদী আত্মসমর্পণের পথ। তাহলে এনজিও নেতৃত্বের মূল্যায়ন হল শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদ মানবজাতির তরুণদের অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ভ্রান্ত এক ত্যাগের ধারণা দিয়েছে মাত্র এবং প্রসব করেছে ত্যাগ সম্পর্কে হঠকারী আত্মহননের প্রত্যয় নতুবা সুবিধাবাদী ধারায় বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ। জীবন্ত গাধারা মৃত সিংহদের কি তাচ্ছিল্যেই না পদাঘাতে সাহস পায়।

বদরুদ্দীন উমরকে অবশ্য গবেষক হিসেবে অনুগ্রহ করা হয়েছে—কারণ গবেষণাগারই তো তাঁর যথাযোগ্য স্থান।

(গ) সাফ কথা হল এনজিওদের ক্ষমতার হিস্যা দিতে হবে। তারাই তো এখন বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করার সব থেকে সংগঠিত মহাজন। আসলে এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই সিভিল সোসাইটি, তাদের ভাষায়, সিভিল সমাজ বা সুশীল সমাজ নিয়ে হৈচৈ করা হচ্ছে। একদিকে এনজিওদের কর্তাব্যক্তিরা সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ আস্থাভাজন, এনজিওদের মারফত পুঁজিবাদী বিশ্ব ঋণ-অনুদান বিতরণ করতে বেশি আগ্রহী। [এনজিওরা ১৯৮৮-৮৯ সালের দিকে উন্নয়নের জন্য আসা মোট বিদেশী টাকা পয়সার শতকরা ৬ (ছয়) ভাগ পেয়েছিল, আর গত ৫ বছরের মধ্যেই তা লাফিয়ে শতকরা ১৭ (সতের) ছুঁয়েছে—ফ. মজহার]। অন্যদিকে শুধু বাংলাদেশের নয় এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক দলগুলি সব লেজে গোবরে করে ফেলেছে, এই অবস্থায় সিভিল সমাজই হল ঘোষিত অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাকে সামনে রেখে হাসিল করা হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সরাসরি এই প্রতিষ্ঠান ক্ষমতায় যাবে তা কিন্তু নয়—ক্ষেত্র প্রস্তুতই এখন প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া অঘোষিত দিকতো আছেই। নানা সময় বিভিন্ন শক্তির সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে গড়ে তোলা হবে আঁতাত।

সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশের সুগভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোকাবেলায় সামরিক শাসনের গ্রহণযোগ্যতা যেমন নেই তেমনি সংসদীয়

পদ্ধতিতে দেশ শাসনও চরমভাবে ব্যর্থ, সেখানে গণতন্ত্রের পশ্চিমা লাট সাহেবরা বিকল্প শক্তি হিসেবে এনজিওদের কথা ভাবতেও তো পারে—অন্তত ক্ষমতার প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে 'প্রেসার গ্রুপ' হিসেবে স্থাপন করা তো হতেই পারে। আপাতত বড় রাজনৈতিক দলগুলির কোন একটির সাথে সমঝোতা করে চলাটাকেই এনজিওরা কৌশল হিসেবে বেছে নিতে পারে।

মাহমুদ হাসানরা খুব দেশবরেণ্য, দেশবরেণ্য করছেন। কি সুবাদে ইনারা দেশবরেণ্য সেটা উল্লেখ করে 'দেশবরেণ্য'দের একটা লিস্টি টাঙ্গিয়ে দিলে দেশবাসী উপকৃত হত। আমরা বুঝতে পারতাম এনজিও নেতৃত্ব জাতির দুর্দশা লাঘবে এই 'ধন্বন্তরী' কোত্থেকে আবিষ্কার করলেন।

ফরহাদ মজহার

ফরহাদ মজহার রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিস্তৃত আলোচনা করে বলেছেন, আমি রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের এসব দিকগুলো তুলে ধরেছি ভদ্রলোকদের সিভিল সোসাইটি নামক ধারণার বোগাস ও অন্তঃসারশূন্য দিকগুলো মেলে ধরবার জন্য। তাঁর পুরো বক্তৃতাই ভদ্রলোকী মতাদর্শের দুর্দান্ত দলিল। অথচ ফরহাদ মজহার এই 'ভদ্রলোক' কারা সে বিষয়ে সরাসরি কোন আলোচনায় গেলেন না। এরা কি কোন শ্রেণি? কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক বর্গ? এনজিওদের সাথে এঁদের সম্পর্ক কি? শুধু 'এনজিও' বলতেই কি এখন বাংলাদেশের মাতব্বর এনজিওদের যথার্থ চরিত্র প্রকাশিত হয়? 'এনজিও'রাই কি এই ভদ্রলোক? ভদ্রলোকী সংস্কৃতির রাজনীতি ও অর্থনীতি কি তবে? আবার তিনি বলছেন, 'জনগণের সংগঠিত রাজনৈতিক উদ্যোগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হেয় করা এবং রাজনৈতিক দলের বিপরীতে ভদ্রলোকী রাজনীতির প্রবর্তনের জন্য আগে এত অর্থ, এতো শক্তি এতো গরম কথাবার্তা ছিল না।' যদি মনে করি এ দিয়ে তো তিনি এনজিওদেরই বুঝাচ্ছেন তাহলে রহস্য করা কেন—কেন এই ঘোরপ্যাঁচ? কেনই বা এনজিও নেতৃত্বকে ভদ্রলোক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা? আবার তিনি বলছেন, 'এদের মোকাবেলা করতে ঘটিবাটি বেঁধে নামতে হবে।' কিন্তু 'পুরনো চিন্তা ও বাতিল ধ্যান ধারণার অভিশাপ খোলসের মতো গা থেকে ঝেড়ে দাঁড়াতে হবে।' এই বিষয়ে আবার তিনি ফ.র. মাহমুদ হাসানের ইতিবাচক পরামর্শ গ্রহণ করতে তাগিদ দিয়েছেন। পরে তিনি বলেছেন এনজিওরা আগের অবস্থান থেকে সরে গেছে এবং এনজিওদের মধ্যে সত্যিকার সেবা প্রদান ও যথার্থ উন্নয়নমূলক কাজের আন্তরিক প্রবণতা যেমন আছে তেমনি এনজিওদের একাংশ উন্নয়নের সহযোগী না হয়ে দাতাসংস্থা 'ঠিকাদার' হিসেবে কাজ করে এবং এরা একটি ব্যবসার সেক্টরে পরিণত হয়েছে। ফরহাদ মজহারের বক্তব্য হল এনজিওদের মধ্যে শ্রেণিভেদ আছে। তিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পয়সায় তৈরি একটি রিপোর্ট থেকে দেখাচ্ছেন যে, একদিকে আছে অল্প কয়েকটি এনজিও, তিন-চতুর্থাংশ অর্থ তারাই গায়েব করে আর অন্যদিকে

রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট এনজিও। তাদের অস্তিত্ব যায় যায়। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী কর্পোরেট এনজিও সেক্টর তৈরি হয়েছে। শেষে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, ফ. র. মাহমুদ হাসান এনজিও মহলের নিজেদের আন্তরিক বিতর্কের ধারে কাছে গেলেন না বরং রাজনৈতিক দল বনাম এনজিওকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবেই দাঁড় করিয়েছেন। এতে রাজনীতির ক্ষতি হবে অবশ্য—তবে সামাজিক রাজনৈতিভাবে দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এনজিওরাই। এখানে ছোট বড় সব এনজিওদের এক করে দেখাতে চাইলেন।

ফরহাদ মজহার কঠিনভাবে দুঃখগ্রস্ত হয়েছেন এনজিওদের ভবিষ্যত ভেবে। যদি ফ, র. মাহমুদ হাসানরা ফরহাদ মজহারদের পারিবারিক সমালোচনাকে পাত্তা দেয়, ডেকেডুকে সলাপরামর্শ করেন তাহলে তো মজহার সাহেবের আর কোন বিষাদ থাকবার কথা নয়।

অবশ্য তিনি একটা প্রচ্ছন্ন সালিশি প্রস্তাব রেখেছেন। প্রথমত অধিকাংশ ছোট ছোট এনজিও এবং যাদের মধ্যে সত্যিকার সেবা প্রদান ও যথার্থ উন্নয়নমূলক কাজের আন্তরিক প্রবণতা আছে তাদের সাথে বামপন্থীদের একটা আঁতাত গঠন করা, দ্বিতীয়ত কর্পোরেট এনজিওরা যদি ফরহাদ মজহারদের সমালোচনা একেবারেই গ্রাহ্য না করে তবে তাদের বিরুদ্ধেও যেতে হবে (?) কিন্তু ফ. র. মাহমুদ হাসানের ইতিবাচক পরামর্শ সামনে রেখে তিনি যে, 'পুরনো চিন্তা ও বাতিল ধ্যান ধারণার অভিশাপ খোলসের মতো গা থেকে ঝেড়ে দাঁড়াতে' বললেন সেই জিনিসটা কি? তিনি যদি একটু কেশে বলতেন তো আমাদের বুঝতে সুবিধে হতো। ফরহাদ মজহার তাঁর দুই কিস্তির বক্তব্যের দেহঘড়ির মাঝে পণ্ডিত পেন্ডুলামের মতো দুলে দুলে সবদিক রক্ষা করতে চেয়েছেন, নির্দিষ্ট অবসরে সতর্কতার ঘণ্টা বাজিয়েছেন কিন্তু নিজের অবস্থান যেমন রহস্যময় করছেন তেমনি স্পষ্ট করে কোন বক্তব্য হাজির করা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

যা হোক, দেশের অসংখ্য ছোট ছোট এনজিওদের প্রতি ও কর্পোরেট এনজিওদের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেমন সঙ্গত হবে না, তেমনি পুরো এনজিও সেক্টরে কর্মরত হাজার হাজার বিভিন্ন স্তরের চাকরীজীবীদের অধিকাংশকেই সমাজতন্ত্রের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে মনে করারও কোন কারণ নেই।

বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যত দুর্বল হোক না কেন পুঁজিবাদ ও তাদের দালালেরা 'সিভিল সোসাইটি' নিয়ে যতই ধাপ্পা দিক না তাতে করে মেহনতি মানুষের বাঁচামরার সংগ্রাম—সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ধ্বংস করা যাবে না।

গ্রন্থনির্দেশ

১. ইংরেজী 'Civil society'র চালু বঙ্গানুবাদ: নাগরিক সমাজ, পুরসমাজ, অ-রাষ্ট্রীয় সমাজ, জনসমাজ, লোকসমাজ, সুশীল সমাজ ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার ইংরেজি বাংলামিশিয়ে 'সিভিল সমাজ'ও ব্যবহার করছেন। এক্ষেত্রে মর্মবস্তুর দিকে লক্ষ রেখে অনুবাদ সংগত মনে করি। যেমন Civil এর অনুবাদ করা হয়েছে 'সুশীল'-যার অর্থ হল সৎ বা বিশিষ্ট ভদ্র, সচ্চরিত্র। 'পুর' শব্দের অর্থ হল; গৃহ, আলয়, নগর, শহর ইত্যাদি। আমি Civil এর মূল 'বার্গার' বলতে যাদের বুঝানো হয়েছে তার মধ্যে নিহিত মনে করেছি। বহু বছর আগে রাশিয়া থেকে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত যাবতীয় অনুবাদে Civil এর অর্থ নাগরিক করা হয়েছে আবার 'বার্গার' এর অর্থও নাগরিক করা হয়েছে। কতখানি সঠিক অর্থ প্রকাশ করেছে সে বিতর্কে না যেয়ে আমি এই অনুবাদ গ্রহণ করেছি। নাগরিক এর আভিধানিক অর্থ হল: নগর বা শহর সম্বন্ধীয়; শহুরে, পৌর ইত্যাদি। এমনিতে Civil শব্দের অর্থ হল: মানব সমাজ বিষয়ক ইত্যাদি, আবার Civil এর অর্থ হল: নগর বা নাগরিক বিষয়।
২. কে এম সোবহান, 'সিভিল সোসাইটি ও আইনের শাসন', *দৈনিক বাংলাবাজার*, ২৩ মাঘ, ১৩৯৯ এ প্রকাশিত এবং 'বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম' এ উদ্ধৃত।
৩. মুনশাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়: *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ভূমিকা, বইমেলা-১৯৯৫, ঢাকা।
৪. *ভোরের কাগজ*-২৯.০৭.৯৭
৫. *ভোরের কাগজ*-০৩.০৯.৯৭
৬. *ভোরের কাগজ*-১১.০৯.৯৭
৭. *ভোরের কাগজ*-২২.০৯.৯৭, ২২.০৯.৯৭
৮. *ভোরের কাগজ*-০৫.১০.৯৭, ২০.১০.৯৭
৯. *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড-২, প্রগতি প্রকাশন : ১৯৮৭, পৃ. ১৬, ১৮ (এরপর রা. ম. ই. ব্যবহার হবে)
১০. *রা. ম. ই.* পৃ. ১৮, ২০
১১. মেকিয়াভেলী, *দ্য প্রিন্স*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপর্ষদ, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪
১২. *রা. ম, ই*, খণ্ড-২, পৃ. ২৭, ৩৭ গ্রামশি থেকে উদ্ধৃত
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
১৪. Hobbes : *Leviathan*, Pelican Books 1968, P. 185
১৫. Ibid, p. 188
১৬. Ibid. p. 43, 44
১৭. Ibid, p. 233
১৮. Ibid, p. 228
১৯. রা. ম. ই. পৃ. ১০০
২০. Leo Strauss and Joseph Cropsy, ed-*History of Political Philosophy.* The University of Chicago Press, Chicago and London. p. 402, 404
২১. Hobbes : *Leviathan,* Pelican Books, 1968, p 52
২২. রা. ম. ই. পৃ. ১০০, ১০৩
২৩. Hobbes : *Leviathan,* p. 12, 52
২৪. *রা. ম. ই.* পৃ. ১০৪
২৫. জর্জ. এইচ. স্যাবাইন : *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩৫
২৬. Leo Strauss and Joseph Cropsy, ibid, p. 495
২৭. ibid, p. 480
২৮. *রা. ম. ই.* পৃ. ১২২, ১৩০
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৩০. গ্রাগুক্ত, পৃ. ১২১, ১২৪

৩১. স্যাবাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭
৩২. এঙ্গেলস : *রচনা সংকলন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২
৩৩. Marx : *Capital*, Vol-4, Theories of Surpius Value, Part 1, 1975, p. 367
৩৪. Jone Locke : *Two Treatises of Civil Goverment* : Introduction, J, M , Dent & Sons, Ltd, Lonond, 1924. p. xv
৩৫. Rousseau : *The Social Contract and Discourses*, New Yourk -1912, 'Rousseau was not, of course, in any sense the inventor of the doctrine of Social Contract, on the contrary he was the last in time of its great proponents, p. xi
৩৬. Leo Strauss and Joseph Cropsy, ibid, p. 566
৩৭. *রা. ম. ই.* পৃ. ১৬৯
৩৮. Leo Strauss and Joseph Cropsy, ibid, p. 567
৩৯. Rousseau, ibid, p. 239
৪০. *রা. ম. ই.* পৃ. ১৭১
৪১. প্রাগুক্ত- পৃ. ১৭৯
৪২. Rousseau, ibid, p. 254
৪৩. Leo Strauss and Joseph Cropsy, ibid, p. 577
৪৪. স্যাবাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮
৪৫. *রা. ম. ই.* পৃ. ১৮০
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
হেগেলের বিখ্যাত বইটির জার্মান নাম বেশ বড়-যার শেষ কথা *Philosophie des Rects* ইংরেজিতে T. M. Knox কর্তৃক অনুদিত *Hegel's Philosophy of Right* বোধ করি সব থেকে বেশি প্রামাণ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু T. M. Knox নিজেই অনুবাদে যে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলেন তা তিনি Translators forward এ উল্লেখ করেছেন। তিনি 'Rect' এর অনুবাদ 'Right' করতে যেয়ে বলেছেন, 'Right' has been selected almost every where as perhaps the least confusing rendering Hegels meaning ইত্যাদি। রুশ অনুবাদকরা অনুবাদ করেছেন Hegel's Philosophy of Law বলে (CWME, vol, 3, p. xii, 1975)।
৪৭. *রা. ম. ই.* পৃ. ২৫৬
T. M. Knox জানাচ্ছেন Hegel's Conception of Civil Society is used by eighteenth century writers in contexts where we would now speak 'the state' and Hegel has had his share in change of liguistic usage.
৪৮. *Hegcl's Philosoply of Right* translated with notes by T.M. Knox, USA, 1969, p. 266
৪৯. *রা. ম. ই.* পৃ. ২৫৭
৫০. *Hegel's Philosopy of Right,* p. 269
৫১. Ibid, p. 144
৫২. Ibid, p. 150
৫৩. Ibid, p. 151, 278
৫৪. Ibid, p. 189, 140
৫৫. Ibid, p. x
৫৬. Ibid, p. 124
৫৭. Ibid, p. 127
৫৮. Ibid, p. 355

৫৯. Ibid, p. 126, 354
৬০. *A Dictionary of Marxist Thought*, eds, Tom Bottomore, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK, 1996, p 427-28
৬১. *Hegel's Philosopy of Right,* p. xi
৬২. Ibid, p. 155
৬৩. স্যাবাইন, *রা, ম. ই.* পৃ. ৬০০-৬০২
৬৪. Marx-Engels : *Collected Works,* vol. 3, p. 5-129, 175-18. (2nd Article : *Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Law.* Introduction)
৬৫. দেখুন : *Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law On the Jewish Question, Poverty of Philosophy, Gemen Idology, Louis Bonaparte, On the history of Communist League, Preface to A Contribution to the Critique of Political Econmy, Feaurbac and End of Classical German Philosophy etc.*
৬৬. MECW. vol-3, p. 588
৬৭. MECW. vol-3, p. 178, 369, 370
৬৮. MECW. vol-3, p. 503
৬৯. MECW. vol-3, p. 76
৭০. Marx-Engels : *Selected Correspondence,* p. 29, 30
৭১. MECW. vol-3, p. 503
৭২. *Dictionary of Philosophy,* Progress Publishers, Moscow, p. 272
৭৩. *A Dictionary of Marxist Thought*, Edited by Tom Bottomore, second edition, 1996, p. 379
৭৪. *Dictionary of Philosophy,* p. 272
৭৫. *A Dictionary of Maxist Thought,* p. 45
৭৬. *মার্কস-এঙ্গেলস : রচনা সংকলন,* দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ-পৃ. ১৯৩
৭৭. MECW. vol-3, p. 368
৭৮. *মার্কস-এঙ্গেল: নির্বাচিত রচনাবলি* (১২ খণ্ড). ১ম খণ্ড-পৃ.১০৮
৭৯. *Dictionary of Marxist Thought,* p. 56 (এঙ্গেলস থেকে উদ্ধৃত)
৮০. Ibid, p. 56
৮১. MECW. vol-3, P. XIV, 166, 182-187
৮২. *Dictonary of Marxist Thought,* p. 83
৮৩. Ibid, p. 83
৮৪. Antonio Gramsci : *Selections from Prison Notebooks*, edited & translated by Ouintin Hoaree and Geofferey Nowell Smith, Lawareance and Wishart, London, Reprinted-1978
৮৫. *Marxist Thought,* p. 83
৮৬. Ibid, p. 83
৮৭. পামিরো তোগলিয়াত্তি, *লেনিনবাদ: গ্রামশির তত্ত্ব ও প্রয়োগ-আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ* (খণ্ড-১) পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৯
৮৮. *Marxist Thought,* p. 230
৮৯. Ibid p. 230-31
৯০. *ভোরের কাগজ*, ১৩.৩.১৯৯৮

বাঙালি মুসলমান—শ্রেণিসমস্যা ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রাককথন

ক. বাঙালি মুসলমান অর্থে শুধুমাত্র বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের বুঝাবে না সেটা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার বাঙালি মুসলমানরা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন পুরো ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে যাবে। বাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে প্রবন্ধের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মধ্যেও স্পর্শকাতরতা ও জটিলতা রয়েছে। তুর্কি মুসলমানেরা যখন নদীয়া/নুদিয়া দখল করে তখন মাত্র রাঢ়-বরেন্দ্র এলাকাটা তাঁরা দখলে নিতে পেরেছিলেন। কারা এই তুর্কি মুসলমান? পারস্যের বা আরবের মুসলমানরা দিল্লী বা রাঢ়-বরেন্দ্র দখল করতে পারেনি, পারল তুর্কিরা—যারা দশম শতাব্দী থেকে মাত্র ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়া শুরু করে—সম্ভবত পুরো প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই তারা গৌড়ে পৌঁছে যায়। তুর্কিরা ছিলেন সুন্নি মুসলমান। সুলতানদের পর পরই আসা শুরু করেন সূ'ফিরা। এবং একথাও অস্বীকার করা যাবে না ইসলাম সাম্যের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণি-বিভেদের উদ্ভব একেবারে আদিকাল থেকেই। বাংলাতে শ্রেণির সঙ্গে পরবর্তীতে যোগ হয় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা। এক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা কতখানি এবং কখন কখন তা প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ করে ঔপনেবিশক শাসনামলে—এসব কিন্তু স্বরূপ সন্ধানেরই অংশ।

খ. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-এর আগে কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চল রাঢ়, বরেন্দ্রী, সূক্ষ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, হরিকেল, গৌড়, সমতট ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে গৌড়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রীর নাম অনেক আগে থেকে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের অনেকেই খুব চেষ্টা করেছেন 'বঙ্গ' নামটি কত প্রাচীন এবং ঠিক কোথায় অবস্থিত তা প্রমাণ করতে। এটাকে একটা দায় হিসেবেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিজের দেশের অতীত অহঙ্কারবোধ বা জাতীয়তাবাদী চাপ থাকলে একটা অতি উজ্জ্বল অতীত খুঁজতে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তুর্কিরা যখন নদীয়া দখল করে এলাকাটিকে কিছুটা প্রসারিত করল তা আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মোট ভৌগলিক এলাকার প্রেক্ষিতে খুব যে বড় ছিল তা বলা যাবে না, তখন ঐ অঞ্চলটির নাম বঙ্গ নয় গৌড়। তুর্কিরা গৌড় জয় করেছিলেন। বাংলা ভাষা বিকশিত হওয়ার একটা মানসম্মত পর্যায় বা সুনির্দিষ্ট একটা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা বা জনগোষ্ঠীকে তুর্কিরা দখল করে নি।

চর্যাপদকে শেষ পর্যন্ত অনেক গবেষকই মনে করেন বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী রূপ। ভবিষ্যতে যা বিকশিত হবে সেই বাংলা ভাষার কিছু শব্দ এবং অহমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার শব্দ দিয়েই চর্যাপদ।

তপন রায় চৌধুরীর মতে, ভারতচন্দ্রের আগে বঙ্গের অধিবাসী অর্থে বাঙালি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু আহমদ শরীফ দাবি করেছেন, ১৫৮৪ সালের দিকে লেখা সৈয়দ সুলতানের রচনায় বাঙালি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙালী উৎপন্ন
না বুঝে বাঙালী সবে আরবী রচন ॥

কিন্তু এর প্রকৃত লিপিকৃত সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে—তাছাড়া গৃহীত পুঁথিকে তেমন প্রাচীন মনে করা হয় নি। অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় কবি ভারতচন্দ্র রায়ই প্রথমে বৃহত্তর বঙ্গকে বারবার বাঙালা নামে চিহ্নিত করেছেন এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ—সেই বাঙালার অধিবাসীদের পরিষ্কার বাঙালী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনিও বাঙালা দেশের ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে কোথাও উল্লেখ করেন নি।[১]

সপ্তদশ শতকের কবি আব্দুল হাকিমের কথা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি :

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
ও
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায় ॥

ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতাব্দীর আগে যেমন বাংলা ভাষা নির্দিষ্ট উচ্চতায় বিকাশ লাভ করে নি তেমনি অসম্পূর্ণ হলেও একটা অখণ্ড বঙ্গদেশেরও কোনো সাক্ষাৎও পাওয়া যায় না। আঠারো শতকেই এ অঞ্চলের লোকেরা বাঙালি বলে পরিচিত হলো।

ঊনিশ শতকের আগে আত্মপরিচয় মানে ছিল জাতি, বংশ, গ্রাম শনাক্ত করা। বাঙালি শব্দটা *আইন-ই-আকবরিতে* আছে। ভারতচন্দ্র মানসিংয়ের ঘোষণায় "ত্রি-পুর, মঘ, বংগালী"র উল্লেখ ছিল লিখেছেন। চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখছেন, বর্ষার শেষে চৈতন্যভক্তরা নীলাচল আসা উপলক্ষে উড়িষ্যাবাসীরা বলতেন, গৌড়িয়ারা আসছে। অর্থাৎ অবাঙালির চোখে বাঙালিদের একটা গোষ্ঠীগত সামগ্রিক পরিচয় ছিল কিন্তু বাঙালির নিজের চেতনায় এই সামগ্রিক অস্তিত্বর চেতনা ছিল, কোনও বাঙালি আত্মপরিচয় দিতে ওই শব্দটি উল্লেখ করত, ঊনিশ শতকের আগে তার কোন প্রমাণ নেই।[২]

গ. 'বাঙালি মুসলমান' কোন নতুন ধারণা নয়। এ বিষয়ে উপাদানের পরিমাণ যথেষ্ট। দীর্ঘবছর ধরে অনেক উঁচু মাপের গবেষকরা বিষয়টির উপর কাজ করে চলেছেন। তর্ক-বিতর্ক চিত্তাকর্ষক। ধর্মীয় সম্প্রদায় বিবেচনায় 'বাঙালি মুসলমান'-এর যে একটি স্বতন্ত্র বিকাশের ধারা রয়েছে তা অনেক আগেই শনাক্ত করা গেছে। বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত/ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্র, শিক্ষানীতি (পাঠ্যসূচি ও এই প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কসহ) এবং চাকরির প্রশ্নে হিন্দু বাঙালিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সময়েই বরং এই অধ্যায়টি অর্থবহ হয়ে ওঠে। (তাছাড়া সম্ভবত এইসময়কালেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ধারণারও বিকাশপর্ব বলে মনে করা যেতে পারে।) অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক টানাপোড়েনসহ নানা ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতার প্রসারণ দেখা গেল ১৮৭২ ও ১৮৯১ সালের লোক গণনার পরিসংখ্যান, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ও ১৯৩৭-এ নির্বাচনের ফলাফল, পরবর্তী অধ্যায়ে হিন্দু জমিদারদের মুসলিম প্রজা নিপীড়নের প্রশ্নটি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা—ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে মোটা দাগে বাঙালি মুসলমানদের একটা সুস্পষ্ট অবয়ব দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকার মধ্যে। ১৯৪০-এর দশকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবির সঙ্গে এর গুরুতর যোগ ঘটে গিয়েছিল। এর ফলে বাঙালি মুসলমান স্পষ্টত একটি শনাক্তযোগ্য সত্তা হয়ে উঠতে থাকে। এবং মুসলমান পরিচয়ের দিকটিও মুখ্য হতে থাকে।

বাংলাভাষী হলেও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা বিভাজন যে ছিল না তা মোটেও বলা যাবে না—তুলনামূলকভাবে সেই যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত শান্ত বিভাজন তা বেশ সংঘাতময় বিভেদ থেকে সম্পর্কিত হয়ে গেল ঔপনিবেশিক আধুনিকতা অর্থে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে কি একটি অখণ্ড বাঙালি মুসলমান সত্তা হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল? প্রদেশ এবং দেশ বিভক্ত হলে উভয় বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের পরিণতি কি হবে সে ব্যাপারে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণার খোঁজ আমার জানা নেই।

৪৭' উত্তরকালে ১৯৪৮, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র নির্বাচন এবং পাকিস্তানের সামন্ত-বুর্জোয়া ও গণবিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্রের আক্রমণের মুখে বাঙালি মুসলমান-এর জায়গায় দ্রুতই এসে পড়ল বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী প্রেরণা। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান উপলব্ধি, পাকিস্তান এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসহ নানাবিধ দ্বন্দ্বের উপস্থিতিতে এই ধারণার অসারতার লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকে। অতীতে যেমন বাঙালি মুসলমানরা কোন দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে ভাষা ও ধর্মের প্রশ্নে সুসংগঠিত কার্যকর সমাধান দিতে পারে নি তেমনি '৭১ পরবর্তীতে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই খণ্ডিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা এক অংশের ভাষাভিত্তিক এক জাতিতত্ত্ব তথা শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি তত্ত্ব এবং বাঙালিদের মধ্যেই বিরাট ধনবৈষম্য, বিপুল দুর্নীতি ও লুটপাট—সামাজিক জীবনে এর

নৈরাজ্যিক প্রতিফলন, নতুন পর্যায়ে শ্রেণিবিরোধ ও তার প্রকাশ এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণে দ্রুতই ধসে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদের দালালি উভয় পর্বেই অতি গৌরবের বিষয়বস্তু হিসেবে থেকেই গেল। শ্রেণি, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সরাসরি ফয়সলা করতে বর্ণিত ধারণা দু'টি যার আবার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, কার্যত-অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবারো দেখা যাচ্ছে বাঙালি মুসলমান উপলব্ধির বিকাশ। যা একটি রাজনৈতিক তুরুপের তাসে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। তারা ধমক দিয়ে ইতিহাসের চাকা নিজেদের দিকে ঘুরাতে থাকেন—একসময় অবাধ্য চাকা বুকের উপর উঠে বসে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেও যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে কৌশলী শক্তি প্রদর্শন করছে ইতিহাস এই দুই জবর-দখলকারীদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে। দু'টি ধারাই কিন্তু একে-অপরের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। উভয় ধারাই শ্রেণিবিরোধ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গকে ধামাচাপা দিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছে।

ঘ. সরাসরি 'বাঙালি মুসলমান' ও পূর্ব ভারতের এই অংশে এর উদ্ভব ও বিকাশের জটিল প্রক্রিয়ার উপর বর্ণিত ক্ষুদ্র বয়ান নিয়ে অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও গবেষকরা একনাগাড়ে কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে লিখে চলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ৭০-৮০ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর ৩০-৪০ দশক যেমন হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার তেমনি নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের, যা প্রধানত প্রকাশিত হয়েছিল নিজেদেরই ধর্মীয় বিশ্বাস, তাকে ঢেলে সাজানো ও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তা কোন পন্থায় হতে হবে তাকে কেন্দ্র করে। গোঁড়ামি ও সংস্কারের প্রশ্নটি বিতর্কের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে দেখা যায় মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিরোধ চাপা দেয়া হলো ধর্মীয় আবেগের উত্তাপ ছড়িয়ে। সাময়িকভাবে হলেও সুযোগটা তারা পেয়েও গিয়েছিল।

দেলওয়ার হোসেন, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, মীর মশাররফ হোসেন হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, এ বি এম হবিবুল্লাহ, এস ওয়াজেদ আলী, রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবুল মনসুর আহমদ, মমতাজুর রহমান তরফদার, আহমেদ শরীফ, আবদুল করিম, সুফিয়া আহমেদ, আনিসুজ্জামান, ওয়াকিল আহমেদ, সুখময় মুখোপাধ্যায়, মোহর আলী, এমএ রহিম, তপন রায় চৌধুরী, আব্দুল মমিন চৌধুরী, আর, এম ঈটন, অসীম রায়, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম, ইনামুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, গোলাম মুরশিদ, রফি-উদ্দীন আহমেদ, হাবীব রহমানসহ অতি সাম্প্রতিককালেও আরো অনেকেই 'বাঙালি মুসলমান' সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নে ক্রমাগত লিখেই চলেছেন।

তাছাড়া *আখবরে এসলামিয়া*, *আহমদী*, *হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনী*, *কোহিনূর*, *প্রচারক*, *হিতকরী*, *মিহির ও সুধাকর*, *ইসলাম প্রচারক*, *হাফেজ* ইত্যাদি পত্রপত্রিকা এবং আরো পরে *সোলতান*, *সওগাত*, *মোহাম্মদী* থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বর্ণিত

বিষয়ের উপর এমনকি সংঘাতময় আলোচনা চলেছে।

তবে সরাসরি 'বাঙালি মুসলমান' এই নামেও একাধিক উঁচু মানের গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, সুফিয়া আহমেদের *বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়* (১৯৬৭), মোহাম্মদ মোহর আলীর দুই খণ্ডের ১১শত পৃষ্ঠার *History of the Muslims of Bengal* (১৯৮৫), রিচার্ড এম. ঈটনের *The Rise of Islam at the Bengal Frontier (1204-1704)*, রফিউদ্দীন আহমেদের *The Bengal Mur-lim (1871-1906)*, আবদুল করিমের *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, চণ্ডী প্রসাদ সরকারের *বাঙালি মুসলমান (১৮৬৩-১৯৪৭)*, হাবিব রহমানের *বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব* ইত্যাদি।

১

প্রাক-মুসলিম পর্ব : ভৌগলিক সীমানা ও ভাষা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মোহাম্মদ বখতিয়ার বাঙলাদেশ নামক কোন দেশ জয় করেন নি। না ছিল সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা, না ছিল ভাষার ভিত্তিতে সুগঠিত এবং সুস্পষ্টভাবে শনাক্তযোগ্য কোন জনগোষ্ঠী। বখতিয়ার গৌড় জয় করেছিলেন। ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী এলাকা, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদা ও যশোহরের বিভিন্ন অংশ অভিহিত হয়েছিল গৌড় রূপে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল—অর্থাৎ বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলকে বলা হত বরেন্দ্র। এর অপর নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন।[৩]

তৎকালীন ভূখণ্ড বা জনপদগুলিকে আর্যরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকতে পারে। 'বঙ্গ' নিকৃষ্ট জনপদ হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ এসেছিলেন দিল্লী থেকে। একপ্রকার তদন্ত তিনি চালিয়েছিলেন—তিনি মনে করেন পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চলে ছিল লাখনৌর অবস্থান এবং পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ 'বরিন্দ' বা বরেন্দ্র অঞ্চলে ছিল দেওকোট বা দেবকোট। গঙ্গা এদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করেছিল। কিন্তু এখনকার বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা মিনহাজের হওয়ার কোনো বাস্তবতা ছিল না। বখতিয়ারের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাতে সংস্কৃততে লেখা আছে "গৌড় বিজয়"।

অনেক গবেষণা হয়েছে। এ সম্পর্কে এমন তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলেরই হাতের নাগালে আছে। সামান্য এদিক-ওদিক হলেও মোটাদাগে এটা মেনে নেয়া হয়েছে, ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাকা 'বঙ্গ'ভুক্ত ছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন নুদিয়ায় তখন বঙ্গ অনেক অনেক দূরে। প্রাচীনকালে বা কোন কালে 'বাঙালা' নামে আলাদা কোন দেশ বা ভূভাগ ছিল না।[৪] বিচ্ছিন্ন কতকগুলি জনপদ নিয়ে আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা। অসংখ্য ছোটবড় নদ-নদী, বিরাট সব বিল অঞ্চল, গভীর জঙ্গল ও হিংস্র প্রাণীদের রাজত্বের মধ্য দিয়ে সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সেই সময় ছিল প্রায় অসম্ভব।

অন্যান্য জনপদগুলি নিয়েও ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নানা প্রশ্ন বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। আসলে সুলতানি আমল এবং তার পূর্বেকার ইতিহাসের যথাযথ ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় সাবুদের অভাব রয়েছে।

জৈন-বৌদ্ধ মত প্রচারের সূত্রেই উত্তর ভারতের সঙ্গে এই দক্ষিণ পূর্বদেশের যে যোগ ও পরিচয় তা আজকাল অস্বীকৃত নয়, এবং বৌদ্ধ মতের সঙ্গে আসে মৌর্য শাসন। তবে এরা মূলত বিহার সংলগ্ন এলাকাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

এভাবে মৌর্য-কণ্ব, সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কি-মুঘল শাসন-শোষণের খবর আমরা পাই বটে; কিন্তু তুর্কি-মুঘল-পূর্বকালের শাসকরা রাঢ়-সুহ্ম-গৌড়-পুণ্ড্রের কোথায় কতটুকু শাসনে রেখেছিল, তা আজও অনির্ণীত। আর বঙ্গ, সমতট, হরিকেলে দেব-বর্মণ-চন্দ্র খড়্গ-রাজাদের কথা শোনা যায় বটে; কিন্তু কারো রাজ্যসীমা জানা নেই। অতএব, তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বাবধি-বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসও কখনো নামসার বা কঙ্কালসার।[৫] প্রাক-মুসলিম যুগের পূর্বভারতে কোনো অখণ্ড আঞ্চলিক সত্তার বিকাশ ঘটেনি। অতএব লোকজনের মধ্যে সেই সত্তা সম্পর্কিত চেতনা সম্বন্ধেও বিতর্ক অবান্তর।[৬]

এই অবস্থায় এটা মনে করবার কারণ রয়েছে যে, নীহাররঞ্জন রায়-এয *বাঙালীর ইতিহাস* খুব যে যুক্তিসঙ্গত নামকরণ তা বলা যাবে না। ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের গুরুত্ব রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরের কম। তবে আমরা যেমন সহজেই বলে থাকি 'ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি'—ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। এ দেশীয় লোকজন তাদের আদিভাষার খুব সামান্য অংশই ধরে রাখতে পেরেছে, সাহিত্যের খবর নেই বললেই চলে কিন্তু থেকে গেল—সংস্কৃতির মৌল বেশ কিছু বিষয়ের ধারবাহিকতা। তা যত দুর্বল হোক না কেন—ধ্বংস করা যায় নি। তবে দুর্বল মূলধারা হিসেবে যা কিছুটা শনাক্ত করা যায় তা ঘুরেফিরে সেই উৎপাদন, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণের খণ্ডাংশ, গুরুবাদী মনোভাব ও ইহলৌকিকতার সঙ্গে দেহবাদী মানসিকতা। তবে আমরা খেয়ালে রাখি যে সংস্কৃতি বদলায়। এ রকমটা না হলেই বরং ভালো হতো কিন্তু 'এটাই আমাদের কয়েক হাজার বছরের' দুর্ভাগ্য। যখন অন্ততঃ জনপদগুলির খবর পাওয়া যাচ্ছে তখন থেকেই এদেশ সামান্য কিছু সময় বাদে বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত। বহিরাগত হলেই যে তাদের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি স্থানীয় প্রজাদের উপর চাপিয়ে আস্তে আস্তে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের থাকে না তা মোটেও সঠিক নয়।

যেমন রাজকার্য পরিচালনা তেমনি ধর্মীয় আধিপত্য কায়েমের মধ্য দিয়েও শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি অধীনস্থদের গ্রহণ করতে বাধ্য করার চেষ্টা চালায়। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের রক্তই শুধু নয় ধীরে ধীরে এই রক্তে মিশেছে ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর রক্ত—এরকমভাবেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার

সংমিশ্রণে আজকের বাংলা ভাষা। তবে "বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিই প্রাচীন বাংলার আর্যভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান। ইহা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা কালক্রমে 'প্রাকৃত' নামে পরিচিত এবং আমরা বর্তমানে যে নানা শ্রেণীর ও ধরনের প্রাকৃতের সন্ধান পাই তাহাতে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রাকৃত ভাষা মগধে যে রূপ ধারণ করে, তাহাকেই প্রাচ্য প্রাকৃত বলা হয়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে দণ্ডী যে ভাষাকে 'গোড়ী-প্রাকৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই 'মাগধী প্রাকৃত' বা প্রাচ্য-প্রাকৃতেরই প্রাচ্যতর রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদগণ নিঃসন্দেহভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, আধুনিক বাংলা-ভাষা 'মাগধী-প্রাকৃত' তথা 'গোড়ী-প্রাকৃতেরই' বিবর্তিত রূপ। ইহা যে সরাসরি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, বর্তমান বাংলা-ভাষাই তাহার প্রধান প্রমাণ।"[৭]

আর্যরা বঙ্গদেশে আসার প্রায় পনেরো শো বছর পরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য তখনো বাংলার উত্তর এবং পূর্ব এবং পাহাড়ি লোকেরা এ ভাষাকে গ্রহণ করেনি।[৮]

পর্তুগিজ ও ইংরেজি শব্দ আমরা প্রত্যহ এমনকি গ্রামের একজন অশিক্ষিত মানুষও কতবার ব্যবহার করে থাকে তা বলা যাবে না—সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি তুর্কি হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান (বাংলা একাডেমী) প্রণেতা জানাচ্ছেন অভিধানটিতে ১৭১৭ আরবি, ১১৮৬টি ফারসি, ৪১টি তুর্কি, ৩৬৪টি হিন্দি ও ৫১টি উর্দু শব্দ সংকলিত হয়েছে। সংকলিত একক শব্দের সংখ্যা ৩৩৫৯টি। দেখা যাচ্ছে তুর্কি ও উর্দু শব্দই সব থেকে কম। মোগল আমলে ফার্‌সি ভাষার চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। মোগল শাসনপর্বে সুলতানি আমলের মতোই ফারসি ছিল রাজভাষা। রাজার ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু উচ্চবর্গীয়রা পিছিয়ে ছিলেন না। মুসলমানদের মত হিন্দুরাও 'বিসমিল্লাহ' বলে কেতাব পড়া শুরু করেন।[৯]

২

দুই খণ্ডের *ইসলামী বিশ্বকোষে* 'শী'য়া' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু সূচিতে সুন্নি বলে কোন স্বতন্ত্র শব্দ নেই।

"'আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'-এর সংক্ষিপ্ত নাম সুন্নি। 'আহ্‌ল আল সুন্নাঃ ও-আল-জামা'আঃ এই নামটি কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে এই সম্বন্ধে নিশ্চিত বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে খলিফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২ হি./৮৪৬-৮৪৭ খৃ.-২৪৭ হি. / ৮৬১)-এর আমলে এবং আবু আল-হাসান আল-আশ্'আরী (২৬০ হি. / ৮৮৩-৮৮৪ খৃ./৯৩৬ খৃ.)-র ধর্ম-দর্শন আন্দোলনের পর্বেই এই নামকরণ হইয়াছিল।

"'আহ্‌ল আল সুন্নাঃ'-এর আভিধানিক অর্থ সুন্নাঃপন্থী লোক। সুন্নাঃ-এর আভিধানিক অর্থ পথ, চালচলন, রীতি ও শারী'আত। রাসুল (সা.) তাঁহার কথায়

বা কর্মের মাধ্যমে যেই সব কাজের নির্দেশ করিয়াছেন বা যেই সব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন সুন্নাঃ সেইসব আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহকে বুঝায়।

"জামা'আত-এর আভিধানীক অর্থ সম্প্রদায় তবে এক্ষেত্রে সেই সম্প্রদায়কে বুঝাবে যাঁহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম এবং যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের কেন্দ্র-বিন্দু নবী (সা.) এর বিশুদ্ধ সুন্নাঃ এবং সাহাবীদের (রা.)-এর পবিত্র আচার আচরণ।

"আল-বাগ'দাদী সুন্নীদের তিহাত্তরতম সম্প্রদায় (ত্রাণপ্রাপ্ত সম্প্রদায়) রূপে গণ্য করেন।"[১০]

ইসলামে ধর্মান্তরিত মুসলমান কারা? আসলে আশরাফ, আতরাফ, শী'য়া, সুন্নি সকলেই মূলত ধর্মান্তরিত। উত্তরভারত থেকে শুরু যদি করি তবে আফ-গানিস্তান, পারস্য, কেন্দ্রীয় এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসহ খাস আরবের মুসলমানেরাও মোটাদাগে সকলেই ধর্মান্তরিত।

এবং কি আরবে বা কি বাংলা অঞ্চলে এটা দেখা গেছে ইসলাম সাম্যের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় পরপরই মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যেই 'শ্রেণি'তে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এবং ধর্মীয় উপদল বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। অর্থাৎ ধর্ম শ্রেণি স্বার্থের এলাকার মধ্যেই সবসময় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। "আমার ধারণা হযরত উমর (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন খাস মক্কা-মদিনাতেই ধনবৈষম্য, অনাচার এবং ষড়যন্ত্র দেখা দিয়েছে। যদিও এর জন্য তিনি প্রধানত খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়কে দায়ী করেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আরব উপদ্বীপকে ইসলামের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিরূপে কেবলমাত্র মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে—সম্ভাব্য বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, অসদাচরণের হাত হতে রক্ষা করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আরবের খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়কে আরবদেশ ছেড়ে মুসলিম জাহানের অন্যত্র চলে যেতে আদেশ করলেন।"[১১]

"হযরত ওমর (রা.) আরবের বাইরে আরবগণকে কোন শহরে বা নগরে বাসের অনুমতি দেননি। কারণ এতে তারা নগর সভ্যতার বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে সামরিক কর্তব্য বিচ্যুত হবে।"[১২]

পরবর্তীতে উমাইয়াদের সময় থেকেই শাসক মুসলমানদের অধিকাংশই এক রাজকীয় ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে প্রথম শত বছরের মধ্যে ওমর ইবনে আবদুল আজিজই একমাত্র ব্যতিক্রম।

যা হোক, এ কথা সুবিদিত যে, হযরত উসমানের সঙ্গে আরবদের মধ্যে ধনবৈষম্য এবং নানাবিধ অনাচার প্রসঙ্গ নিয়ে হযরত মুহম্মদ (সা.) এর অতি বিশ্বস্ত সহচর ও প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম আবু-জার-আল্ গিফারির বলতে গেলে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হয়। আবু জার-এর অভিযোগ, "রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাস ব্যসনের সমারোহ দেখা দিয়েছে। সুরম্য অট্টালিকা, অসংখ্য দাসদাসী, বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, অগণিত অশ্ব ও উষ্ট্রাদি রাজ্যের সর্বত্র এমন কি পবিত্র নগরদ্বয় মক্কা ও মদিনার সহজ সরল

জীবন-যাত্রাকে আমূল পরিবর্তন সাধিত করেছে।"[১৩]

"আব্বাসীয় খলিফা মামুন বিদ্রোহী বাগদাদ দখল করে বলেন, বাগদাদে তিন শ্রেণির লোক আছে—এক শ্রেণির লোক মজলুম (অত্যাচারিত), এক শ্রেণি জালিম (অত্যাচারী), আর তৃতীয় শ্রেণি উপরোক্ত কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এরাই সব অনিষ্টের মূল।"[১৪]

৩

প্রথমপর্বে বাংলায় ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান ও সূ'ফি-দের ভূমিকাই প্রধান,—এ প্রশ্নে ঐতিহাসিকরা মোটাদাগে ঐকমত্য পোষণ করেন। এই সুলতানরা হলেন তুর্কি। তুর্কিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করে দশম শতাব্দী থেকে এবং এটা চলতে থাকে চর্তুদশ শতাব্দী পর্যন্ত।[১৫]

তুর্কিরা ভারতে প্রবেশ করার পূর্বেই প্রথমে (এই দশম শতাব্দী থেকেই আব্বাসীয়দের পতন শুরু হয়েছিল।) আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের উত্তর অংশে প্রবেশ করে এবং দ্রুতই তারা পারস্য এবং আফগানিস্তানে পৌঁছে যায়। ফলে প্রধানত আরব ও পারস্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এটাই সম্ভবতঃ সঠিক যে, ফার্সি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বারা এই তুর্কিরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আরবদের সঙ্গেও তুর্কিদের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়—তবে তা চলতে থাকে প্রায় দু'শো বছর।

ভারতবর্ষে একটি সার্বভৌম ইসলামীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম চিহ্নিত করেছিল তুর্কিদের—জাতি হিসেবে যাদের উৎকর্ষের একমাত্র পরিচায়ক ছিল তরবারি। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তারা সকলেই ইসলামকে গ্রহণ করে নি। সীমাহীন কর্মশক্তি, সর্বব্যাপী স্বাজাত্যবোধ এবং নব-দীক্ষিতের প্রচণ্ড গোঁড়ামি নিয়ে ভারতে উপস্থিত হল তুর্কিরা। পারসিক সংস্কৃতিকে সে আকণ্ঠ পান করেছিল, কিন্তু পার-সিকদের রুচিশীলতা অথবা কল্পনাশক্তি এবং আরবদের মননশীলতা তার ছিল না। সম্পূর্ণরূপে বাস্তববাদী এবং একান্ত কর্মনিষ্ঠ, আরবদের প্রচণ্ড উৎসাহ তার অন্তরে সাড়া জাগাতে পারেনি। তুর্কিদের দুটি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল সরলতা এবং উৎফুল্লতা। কিন্তু যথাসময়ে তারা তাদের দূর সম্পর্কীয় গোষ্ঠী মোঙ্গলদের মতো মানবিক অনুভূতিগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।[১৬] অর্থাৎ তুর্কিদের কিছু মৌলিক স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যর মৃত্যু হয় নি বলা চলে।

তুর্কিদের খোরাসন অধ্যায় যে একান্তই জরুরি সে কথা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে—কিন্তু নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা দাবি করে বিশদে না যেতে। ইরান বা আফগানিস্থানের মতো খোরাসন এমন একটি আলাদা রাষ্ট্র নয় যা আজ অব্দি ঐভাবে টিকে থাকতে পেরেছে—অথচ বাগদাদ, কেন্দ্রীয় ও মধ্যএশিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত দীর্ঘ এক সংঘাতময় বিশাল পথ

পরিক্রমায় খোরাসন হয়ে ওঠে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। খোরাসন যদিও ইরানের একটি প্রদেশ তবুও দীর্ঘকাল তার একটি স্বতন্ত্র ভৌগলিক সীমানার উদ্ভব ঘটে যা আজকের হিসাবে উত্তর পূর্ব ইরান, পশ্চিম আফগানিস্থান এবং অক্সাস নদী (আমু দরিয়া)-র দক্ষিণের মধ্য এশিয়া। খোরাসন হয়ে উঠল এশিয়ার অন্তস্থল (Inner Asia)। অন্তঃস্থল-এর সদর দরজা যা প্রসারিত হল ইরানের মালভূমির দিকে ও ভারতীয় উপমহাদেশের দিকেই শুদ্ধ নয়, ইরানের ঋদ্ধ সভ্যতা যা কিনা ইসলামী আরবের শাসনাধীন ছিল তা আবার এক নতুন উদ্যোগে সৃজনশীল সংশ্লেষণের মাধ্যমে হয়ে উঠল পারস্য ও আরব ইসলামের মিশ্রিত এক সংস্কৃতি।[১৭]

তুর্কিদের পরিবর্তনও বিস্ময়কর। গ্রাম্য ও অশিক্ষিত তুর্কি জাতি থেকে ফেরদৌসি ও খসরুর পৃষ্ঠপোষক তুর্কি জাতি—এই বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে মাত্র একশো বছরেরও কম সময়ে। মোঙ্গল আক্রমণে সমগ্র এশিয়া যখন বিধ্বস্ত তখনি একটি যাযাবর ও রণজয়ী জাতির পক্ষে ইসলামীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির রক্ষক হিসাবে কাজ করা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।[১৮]

বিভিন্ন তুর্কি উপজাতিরা ইসলাম অধিকৃত অঞ্চলে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে সেলজুক, ঘুজ, খিতাই, ইলবারি এবং কারঘুজ উপজাতিসমূহ। কিন্তু ভারত দখল ও ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করল প্রথমত শানসাবানি নামক একটি প্রায় অজ্ঞাত সংকর উপজাতি। শান-সাবানিরা, ঘোর অঞ্চলের একটি পার্বত্য দুর্গের শাসক ছিল, এই নগণ্য অবস্থা থেকে গজনীর শাসক বাহরামের রাজত্বকালে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে।

ঘোর-রা যে প্রথমে ভারতে আগমন করেন নি তার পিছনের ইতিহাসও যে বেশ দীর্ঘ সে বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা অনেকেরই আছে—আমরা সে আলোচনাতেও যাচ্ছি না। ঘোরী বংশের একটা পর্যায়ে গিয়াসউদ্দীন ও তদীয় ভ্রাতা মুইজুদ্দিন ঘোর রাজ্যের শাসনকর্তা হন। মুইজুদ্দিন ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এটি ছিল তৃতীয় পর্বের ভারত আক্রমণ। প্রথম পর্ব : আরবের মোহাম্মদ বিন কাশিম ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন; দ্বিতীয় পর্ব : গজনির তুর্কি সুলতান আমির সবুক্তগীন ও তার পুত্র সুলতান মাহমুদ দশম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বারবার ভারত অভিযান করেন এবং লাহোরকে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। তৃতীয় পর্বের লক্ষ্য ছিল আংশিক নয়—ভারত দখল। তুর্কিদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল রাজপুতরা। প্রথম তরাইনের যুদ্ধে মুইজুদ্দিন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে চৌহানদের তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত করেন—এবং এই বিজয় সমগ্র চৌহান রাজ্য মুইজুদ্দিনের পায়ের তলায় এনে দিল। বিজয়ীবীর ফিরে গেলেন কুতুবুদ্দিন আইবককে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে যাতে তিনি বিজয়কে সংহত করতে পারেন। কুতুবুদ্দিন আইবক মীরাট ও দিল্লীর দূর্গ দখল করে কুহরাম থেকে রাজধানী সরিয়ে আনেন। সহজভাবে তিনি দিল্লী দখল করেন এবং দিল্লীই পরিণত হল ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী।[১৯]

মুইজুদ্দিনের পুরো নাম—সুলতান মুইজ-উদ-দীন মোহাম্মদ বিন সাম, যিনি ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘোরী নামে সুপরিচিত। তুর্কিরা এবার আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারত উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ তৃতীয় পর্যায়ের মুসলমান বিজয়ের অংশ বিশেষ।[২০]

উত্তর দিক থেকে একের পর এক তুর্কি ভাগ্যান্বেষীর দল বিত্ত, খ্যাতি এবং শক্তির লোভে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ প্রদেশগুলির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে সিওয়ালিক থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত দেশীয় রাজ্য পদানত হয় এবং নবনির্মিত মসজিদগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করে যে ভারতবর্ষে ইসলামই হল শাসকগোষ্ঠীর প্রধান ধর্ম।[২১]

হবিবুল্লাহ বলেন, এই প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনের কাজে মামলুক সুলতানদের কৃতিত্ব অসামান্য। তিনি আরো বলেন, দিল্লী সুলতানদের সম্বন্ধে প্রচলিত শব্দ বদলে আমি 'মামলুক' শব্দটি নিয়েছি। কারণ এটা সঠিকভাবেই ওদের আদি মর্যাদার সঠিক অর্থকে তুলে ধরে। মামলুক অর্থে দাস বুঝায়। তুর্কিদের বিপুল হারে আগমনের সময় অনেক দাসও এসেছিল—যারা পরবর্তীতে নিজেদের নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মোহাম্মদ বখতিয়ার ঠিক কত সালে নদীয়া দখল করেছিলেন এ নিয়ে তথ্যের দুর্বলতা রয়েছে। হবিবুল্লাহ নিশ্চিত হতে পারেন নি তবে তিনি একস্থানে উল্লেখ করেছেন বিহারের সাফল্যের (ঘন ঘন লুটতরাজের মাধ্যমে অর্থ ও খ্যাতি অর্জন বলতে যা বুঝায় ব্যাপারটা হয়তো মোটামুটি ঐ রকমেরই) 'একবছর পরে অর্থাৎ ১২০৪-০৫' সময় তিনি নদীয়া অভিমুখী হন। অবশ্যই নির্দেশিকাতে তিনি এই তারিখটির পক্ষে কোন যুক্তি খাড়া করতে যান নি বরং সঠিক সাল নির্ণয়ের অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অনেকেই। আব্দুল করিমও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে *এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল*, ১৯৭৯-৮১, ভলিউম ২৪-২৬, পৃ. ১-১০)। বিভিন্ন মতামত খণ্ডন করেন তিনি, শেষে মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ড. পি.এল গুপ্ত ও মিনহাজের বক্তব্যের ভিত্তিতে বলেন, "সুতরাং এই সূত্রে আমরা বলিতে পারি যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে শীত মৌসুমে (অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে) তিনি নদীয়া জয় করেন।"[২২] নদীয়া জয় করে বখতিয়ার খলজী লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করেন।[২৩]

'বাঙালি মুসলমান'-এর উদ্ভবের সূত্রপাত এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য কতগুলি সমস্যা সৃষ্টিও এই সময়কাল থেকে ধীরে ধীরে অন্তঃপ্রবাহের মতো বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। মুসলিম রাজ্য গঠন এবং এর বিস্তৃতি মুসলিম শাসকদের প্রচেষ্টার ফসল। দ্বিতীয় পর্বে উলামা ও সূ'ফিরা মুসলিম সমাজ গঠনের চেষ্টা করবেন, এটিই তখন স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সমসাময়িক ঐতিহাসিক মীন-

হাজ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের পরে বখতিয়ার খলজি ও তার আমিরদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকার উল্লেখেই দেখা যায় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলনও শুরু হয়।

মোহাম্মদ বখতিয়ার লুণ্ঠনে পারদর্শী হলেও 'মুসলিম রাষ্ট্র' গঠনের উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা দাবি করেছেন। বখতিয়ার ও তার অনুসারীরা রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নেও উত্তরাধিকার সূত্রেই স্ফটিক স্বচ্ছ ছিলেন বলে ঈটন মনে করেছেন। The political ideas inherited by Muhammad Bakhtiar and his Turkish followers had already crystallized in Khurasan during several centuries preceding their entry into Bengal in 1204 এবং সেখানে এই ধর্মান্তরিত তুর্কিরা সুন্নি ইসলামের রক্ষক ও তাকে সংবর্ধিত করার জন্য একনিষ্ঠ উজ্জীবিত যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।[২৪] তুর্কিরা না ছিল আরব না ছিল পারস্যবাসী বা আফগান।

তাহলে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় বখতিয়ার ও তার অনুসারীরা একনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ সুন্নি 'মুসলমান' ছিলেন। এবং যে 'মুসলিম রাষ্ট্র' গঠিত হল সেই রাষ্ট্রটি সুন্নি প্রভাবিত মুসলিম রাষ্ট্র হওয়াই স্বাভাবিক।

এই বক্তব্য যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে এটাও মেনে নিতে হয় যে বখতিয়ারের দখলিকৃত এলাকা অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে বীরভূম জেলার লাখনোর থেকে উত্তরপূর্বে দেবকোট (দেবীকোট) যেটি একটি পুরনো শহর ও স্থানীয়ভাবে বানগড় বলে পরিচিত—দিনাজপুর শহরের কয়েক মাইল পশ্চিমে, এবং মিনহাজ যাকে বলেছেন, রাঢ় ও বারেন্দ্রী সেই তিস্তা-করতোয়া পর্যন্ত ছিল আর একটি সীমানা।[২৫] এই যে এলাকা—সেই এলাকায় একটি মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল বলে দাবি করা হলো যখন পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার অতিতুচ্ছ সামান্য অংশই কেবল ধর্মান্তরিত হতে পারে। নিশ্চয় পরবর্তীতে বাকি এলাকাটি মুসলমান শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় একথাটিও অনুসন্ধান করে দেখতে হবে রাষ্ট্রটি কি 'মুসলিম রাষ্ট্র' না 'ইসলামী রাষ্ট্র' ছিল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন মুসলিম শাসকরা শরীয়ত অনুসরণ করেই দেশ শাসন করতেন। অঞ্চলের পুরো জনগণকেই হিসেবে ধরলে এই বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পূর্ব ভারতের এই অংশে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা অংশে কখনোই শরী'য়াত-শারী'আঃভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় নি। যদিও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা সুন্নি এবং সুন্নিরা ইসলাম ধর্মের অনেকগুলি সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায়। এবং সে সব অনুসন্ধান ইতোমধ্যে যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

এই সময়কালে প্রধানত হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্র ও ধর্মান্তরিত

মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে একটি নতুন দিগন্ত অভিমুখে আবর্তিত হচ্ছে তা অবশ্য এখানে খতিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তবে শত শত বছর ধরে প্রধানত দু'টি প্রধান ধর্মের লোক যারা একই ভাষায় কথা বলবে, একই সঙ্গে একই গ্রামে এমন কি একই পাড়ায় বসবাস করতে থাকবে তার-ই তো যথাযথ অনুসন্ধান থাকার প্রয়োজন।

৪

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইখতিয়ার-উদ-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় এটা বুঝা গেছে এই অঞ্চলের শাসকরা সুন্নি মুসলমান। তুর্কি শাসকদের সুলতান বলা হয়—সেই হিসাবে সুলতানি শাসনামল শুরু হল।

কিন্তু বাঙালিরা তখন কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে? এখন শুধু এটুকু বলা যাবে যে তখনো, বাঙালিদের স্পষ্ট অবয়বের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মিনহাজের বক্তব্য অনুসরণ করে এটা বলা যায়, প্রথমত বখতিয়ার খলজী ও তার আমিরেরা বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেন। বক্তব্যে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ একাধিক বা অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠানাদি নির্মিত হয়। সকল প্রতিষ্ঠানই ধর্মীয়, মসজিদ মুসলমানদের অবশ্য করণীয় কাজ নামাজ আদায় করার জন্য, মাদ্রাসা মুসলমান ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং খানকা মুসলমান সূ'ফি সাধকদের সাধনার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে খানকার উল্লেখ প্রমাণ করে যে, সাধারণ বৈষয়িক লোক ছাড়াও এমন কিছু সূফি সাধকের আগমন তখন বাংলার মুসলিম রাজ্যে ঘটেছিল, যার জন্য খানকা প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন দেখা দেয়। মিনহাজের বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে নিলে একাধিক খানকাও নির্মিত হয়, অর্থাৎ সূ'ফিদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। মিনহাজের দ্বিতীয় বক্তব্যে মসজিদ নির্মাণ ও আলেম, সূ'ফি ও সৈয়দদের ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই বক্তব্যে দুইটি শব্দ লক্ষণীয় 'মজামে' এবং 'আহল-ই-খাইর'। আমরা মজামে শব্দের অর্থ করেছি এবাদতখানা, আসলে মজামে শব্দ দ্বারা জাভে মসজিদ বুঝাতে পারে তবে, এর বিশেষ অর্থ বোধহয় কয়েকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি বা ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে, religious complex; সাধারণতঃ religious complex দ্বারা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আলেম, সূ'ফি এবং সৈয়দদের বলা হয়েছে 'আহল-ই-খাইর' যার আক্ষরিক অর্থ সৎ-গুণাবলি সম্পন্ন লোক। তবে মধ্যযুগে আলেম, সূ'ফি এবং সৈয়দদের বলা হত আহল-ই-কলম বা আহল-ই-সাদাত, অর্থাৎ বিদ্বান সম্প্রদায় বা মসিজীবী, বর্তমানে যাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। এঁদের বিপরীতে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ সুলতান, আমির, সেনাপতি উজির যাঁদের বলা হতো আহল-ই-দওলত বা আহল-ই-তেগ বা অসিজীবী। সমাজে আহল-ই-খাইরদের আলাদা

বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা ছিল। তাঁরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতেন, বিশেষ করে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং সাধারণ প্রশাসনে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। যা হোক মিনহাজের এই দুইটি বক্তব্যে মুসলিম শাসকদের পাশাপাশি মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের তৎপরতারও পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬]

সুলতান ও আমিরদের সীমাবদ্ধ পরিসরে ইসলাম প্রচার ও ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া কোনো পর্যায়েই গণরূপ লাভ করে নি। এক দিক দিয়ে বলতে গেলে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষাভাষি মুসলমান প্রায় সমসাময়িক। এবং ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে আগমন করেছে সৈয়দ, শায়খ এবং সূ'ফিগণ।

সুন্নি আশরাফ সম্পর্কে একেবারেই ক্ষুদ্র পরিসরে একটা ধারণা পেলেও আমাদের দেখা দরকার ইসলামের ইতিহাসে সূ'ফীরা কারা? সূ'ফ বা সূ'ফি শব্দের কোন আলোচনা *ইসলামী বিশ্বকোষে* নেই। এই শব্দের অর্থ খুঁজতে হবে 'তাসাওউফ' শব্দের অর্থের মধ্যে। তাসাওউফ-এর উৎপত্তি সূফ হইতে। সূফ শব্দের অর্থ পশম আর তাসাওউফের অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। (খ্রিস্টানদের একটি মরমি সম্প্রদায় পশমি বস্ত্র ব্যবহার করতো এবং বিপরীতে দাবি করা হয় হযরত মুহম্মদ (স.) সুতি বস্ত্র ব্যবহার করতেন।) অতঃপর মরমি তত্ত্বের সাধনায় কাহারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজকে এইরূপে সাধনায় সমর্পিত করেন—ইসলামের পরিভাষায় তিনি সূ'ফি নামে অভিহিত হন।

সূ'ফি ব্রত অবলম্বন সাধারণত সামাজিক অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিবেকের অন্তর্দ্রোহেরই ফলশ্রুতি। (মুসলিম ইতিহাসে চারটি যুদ্ধ বা জিহাদ হয়েছে—এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হল সপ্তদশ শতকে পশ্চিম আফ্রিকায় মুসলিম অভিজাত শ্রেণির তরফে দাস বানানোর নীতির বিরুদ্ধে সূ'ফীদের জিহাদ। এই জিহাদ অবশ্যই ইসলামী বিশ্বাসী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।[২৭] সাম্প্রতিককালে উগ্র ইসলামপন্থীরা ঐ সব সূ'ফিদের কবর ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলছে।

যাহোক, সূ'ফিদের মতে ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন অপেক্ষা মনের সঙ্কল্পই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, শারী'আতের আক্ষরিক অনুসরণ অপেক্ষা আচরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অন্তর দ্বারা আনুগত্য বরণই শ্রেয়।

"এইরূপ বিশ্বাস ও আচরণকে স্পষ্টই কু'রআন বিরোধী রূপে আখ্যায়িত করিয়া ফিক্'হ ও কালামশাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ একথাই প্রমাণের চেষ্টা করিলেন যে, সূ'ফীদের এই মতবাদ এবং আচরিত জীবনপদ্ধতির শেষ পরিণতি কুফুর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"সুন্নীগণ ধীরতর গতিতে সূ'ফীবাদ সম্পর্কে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আর উহার দোষারোপে তাঁহারা কোনদিনই ঐক্যমত হইতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যপন্থী সূ'ফীবাদ সুন্নী ইসলাম কর্তৃক কোনদিনই ইসলামের গণ্ডী বর্হিভূত বিবেচিত হয় নাই।

"তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সূ'ফীবাদের মূল কাঠামোর উপাদান সুনিশ্চিতরূপে মুসলিম এবং আরবীয় উৎস হইতে আহরিত হইলেও উক্ত কাঠামোর উপর সংযোজিত সাজসজ্জার মাল-মসলা অন্যধর্ম ও অন্য দেশ হইতে আমদানীকৃত এবং সূ'ফী সাহিত্যে বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত।"[২৮]

এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সব ঐতিহাসিকরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সূ'ফিরা কথিত সময়ে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার বা সোজা কথায় এদেশীয় লোকের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ গঠন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেছিল। উদ্ভবকালের পর একটা সময় ধরে সূ'ফিরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং এর সংখ্যা ১৭৫ এর উপর অনুমান করা হয়। কিছুসংখ্যক সম্প্রদায় ভারতে তাদের শাখা বিস্তার করে এই উপমহাদেশের মানুষের মন ও নৈতিকতার উপর একটি স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।[২৯] বাংলার সূ'ফিবাদ ছিল উত্তর ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার সূ'ফিবাদের বিস্তৃতি।[৩০]

বাংলাদেশে সূ'ফিতত্ত্ব ও সূ'ফি সাধনা একটি স্থানিক রূপ লাভ করে। ভারতে যে সব সূ'ফি সাধক প্রবেশ করেন, ভারতিক অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধারণ প্রভাব এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে তারা এ দেশের প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিয়েছিল।

একটা সময় নাথপন্থা ও সহজিয়া মতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও এরা পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কার ত্যাগ করেনি। অন্যদিকে অদ্বৈতবাদ (সৃষ্টি এবং স্রষ্টা অভিন্ন) ও যোগ পদ্ধতিকে সূ'ফিরা নিজেদের মতের অঙ্গ করে নিয়ে যোগতত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। ফলে, মুসলিম সমাজ ও সাহিত্যে এর প্রভাব পড়ে। সুন্নি মতে শাসকদের ইসলামের মূল স্তম্ভ সম্পর্কে যে মৌলিক সমর্থন থাকতে হবে এবং প্রচারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তার বিপরীতে সূ'ফিদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। হতে পারে ঐ বাস্তবতায় সূ'ফিদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান বাস্তবতারই অংশ ছিল। প্রক্রিয়াটি জটিল সন্দেহ নেই। তবে তুর্ক-আফগান পর্বই হোক বা মোগল শাসন পর্বই হোক না কেন এদেশের শাসকরা তো আরব থেকে আসেননি। যা হোক, মুসলমানরাও এই যোগতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ও সূ'ফিরা এর এক বাঙালি তথা ভারতিক রূপান্তর ঘটাতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এ তত্ত্ব সঠিক যে, মুসলমানরা আবার তন্ত্রাচার বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও যোগ ও তন্ত্র কোনো না কোনো সূ'ফি তত্ত্ব বহাল রেখেছিল।

ইরানি সূফিরা ভারতে এসে ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে পড়েছিল। সূ'ফি সাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেই তারা শুরু করেন নতুন সূ'ফি চর্চা। সূ'ফিরা গুরুবাদী। শেখ, পির কিংবা মুর্শিদই তাঁদের পথ প্রদর্শক।[৩১]

বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বিশেষ করে পারস্য এবং কেন্দ্রীয় এশিয়ার সূফি পিরেরা। এঁরা যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসলাম এবং আরব দেশের সুন্নি-ইসলাম বিশেষ করে হানাফি মতের ইসলাম অভিন্ন ছিলো না।

মোট কথা, ইরানের ভক্তিবাদী এবং রহস্যময়তা আবৃত সূফীবাদী ইসলাম—আর আরব দেশের ইসলামের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। পূর্বেই বলা হয়েছে সূ'ফিরা ছিলেন অদ্বৈতবাদী এবং মূল ইসলাম দ্বৈতবাদী। আল্লাহ সেখানে প্রভু, মানুষ বান্দা বা দাস। পির-মুরশিদ তাই অপ্রয়োজনীয়। সুন্নি ইসলামে দর্শন এবং রহস্যময়তার স্থানও নিতান্ত সংকীর্ণ, কর্মই সেখানে প্রধান। অপর পক্ষে, সূ'ফিবাদীরা পির-মুরশিদের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের আশা করেন। তারা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্তের অপেক্ষা করেন। (পির এবং শিষ্য এই আবর্ত প্রক্রিয়া সূ'ফিবাদীদের এক প্রধান অবলম্বন।)

বাংলার ধর্ম চিরকালই ভক্তিবাদী ও গুরুমুখী। বাংলাদেশে এই অদ্বৈতবাদী ভক্তিবাদী গুরুমুখী ইসলামই তাই স্ফূর্তি লাভ করেছিল।[৩২]

মুসলমান সূ'ফিরা অনেক তরিকায় বিভক্ত থাকলেও এই অঞ্চলে যেসব প্রধান তরিকার নাম পাওয়া যায় এবং যে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকরা একমত—তা মূলত খ্যাতনামা বাঙালি সূ'ফি শেখ আলাউল হকের প্রসিদ্ধ শিষ্য পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূ'ফি হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর (মৃত্যু ১৩৮০ খ্রী.) সিমনানি কর্তৃক জৌনপুরের সূ'ফি সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে উল্লেখকৃত বাংলাদেশের কয়েকটি সূ'ফি তরিকার নাম। রাজা গণেশের অত্যাচার থেকে বাংলাদেশের সূ'ফিদের রক্ষা করার জন্য এই চিঠি লেখা হয়। এই চিঠি থেকে এবং অন্যান্য গবেষণা থেকে দেখা যায়, যে অঞ্চল পরে পরিপূর্ণ বাংলা হয়ে উঠল সেখানে সোহরাওয়ার্দী, জলিলিয়া, কদরখানি (হযরত কাদেরিয়া সূ'ফি), আলাই, খালেদিয়া, নূরি, হুসাইনি এবং রুহানিয়া। এরা সকলকেই চিশ্‌তিয়া তরিকার শাখা রূপে গণ্য করা যায়। এছাড়া নকশ্‌বন্দি, শত্‌তারী, মদারি এবং কলন্দরি তরিকাও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে।[৩৩,৩৪]

বিভিন্ন সময়ে শতশত সূফি দরবেশ ও তাদের অনুগামী শিষ্যরা বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে এমনটি প্রদেশের নিভৃততম কোণেও ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের আদর্শ চরিত্র, অসামান্য নৈতিক বল এবং দুঃস্থ মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলমান জনসাধারণকে তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।[৩৫]

তুর্কি শাসিত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে এইসব সূ'ফিদের ভূমিকা সবিস্তারে অনেক পণ্ডিতই অনেক অনেক আলোচনা করেছেন। মোদ্দা কথা হলো তুর্কি আগমনের পর অর্থাৎ সুলতানি আমলের প্রথম দিক থেকেই সূ'ফিরা এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্মকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে—প্রকৃত অর্থে ইসলাম প্রচারে তুর্কি শাসকদের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা

যতটাই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তুর্কিদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন ছাপ দৃশ্যমান হয় না। হয়তো তা তারা খোরাসানেই বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন।

আসলে মিনহাজের বক্তব্যের অনুসরণে বখতিয়ারের সময়েই ইসলাম প্রচারে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা যে সুনির্দিষ্ট উন্নতমানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ আবদুল করিম দিয়েছেন এবং প্রথম দিকেই সূ'ফিদের সম্পর্কে যে বিরাট ভূমিকার বিবরণ আব্দুর রহিম দিয়েছেন তার মধ্যে সত্য রয়েছে ঠিকই, তবে অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয়েছে। কেননা ইসলাম কিন্তু অতি দ্রুতই জনপদগুলিতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এর কোনো প্রমাণ নেই।

বখতিয়ার খলজি ছিল তুর্কি, তার সঙ্গে এবং তার পরে যে মুসলমান আমির ওমরাহ এবং সৈন্যরা বঙ্গে এসেছিলেন, তারা সবাই তুর্কি ছিলেন না। তাদের কেউ এসেছিলেন আরব থেকে, কেউ তুর্কিস্তান, কেউ উজবেকিস্তান, কেউ ইরান, কেউ আফগানিস্তান থেকে—এক কথায় বলা যায়, কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে। আফ্রিকার হাবসিরাও এসেছিলেন পনেরো শতকে। এদের সবাই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী। বিজেতারা কোনো অভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে আসেন নি। এমন কি, ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান হলেও, এরা যে একই ধরনের ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন, তাও মনে করবার কারণ নেই। বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে ঠিকই তবে ধারণা করা সঙ্গত হবে যে, ইসলাম ধর্ম তড়িৎ গতিতে নয়, পূর্ববঙ্গসহ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো ধীরে ধীরে।[৩৬]

শাসক, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, বুজর্গপীর, সুফী ও সাধক খানজাহান আলী বাগেরহাটে মৃত্যুবরণ করেন ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে। (বাংলা বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খণ্ড)

তাহলে দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদ বখতিয়ার গৌড় জয় করেন ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে এবং খানজাহান আলী মারা যান ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে– প্রায় ২৫০ বছরের তফাৎ।

বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রসারে একাধিক মত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচার। জাতীয়তাবাদী অমুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই মত বেশি জনপ্রিয়। তাদের বিশ্বাস রাজশক্তি কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে মুসলমান শাসকরা স্থানীয় জনগণকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই মত ঈটন এবং অসীম রায়ের মতো ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করেন নি।[৩৭]

দু'হাজার বছর আগে থেকেই আর্যরা বঙ্গ অঞ্চলের মানুষদের ঘৃণা করত। এরা ছিল পতিত—ব্রাত্য। ইসলাম ধর্ম যাঁরা প্রচার করেছিলেন তাঁরা যেমন শাসক ছিলেন তেমনি ছিলেন সূ'ফিরা। ইসলাম প্রসার প্রসঙ্গে যুক্তি পাল্টা যুক্তির শেষ নেই। তবে একথা বলা যায় অবহেলিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত অতি নিচু স্তরের গরিব শ্রেণিই বেশি বেশি করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সূ'ফি-পিরদের প্রধান ভূমিকা থাকাই সংগত যুক্তি হতে পারে। ধর্মান্তরিতরা যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে এসেছেন তেমনি এদের বাইরে থাকা লোকধর্ম বা নিজেদের তাগিদে সৃষ্ট স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা যাঁরা করতেন তাঁরাও ইসলামে আকৃষ্ট

হয়েছেন। অনেক ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত গোত্রীয় চরিত্রের বিভিন্ন নীচ পেশায় নিয়োজিত নীচের তলার মানুষরা হয়ত হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের অধীনে থাকতো না—তারাও যে পির সূ'ফিদের আচরণে ইসলামে আকৃষ্ট হবে, তা অনুমান করা যায়।

সূ'ফি-পিরদের বদান্যতা, গরিবদের প্রতি সহানুভূতি, জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদি এলাকা বৃদ্ধি ও এই জমি যাতে গরিব মানুষের কল্যাণে আসে সে ব্যাপারে পিরদের সর্বসাধারণের সঙ্গে আন্তরিক মেলামেশা এক নতুন উদ্দীপনায় আবেদন সৃষ্টি করেছিলো—অনেকেই এদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

অনেকেই ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রশ্নে ইসলামের সাম্যের বাণীর কথা বলেন। কিন্তু এই আবেদনের প্রতি সাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানে তো ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা গিয়েছে। জোরপূর্বক অস্ত্রের দাপট ও সাম্যের বাণী যদি ভারতের শাসকগোষ্ঠী কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করে থাকবে তাহলে তো দিল্লীর কয়েকশো মাইলের মধ্যে প্রায় সব লোকের মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা!

মুসলিম শাসকশ্রেণীর শাসনকাল যতই বৃদ্ধি পেতে থেকেছে ততই তাদের মধ্যে অসাম্য ও ক্ষমতার লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠে। চোখে পড়ার মতো শ্রেণিভেদ দেখা দেয়। খোদ মুসলিম সমাজে যথেষ্ট সাম্য ছিল তেমন প্রমাণ নেই। সেখানেও ছিলো আশরাফ (উচ্চবর্ণ/উচ্চশ্রেণী) এবং আতরাফের (নিম্নবর্ণ/নিম্নশ্রেণী) দুস্তর ব্যবধান। আতরাফদের আবার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিলো। সমাজের এই দুই অংশের মধ্যে বিবাহ তো দূরের কথা, পানাহারও চলতো না। বহিরাগত মুসলমানরা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নীচু চোখে দেখতেন। অভিজাত মুসলমান শ্রেণির লোকেরা বরং অভিজাত হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে নয়।[৩৮]

ইসলামে দীক্ষিত স্থানীয় লোকগোষ্ঠী এবং আবিসিনিয়া, আরব, পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আগত লোকজন নিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ গঠিত হয়েছিল। সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান ধাঁচের জাতিগত (racial) বা বর্গীয় (generic) শ্রেণিবিভাগ মধ্যযুগীয় ও আধুনিক লেখকদের কাছে জনপ্রিয় হলেও মুসলমানদের এ ধরনের সামাজিক বিভাজন অনেকটা আদর্শায়িত ও অযৌক্তিক। মুসলমানরা যে নিজেদেরকে বহিরাগত বলে মনে করত এ-জাতীয় শ্রেণিবিভাগে সেই প্রবণতাই প্রতিফলিত। তাদেরকে ব্যাপকভাবে পেশার ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত। এ-জাতীয় শ্রেণিবিন্যাসে তাদের পেশাগত পরিচয় এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অন্তঃসম্পর্ক ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া হয়।

উল্লিখিত দু শ্রেণির মুসলমানের মধ্যে যোগাযোগ কমই ছিল। প্রায় সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এ ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মুসলমান সমাজে অক্ষুণ্ন ছিল। মোগল আমলে বিদেশাগত মুসলমান ও তাদের বংশধরগণ 'আশরাফ'

অভিধায় চিহ্নিত হলেন। তাঁদের জীবন ধারণের প্রণালীই তাঁদেরকে বিশিষ্ট শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। উত্তর ভারতে বসবাসকারী বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল। উভয়ের জীবনের ধরন-ধারণ ছিল ইরানি মডেলের। বাংলার উচ্চ শ্রেণির মুসলমানগণ উত্তর ভারতের উচ্চ শ্রেণির মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন।[৩৯]

ধর্মান্তরিতকরণের ফলে নবদীক্ষিত মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি পেত, তা বলা মুশকিল। জীবিকার কারণেই ইসলামে দীক্ষিত লোকজন তাদের পূর্ব পুরুষের পেশায় নিয়োজিত থাকত। হিন্দু সমাজে পেশাগুলি ছিল জাতিবর্ণভিত্তিক। ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে জাতিবর্ণশ্রেণী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বিকাশমান মুসলমান সমাজেও চলে এসেছিল। কারিগর, জেলে এবং অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণিগুলি ছিল অজলচল শূদ্র। বেদেরা ছিল নিম্ন জাতের। ইসলামে দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও তাদের পেশা এবং পেশাগত কারণেই তাদের সামাজিক অবস্থান অপরিবর্তিত রইল। তাদের সমাজে শিক্ষাদীক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। তাঁদের পুরুষানুক্রমিক পেশাগুলির রূপান্তর ঘটাতে পারে তেমন কোনো সামাজিক শক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না। তাঁতী, ধুনকর, রংরেজ, তেলি, নিকারি, কসাই, নাপিত, বাজনাদার এবং আরো কতকগুলি পেশাজীবী লোকগোষ্ঠীর মধ্যে উনিশ শতকেও সামাজিক গতিশীলতা কমই দেখা গেছে। ইসলামে দীক্ষাপ্রাপ্ত নব্য লোকগোষ্ঠী এবং তাদের বংশধরগণকে বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরে অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয় নি। সেইজন্য তারা একটি খণ্ডিত সমাজের অংশ হয়ে রইল।[৪০]

৫

১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লীর অধীনে ছিল। এই সময় রাজ্য বিস্তার তেমন একটা হয় নি বলা চলে। আশেপাশের শাসকরা, প্রধানত হিন্দু রাজারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুসলমান শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিস্থিতির উন্নতিতে সাহায্য করেনি। তবে এই সময়ে মুসলিম অধিকৃত এলাকায় হিন্দুদের ভেতরে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে আসে। এসময়কালে পনের জন প্রাদেশিক শাসক লখনৌতি শাসন করেন। এদের মধ্যে দশ জন ছিলেন মমলুক বা দাস। এই সময় দিল্লী ও লখনৌতি—দু'জায়গারই শাসক ছিলেন তুর্কিরা। ফলে এই সময় তুর্কি শাসন আমল হিসেবেই চিহ্নিত।

এরপর বলবনী সুলতানদের তাৎপর্যহীন শাসন। আমরা যা আলোচনা থেকে বাদ রাখছি তা হলো, লখনৌতি সম্পর্কে দিল্লীর শাসকদের ভূমিকা এবং দিল্লী ও লখনৌতিতে ক্ষমতার জন্য ন্যক্কারজনক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তবে এটা ঠিক দিল্লীর খলজি সুলতানদের সময় লখনৌতি স্বাধীন থেকেছে। তুগলকেরা দিল্লীর মসনদে বসলে আবার পরাধীন এবং ১৩৩৮ সাল থেকে লখনৌতি দু'শো বছরের জন্য স্বাধীন।

শামস-উদ-দীন-ফিরুজ শাহের নাম ও সময় নিয়ে উপাদানের অভাব আছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে তার সময়ে মুসলিম শাসনের এলাকা সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে সোনারগাঁওসহ পূর্ববঙ্গ, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অধিকৃত হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান-ফকর-উদ-দীন মোবারক শাহ্ সোনারগাঁও এর সিংহাসনে আরহণ করেন।[৪১]

চতুর্দশ শতক থেকে ইসলামের সীমানা বাড়তে থাকে—মুসলমানদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আস্তে আস্তে যেমন একটা ভাষা নির্ণীত হতে থাকে তেমনি এই ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন স্বাধীন সুলতানরা।

সম্ভবত এই সময় থেকে স্তরটা নিচের দিকে থাকলেও 'বাঙালি মুসলমান' যেন সবার অলক্ষ্যে একটা অবয়ব পেতে থাকে।

হাজি ইলিয়াস ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ফীরুজাবাদের সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহকে হত্যা করে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁও দখল করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জনপদগুলি ইলিয়াস শাহের শাসনাধীন হলো। ইলিয়াস শাহের পূর্বে বাঙলার কোন মুসলমান সুলতান সারা পূর্ব ভারতের এইসব অংশের অধীশ্বর হন নি। তারা হয় লখনৌতির বা সাতগাঁও বা সোনাগাঁওয়ের সুলতান ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিক আফীফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙালা' 'শাহ-ই-বাঙালিয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙালা' উপাধিতে ঘোষিত করেন। সুতরাং ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সোনারগাঁও অধিকার এই দেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[৪২]

মোহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে ইলিয়াস শাহীরা দিল্লীর সুলতানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেধ—যদিও নিজেদের মধ্যে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য এর পর দিল্লীর শাসক ফিরুজ শাহ তুগলক বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করেন এবং শাসনাব্যবস্থায় বেশ শক্তভাবেই যেন অংশীদার হয়ে পড়েন। অন্যদিকে এই আমলে ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্যও তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহ রাজ্য বিস্তারে পারদর্শিতা দেখান নি কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ন, বিদ্যোৎসাহী ও সুশাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মক্কা-মদিনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মাদ্রাসা, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন—তবে নিজ দেশের ধর্মপ্রচারে তার তেমন উৎসাহ দেখা যায় নি। অবশ্য সূ'ফিদের তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন। এই সময় হিন্দু সৈনিক ও সেনাপতিরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর নেই।[৪৩]

পরবর্তী ইলিয়াসশাহী শাসনামলের বিখ্যাত শাসক রুকন-উদ-দীন বারবাক শাহ ছিলেন একজন অত্যন্ত যোগ্য শাসক। ১৪৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে

আরোহণ করেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন, "বারবাক শাহ শুধুমাত্র নিজে পাণ্ডিত্য অর্জন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। শুধু পণ্ডিত নয়, কবিরাও তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। আর কেবল মাত্র মুসলমান কবি-পণ্ডিত নয়, হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের উপরও তিনি মুক্ত হস্তে দাক্ষিণ্যবর্ষণ করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষিত কবি পণ্ডিতদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, শতশত বৎসরের ব্যবধানেও যাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অম্লান রয়েছে।"[৪৪] তাঁর গভীর অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের উপর সুখময় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করেছেন।

"বারবাক শাহ উদার প্রকৃতির সুলতান ছিলেন এবং তাহার মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি সকল ব্যক্তির সমাদর করতেন। এই নীতি ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম হইতেই চলে আসছিল।"[৪৫]

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই এটা প্রতিভাত হচ্ছে বহিরাগত অবাঙালি মুসলমান শাসকরা রাজকার্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান দিচ্ছেন। অর্থাৎ উঁচু পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এক ধরনের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দেখা যাবে শাসকদের প্রয়োজনেও স্থানীয় ভাষা যাতে বিকশিত হতে পারে সেজন্য একটা তাগিদও এসে গেছে। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য দরদ নয় শ্রেণিস্বার্থে, ধর্মপ্রচারের স্বার্থে স্থানীয় ভাষাকে সর্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের পর ৬ বছর হাবশি শাসন পর্ব শেষ হলে শুরু হলো হোসেন শাহীর শাসনামল। প্রাক-মোঘল যুগে হোসেন শাহী শাসনামল বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ: "এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাহার সময় বাংলাদেশের সীমানা চতুর্দিক বিস্তৃত হয়।...শাসনক্ষেত্রে তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। এবং তিনি পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার অমাত্যরা বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষণ করেন। তাঁহার বংশের মোট ৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলে সমানভাবে যোগ্য না হইলেও মোটামুটি সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসরণ করেন। আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং অদ্যাবধি তাঁহার নাম বাঙালিদের কাছে পরিচিত।"[৪৬]

১৪৯৪-১৫৩৮ হোসেন শাহী আমল। অর্থাৎ মোট ৪৪ বছর এই শাসনামল। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শের খান গৌড় জয় করেন। স্বাধীনতা লোপ পেল। এর পর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে সম্রাট আকবর দায়ূদ কররানিকে পরাজিত করে এই দেশ জয় করেন। শের খানের গৌড় জয় করার পর তিনি ও তাঁর বংশধরেরা একটা সময় পর্যন্ত দিল্লীর একটি প্রদেশ হিসেবে এদেশ শাসন করেন। মাঝখানে এরপর পর্যায়ক্রমে আফগান শূর ও কররানি সুলতানেরা

স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করেন। এই শাসন চলে ৩৮ বছর। এঁরাই আফগান শাসন পর্বের শাসক।[৪৭]

৬

বহুল আলোচিত হোসেন শাহী আমলের প্রধানত ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গেলে দেখা যাবে এই অর্জন হঠাৎ কোন অলৌকিক ঘটনার মতো নয়—যে ভাবেই হোক এটা একটা ধারাবাহিকতারই ফল। যোগ্যতা এবং উচ্চতর মানবিক গুণাবলির সমাহারের ফলে এই আমলটি যেমন সুলতানি শাসনামলের একটি সার্থক পরিণতির স্বাক্ষর বহন করেছে তেমনি পরবর্তীকালের জন্য প্রধানত দুটি ধর্ম ও একটি ভাষার এক জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য যৌক্তিক একটি সংহত জাতিগঠনের উপাদানও সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় নি।

হোসেন শাহী আমল তথা ইলিয়াস শাহী শাসকবৃন্দের সময়কালের কিছু মূল্যায়ন আমাদের প্রয়োজন। শাহী শাসকবৃন্দের আগে ও পরে মুসলমান শাসকবৃন্দ থাকলেও এই সময়ের কিছু মূল্যায়নই আমাদের লক্ষ্য পূরণে সব থেকে কার্যকরী হবে। কারণ এই সময় সবদিক দিয়ে সুলতানি শাসনামলে একটা পূর্ণতা দেখা যায়। বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৪৮]

মুসলিম বিজয়ের পর পর যে সব বিদেশী মুসলমান এসেছিল তারা তখনও এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে নি। স্থানীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হঠাৎ একটি জ্ঞানদীপ্ত সুস্থিত শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার কোনো সমাজতাত্ত্বিক কারণই ছিল না। এদের অধিকাংশই মনে হয় আদিতে হিন্দুসমাজের নিম্নতর শ্রেণিভুক্ত ছিল। তবুও এটা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, বাংলা ভাষাভাষী একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিবর্তনের খুবই প্রাথমিক পর্যায় আমরা প্রাক-মোঘল বাংলাতেই দেখতে পাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলতকাজী এবং আলাওল প্রধানত এ বিবর্তনেরই ফসল।

প্রাক মোঘল আমলে মিশ্র সমাজকাঠামোতে শক্তিশালী ইসলামী প্রবণতাসমূহ গড়ে উঠে নি। তার অর্থ অবশ্য এই নয়, মোঘল আমলে ইসলামি প্রবণতা খুব শক্তিশালী হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির কেন্দ্র রাঢ় অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার বেশি হয় নি।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা অর্থনৈতিক প্রাচুর্য উপভোগ করতেন এবং বিলাসী ও "অমিতব্যয়ী" জীবন যাপন করতেন। একটি চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী গরু ও ছাগলের ধূমায়িত ও রোস্ট করা মাংস, কলা, কাঁঠাল ও ডালিম ছিল তাঁদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। খাওয়া শেষ হলে তাঁরা মধু ও মিষ্টি গোলাপজল পান করতেন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল। বার্বোসা প্রসঙ্গক্রমে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তালের রস থেকে তৈরি মদ্যপানের উল্লেখ করেছেন। বাংলার শহরগুলিতে মাহুয়ান

বহু মদের দোকান দেখেছিলেন এবং তিনি মনে করেন যে নারিকেল, ভাত, ট্যারি এবং 'কদজং' থেকে মদ তৈরি হতো এবং কড়া মদ বাজারে বিক্রি হতো। ধনী মুসলমানরা মাঝে মাঝে সামাজিক সমাবেশের আয়োজন করতেন এবং নাচ-গানে এগুলি জীবন্ত হয়ে উঠত। এ ধরনের উপলক্ষে তাঁরা গায়ক ও নর্তকীদের আমন্ত্রণ করতেন যাদের রঙিন পোশাকও চোখ-ধাঁধানো অলঙ্কার আমোদ-প্রমোদের জাঁক-জমক ও মহিমা বৃদ্ধি করত।

বাংলার বিলাসিতার ধরন ছিল এমন বিভ্রান্তিকর যে কথিত আছে যে ১৫৩৮ সালে হুমায়ুন গৌড়ে এসে এর সুন্দর রাজপ্রাসাদগুলির দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। এগুলিতে ঝর্না, ফুলের কেয়ারিপূর্ণ বাগান ও জলের জন্য পাথরের খাল ছিল। এসব প্রাসাদের কক্ষগুলির মেঝে ও ভিতরের দেয়ালে চীনদেশীয় টালি ব্যবহার করা হয়েছিল। এ কক্ষগুলিতে দামি আসবাবপত্র ও বিলাসবহুল পর্দা ছিল। গোটা পরিবেশটাই নিশ্চয়ই হুমায়ুনের মনে এক মোহিনী প্রভাব ফেলেছিল।

ধনী মুসলমানদের বিলাসী অভ্যাসগুলি কিছু সামাজিক রীতির প্রচলনের জন্য দায়ী ছিল। তাদের মধ্যে বহু-বিবাহ ছিল বহুল প্রচলিত এবং তাদের স্ত্রীর সংখ্যার কোনো সীমা ছিল না। "এসব মহিলাদের জীবনযাপন নিজ নিজ গৃহের সীমানার মধ্যে সীমিত রাখা হলেও তারা এদের সঙ্গে ভাল আচরণ করত। তাঁরা এসব মহিলাকে প্রচুর সোনা-রূপার অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র দিতেন।" মহিলারা শুধু রাতেই একত্রিত হতেন এবং তখন এ উপলক্ষে "প্রচুর আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দোৎসব হতো এবং সুরার বন্যা বয়ে যেত।" বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। বার্বোসা সোনা, রূপা এবং সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন যা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে উচ্চশ্রেণীর মহিলারা সোনা-রূপার গহনা ও রেশমি পোশাক পরতেন। চৈনিক বিবরণ এ বক্তব্যকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ণিত বিবরণ সম্পর্কে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি।

উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনের সঙ্গে উপ-পত্নী প্রথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলে মনে হয়। তৃতীয় মাহমুদ শাহের নারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

এই যে, 'স্ত্রীর সংখ্যার কোন সীমা ছিল না' বা 'তৃতীয় মাহমুদ শাহের নারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার'—সম্ভবত এই ধরনের ও আরো কিছু বিবরণে বাড়াবাড়ি আছে বলে মনে হয়। দশ হাজার রমণীর ব্যবস্থাপনা সেই সময়কার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বর্ণনার মধ্যে পল্লবগ্রাহিতার ছাপ রয়েছে।

সৈয়দ, মোঘল, পাঠান এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়ে গঠিত ছিল মুসলমান সমাজের উচ্চশ্রেণী। কৃষক, তাঁতি এবং এ জাতীয় পেশা অবলম্বনকারী অন্যরা ছিল জনগোষ্ঠীর নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান কৃষক ও তাঁতির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক যে এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বা এ জাতীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বংশধর।

কিছু কিছু পেশা ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া। এমনকি হিন্দুদেরও মুসলমান দর্জিদের ওপর নির্ভর করতে হতো। বাংলার মাঝি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। পরি (পিষ্টক-বিক্রেতা), কাবাড়ি (মৎস্য-বিক্রেতা), কাগজি (কাগজ প্রস্তুতকারক), রংরেজ (বস্ত্র-রঞ্জক), হাজাম (যারা মুসলমানি করে), কসাই এবং শানাকর (তাঁত-নির্মাতা) সহ মুসলমানদের সাধারণ অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজন এ সিদ্ধান্তের সত্যতাকেই সমর্থন করে যে ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছিল এবং পর্যালোচনাধীন সময়কালে এ বিকাশের প্রক্রিয়া চলছিল।

বাংলাভাষী মুসলিম মধ্যবিত্তের তখনো জন্ম হয় নি। মধ্যশ্রেণীবিহীন বাঙালি মুসলিমগণ প্রাক-মোঘল যুগেই তার সমস্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুর পাশেই অবস্থান করছিল। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের যে ব্যবধান দেখা দিয়েছিল তা আজকের দিনেও অনেক ক্ষেত্রেই ভালভাবে টিকে আছে। হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাসের সীমারেখাসমূহ ভেদ করে বিভিন্ন শ্রেণি ও বর্ণের মধ্যে যোগাযোগ ঘটত পৌরোহিত্য ও কথকতা জাতীয় অনুষ্ঠান—প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে। সেইজন্য হিন্দু সমাজের একটি সংহত রূপ গড়ে উঠেছিল। এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে ছিল না। তাই এ সমাজ সে-কালে যেমন, আজকের দিনেও তেমনি অসংহত, খণ্ডিত। এ-সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র তেমন একটা নেই। মুসলমানদের শাসনকালে আমির-ওমরা ও উলেমা শ্রেণির সঙ্গে নিম্ন শ্রেণির বাঙালি মুসলমানদের যোগাযোগ কমই ছিল।[৪৯]

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর আদৌ সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। মুসলমান শাসকরা 'সংস্কৃত' সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি, সংস্কৃত-কে পিছনে ঠেলে দিয়ে ভাষা হিসেবে বাংলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এবং আরো বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়। ফারসি রাজ ভাষা থাকলেও বাংলা ভাষাকে গড়ে পিটে নিতে শাসকগোষ্ঠীর আগ্রহের ফলে বাংলা ভাষা একটি যৌক্তিক মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসার সুযোগ পেয়ে যায়। হোসেন শাহী শাসকরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে মূল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণে সাহায্য করেছিলেন। জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অ-ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত ভাবেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মোকাবেলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচ্য সময়কালে ব্যাপক সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। যা ছিল সেকালে তুলনাহীন। দেশী ভাষা ধর্মীয় ও পার্থিব মতো দক্ষতা এবং স্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। বাংলা ভাষার উন্নতি ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর স্থানীয় সংস্কৃতির বিজয়ের প্রতীক।

ইলিয়াস শাহী শাসকদের অধীনে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের শুরু। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

তারা এদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির শক্ত ভিত্তি নির্মাণ করেন। বাংলায় কাব্য রচনা এবং সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ লাভকারী চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসু সাহিত্যিক বিকাশের ক্ষেত্রকে আরও সুগম করেন। সে প্রক্রিয়া এতদিন ধরে সক্রিয় ছিল তা হোসেন শাহী আমলেও অব্যাহত থাকে এবং দেশীয় ভাষা নতুন জীবন লাভ করে। সেকালের কবিদের মধ্যে যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এবং শ্রীধর রাজ দরবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[৫০]

শ্রীকর নন্দী, পরাগল খান, ছুটি খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনা-সময়কাল ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে। আমাদের আলোচনার জন্য এই বিষয়টির কোনো আবশ্যকতা নেই। কাব্যরচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীকর নন্দী বলেন,

পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি
একদিন বসে আছে বান্ধব-সংহতি।
শুনিল ভারত-গাথা অতি পূণ্য কথা
মহামুণি জৈমিনির পুরান সংহিতা।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাসয়
ব্যাস গীত ভারত শুনিল চারুতর
তাহাত কহিল জৈমিনি মুনিবর।
সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্ব্বজন
মোর নিবেদন কিছু শুন কবিগণ।
দেশি ভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার
সঞ্চরউ কীর্ত্তি মোর জগৎভিতর
তাহান আদেশ মান্য মাথে আরোপিয়া
শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

সুতরাং হে 'সংস্কৃত' বিদায়—স্বাগতম বাংলাভাষা।

৭

শ্রেণি গঠন প্রক্রিয়া সুলতানি আমলের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। সামন্তশোষণ পুরোপুরি কি চেহারায় ছিল সে সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়েও এটা বলা যায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভালোভাবে চালু হয়েছিল। তাছাড়া অর্থনীতিতে অকৃষিখাতেরও একটা শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়েছিল। প্রাক পলাশী বাংলায় দেশীয় শিল্পের যে সব খোঁজ-খবর পাওয়া যায় তার অতীত সূত্র সুলতানি আমলে বা তারও আগে রয়েছে।

আসলে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সীমানার আওতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট চিত্র না থাকলে সে সময়ের ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড রাজ্যভিত্তিক অঞ্চলের উপর অর্থনৈতিক সমীক্ষা একটি জটিল ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এ সবের ওপর যে সব গবেষণা হয়েছে তা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। বিদেশীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, জমজমাট দাস প্রথা চালু ছিল। ইংরেজদের সময়ও কলকাতাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাস বেচা-কেনা চলত। দাস কেনা-বেচার বড় বড় হাট ছিল। পর্তুগিজরা মগদের সহযোগিতায় নিষ্ঠুর দাস ব্যবসার রমরমা বাজার চালু করেছিল। এই ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও পূর্ব ভারতের বর্ণিত অঞ্চলে দাস ব্যবস্থা উৎপাদন প্রণালি হিসেবে ইতিহাসের একটা পর্ব জুড়ে চালু ছিল এর স্বপক্ষে তেমন অর্থবহ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। দাস কেনাবেচা ও দাসব্যবস্থা সমার্থক নয়।

আমরা এখানে শুধু একটি বিষয়ের ওপর সামান্য নজর দিচ্ছি। সেটি হলো সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হলে রাষ্ট্রের উদ্ভব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা প্রমাণিত হয় নি ইসলাম সাম্যের বাণী নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও মূল্যবোধকে উপড়ে ফেলতে পেরেছে। এটা ঠিক যেসব স্থানে প্রায় সকলেই অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে সেখানে ইসলামি সংস্কৃতির একটা উদ্ভব ঘটে—এটা প্রায় সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাছাড়া ইসলামের অভ্যুদয় ও দিগ্বিজয় প্রচলিত উৎপাদন প্রণালীর উপরও প্রভাব ফেলেছিল। ইসলামের মধ্যে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে নিশ্চিত আবেদন রয়েছে। ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানের উপরও বিস্তারিত গবেষণা আছে। ইসলামের অবদানের উপর মানবেন্দ্র রায়ের লেখা বইটির গুরুত্ব এখনও রয়েছে। কিন্তু ইসলাম বা অন্য যে কোনো ধর্মের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের বিপক্ষে অনেক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকলেও সে পর্যন্ত দেখা যায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রভূত্ব বিস্তারকারী শ্রেণী ধর্মকে এমনকি নিষ্ঠুরতম শোষণ-বঞ্চনার পক্ষে সহনশীল করে তোলে। ধর্মকে তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণের পক্ষে ও শাসক-শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এটা ঠিক বাংলা ও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলামকে লড়তে হয়েছে। সুসংগঠিত জাতিভেদ প্রথা ইসলাম ধর্মের প্রসারের পথে একটি বড় বাধা। অবশ্য এটা ভাঙ্গা তো দূরের কথা জাতিভেদ প্রথা দ্বারা মুসলমান অভিজাতরা প্রভাবিত হয়েছিল। যা হোক, এমন কি বাদশা আলমগীরও উলামাদের পরামর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে রাজি হন নি। সাধারণভাবে বলতে গেলে মুসলমানদের শাস-নামলে রাষ্ট্র-ধর্ম নিরপেক্ষ থেকেছে।

শ্রেণি গঠন বোঝাবার সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হলো উৎপাদন পদ্ধতি এবং তদ্দারা সৃষ্ট সামাজিক উদ্বৃত্তই হলো শ্রেণি গঠনের প্রধান হেতু। যদিও জানি, বিপরীত মত বহু লোক তুলে ধরেছেন। 'শ্রেণি' এবং 'উদ্বৃত্ত' শব্দগুলিকে হটিয়ে

দেওয়ার চেষ্টা থেকেই, তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে, 'উচ্চবর্গ' বা 'শিরোমণি', 'মর্যাদা', 'ক্রমবিন্যাস', 'সিদ্ধান্ত-কারণ' ইত্যাদি কথা। উদ্বৃত্তের তত্ত্বকে বাতিল করার জন্য যে কারণ দেখানো হয়, তা হলো মানুষ নিজের থেকে অধিক উৎপন্ন করে না, তাদের অধিক কাজ করতে বাধ্য করা হয়, অথবা অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করা হয়। অধিক উৎপাদন করার পিছনে যে কারণই দেখানো হোক না কেন—এ ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও—প্রায় প্রত্যেক নিষ্ঠাবান গবেষকই স্বীকার করেন যে একমাত্র উদ্বৃত্ত উৎপন্নের উপরেই পূর্ণ সময়ের শাসকবৃন্দ, পেশাদার সৈনিকগণ, পুরোহিত শ্রেণি, কারিগরশ্রেণি এবং অনুরূপ বিশেষজ্ঞগণ নির্ভরশীল, যারা নিজেরা খাদ্য উৎপন্ন করেন না।[৫১]

বাঙলাতে ইসলাম ধর্ম শ্রেণিগঠন প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করে নি (করতে পারেও না) ঠিকই কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো শ্রেণি সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নৈতিকভাবে এমনকি বিপুল ধনসম্পদের মালিক হওয়া স্বীকৃত থাকায় যাকাত ধনবৈষম্য ঠেকাতে পারে নি। অর্থাৎ আয়কর বা যাকাত ধনবৈষম্য বৃদ্ধিতে বাধা দানের কোনো কার্যকরী পন্থা নয়। ফলে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ জে. ব্লকের কাছে এক চিঠিতে উপরিকাঠামোর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। উপরিকাঠামোর বেশ কিছু বিষয় 'ভিত্তি'র উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এমন কি ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের *রূপ* নির্ধারণে বড় হয়ে উঠে।

শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে উপরিকাঠামোর বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যদি অজ্ঞতা থাকে তবে তা গৌরবের বিষয় হতে পারে না।

৮

আমরা আগেই দেখেছি যে, স্বাধীন সুলতানি আমলের পতন ঘটছে ও মোঘলরা বাংলার বিহার উড়িষ্যা দখল করে নেয় এবং নামকরণ করা হয় সুবাহ বাংলা। মোঘলদের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং কৃষি বাণিজ্য শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মোঘল শাসন আমলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার কোন অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় নি। বরং নবাবি আমলের শুরু থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত দেখা গেল রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান কর্ণধাররাই হয়ে উঠলেন হিন্দুরা।

লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডসে (ব্রিটিশ লাইব্রেরি) রবার্ট ওর্ম সংগ্রহ ও হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় প্রাক-পলাশী বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দু'টি তালিকা পাওয়া গেছে। প্রথমটিতে (রবার্ট ওর্মের তালিকা) দেখা যাচ্ছে—আলিবর্দীর সময় (১৭৫৪-তে) 'দেওয়ান,' 'তান দেওয়ান,' 'সাব-দেওয়ান' 'বক্সি' প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলংকৃত করেছে। একমাত্র মুসলিম বক্সি ছিলেন মীরজাফর।

আবার ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু। বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুমের তালিকাতেও (১৭৫৫ সালের) নায়েব দেওয়ান উমিদ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য। ১৭৫৪-৫৫ সালের এই যে চিত্র, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় তার কোনোও পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুসলমান রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতেও বেশি সু-বিধাজনক অবস্থায় ছিল। সিরাজউদ্দৌলার সময় সর্বক্ষেত্রে এই হিন্দু প্রাধান্য আরও বেড়ে যায়।[৫২]

হিন্দুদের বঞ্চিত করা হয়েছিল—এই ধরনের অভিযোগ খণ্ডনের তালিকা ও বর্ণনা আরো অনেক দেয়া সম্ভব।

কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা না-করার নীতি অনুসরণ করেও মোঘলরা স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এ সময়কার দুটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ষোলো শতকে তারিখ-সম্বলিত ৭৩টি মসজিদ নির্মিত হলেও সতেরো শতকে এ রকমের নতুন মসজিদের সংখ্যা কমে যায়। তখন নির্মিত হয় মাত্র ২৪টি মসজিদ। পরের অর্ধ শতাব্দীতে নির্মিত হয় আরও কম—মাত্র ৮টি মসজিদ। অপর পক্ষে আলোচ্য সময়ে নতুন করে মন্দির নির্মাণে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে ষোলো শতকে তারিখ সম্বলিত মাত্র সাতটি মন্দির তৈরি হয়েছিলো, সেখানে সতেরো শতকে তৈরি হয় ৭৪টি। তারপর আঠারো শতকে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের আগে পর্যন্ত ছয় দশকে নির্মিত হয় আরও ১৩৮টি। মুসলিম আমল যতো পুরোনো হতে থাকে হিন্দুরা ততো প্রাধান্য এবং আত্মবিশ্বাস লাভ করেন।[৫৩] অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র, জমিদারি, ব্যবসা বাণিজ্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে হিন্দুরা মুসলমানদের পেছনে ফেলে দিতে সক্ষম হন।

কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত যে, মুসলমান হওয়ার প্রক্রিয়া সুলতানি আমলেই শেষ হয়ে গিয়েছিল—মোঘল আমলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নি। আসলে মোঘ-লরা ধর্মান্তকরণে কোন রাষ্ট্রীয় ভূমিকা না পালন করলেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে নবাবি আমলে বাংলায় বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে শিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

৯

১৭৫৭ পরবর্তীতে 'হিন্দুদের এগিয়ে যাওয়া' ও 'মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া'-র তত্ত্বটি ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চার কাঠামোভুক্ত প্রত্যয়।

১৭৫৭ সাল নাগাদ হিন্দুরা যেমন মুর্শিদাবাদের শাসনযন্ত্র ও অর্থনীতিতে দৃঢ় অবস্থান নিতে পেরেছিলেন—তেমনি কলকাতায় সাহেব আধিপত্য বিস্তারের অংশীদার হয়ে দুই তরফে 'এগিয়ে ছিলেন'। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের যে প্রধান তিনটি অভিযোগ তার একটি হলো নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দান।

কলকাতার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের আদি পুরুষরা সেই সময়ে ইংরেজদের বেনিয়ান বা দেওয়ান ছিলেন। কোম্পানির চাকরির ছিল চারটা গ্রেড, 'রাইটার' দিয়ে শুরু।[৫৪] সুতরাং বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী হিন্দুদের কাছে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ১৭৫৭ সালের পূর্ব ঘটনা। ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রধান ১৯টি জমিদারির মধ্যে ১৮টা ১৭৫৭-র আগেই হিন্দুদের দখলে। অর্থাৎ বাংলার ভূমি মালিকানা কার্যত চলে গেল হিন্দুদের দখলে।

কর্নওয়ালিশ সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন করেন। ওয়েলেসলি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাইটারদের মান-উন্নয়নের জন্য ১৮০০ সনে কলকাতায় স্থাপন করেন ফোর্ট উইলিয়াম 'কলেজ'। যে সশস্ত্র দূর্গ নিয়ে নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের এতো বিরোধ তার নাম ফোর্ট উইলিয়াম 'কেল্লা'—বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণের প্রধান সশস্ত্র দূর্গ। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কামান নিক্ষেপ করতো গোলা। এবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কামান থেকে বের হবে 'কলম' নির্ভর ইংরেজ কর্মচারী। পরে হিন্দু বাঙালি এবং বাঙালি। রাজকার্য তো চালাতে হবে গদ্য দিয়ে। দরকার গদ্যের—এই গদ্য কেমন হবে? পথ বাৎলালেন ইংরেজরা। হ্যালহেড লিখলেন বাংলা ব্যাকরণ ধরনের কিছু একটা।

সাহেবরা বাংলা জানতেন না।...কিন্তু তাঁরা বাংলা গদ্যে কি লেখা হবে সেই বিষয়টি জানতেন। সংস্কৃত পণ্ডিতরাও বাংলা গদ্য জানতেন না...কিন্তু তাঁরা ঐ বিষয়ের উপযুক্ত ভাষা কী হতে পারে তার একটা আন্দাজ জানতেন...। আঠার শতকের শেষ থেকেই ইউরোপীয়রা সংস্কৃত আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাঁদের বাধাহীন অনুরাগ।

হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন : The grand source of Indian literature, the parent of almost every dialect from the Parsian Gulf to the China Seas, is the Sanskrit, a language of the most venera-ble and unfathomable antiquity.

সাহেব ও ব্রাহ্মণদের ভিতর, ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভিতর এই কার্যকর আপোষ সমঝোতার অন্য একটি কারণও ছিল। ইংরেজদের দিক থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতরা যেমন বাংলা ভাষার সাহেববোধ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিন্দু

ব্রাহ্মণদের দিক থেকে সাহেবরা হয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যম।[৫৫]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগে ব্যাপক সংস্কৃতায়ন চলতে থাকে। সে সময়ের সমাজে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে নিশ্চয়ই এমন কোন ঘটনা ঘটে থাকবে—সমষ্টিগত মনোভাবে এমন কোন পরিবর্তন, যা এই ব্যাপক সংস্কৃতায়নের জন্য দায়ী। মুসলিম শাসনের পরিবর্তে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব-স্থাপিত হয়। সংস্কৃতায়নের পিছনে একক কারণ হিসেবে সেটিই বোধহয় সবচেয়ে প্রধান। যতদিন মুসলিম শাসন কায়েম ছিল ততদিন ফার্সি-উর্দু এবং তার মাধ্যমে আরবির প্রভাব বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পড়েছিল। নতুন রীতির বাংলায় আরবি-ফার্সি বিতাড়িত হয়, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে সংস্কৃত শব্দাদি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে সবচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই একমত। আমার মতে, সেই প্রভাবের প্রথম ফলই হল বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন।...বাংলা ভাষা-সাহিত্যেই যদি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান ফসল বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সংস্কৃতায়ন যখন থেকে আরম্ভ, তখন থেকেই রেনেসাঁসের সূচনা বলে ধরতে হবে।[৫৬] সুলতানরা সংস্কৃতকে বিদায় জানিয়েছেন—ইংরেজরা 'স্বাগতম' জানালেন সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে।

প্রথম দিকে ইংরেজদের প্রধান অবলম্বন ছিল বেনিয়ান, দেওয়ান—মুৎসুদ্দী ও যেকোনো মানের রাইটার। কিছু পরে জমিদার ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি জানা লোক। ক্ষমতার ভাষাকে অতিদ্রুত আয়ত্ত করার মেধা ও কৌশল যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের ছিল তা কিন্তু স্বীকার করাই শ্রেয়। তবে সুলতানি-মোঘল আমল এবং ঔপনিবেশিক আমলের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল। আগে তো হিন্দুদের এগিয়ে যাওয়ার তত্ত্ব আসেনি। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক ইংরেজদের গোলামি করে ভূ-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইংরেজ শাসন অটুট রাখতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে স্থাপিত হওয়ার কারণে কেন তাদের সেলাম ঠুকতে হবে? এ-তো ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির যে দাবি : তারা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই বক্তব্যকেই আলিঙ্গন করা—ঔপনিবেশিকতার ইতিবাচক দিকের পক্ষে ওকালতি করা। অর্থাৎ এটা স্বীকার করা পুঁজিবাদের যুগে ঔপনিবেশিকতার অবশ্যই ইতিবাচক দিক ছিল। এদেশবাসীর উন্নতি-অগ্রগতির জন্য ইংরেজদের সদিচ্ছাকে প্রথমেই যারা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছে তারাই তো এগিয়ে গেল। হিন্দুরা যে এগিয়ে গিয়েছিল তার মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি এটাই।

রামমোহনের সাহেবি বাংলা ব্যাকরণ তেমন পছন্দ হয় নি। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে। ভাষা নির্মাণে তাঁর ভাবনা কিন্তু ফেলনা নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য

ঘটে গেছে সেটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

— যাদের উচ্চাশা আছে এবং যে সমস্ত প্রাচীন পরিবারের লোকেরা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তাঁরা ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করেন। এবং তারা এই শাসন ব্যবস্থার প্রতি সুনিশ্চিতভাবে অসন্তুষ্ট।

— আর যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি অর্জন করেছে এবং যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেরেছে, তারা শুধু এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় নি তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে। রামমোহনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য : ভারতীয়দের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তাঁরা মনে করেন যে, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরির ব্যবস্থা থাকার উপরই সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নির্ভর করে।[৫৭]

ইংরেজরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নেতৃস্থানীয় হিন্দু প্রজাদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হল তারা তো হিন্দুদের দেশ মহান ভারতকে দখল করে নি—বরং অন্যায়ভাবে বাংলা ও ভারত দখলকারী স্বৈরতন্ত্রী শাসক মুসলমানদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

বিশপ হেবার (১৮২৩-২৬) বার বার হিন্দুদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটিশ তো তাদের দখল করে নি, তারা আগে থেকেই মুসলমানদের অধীন ছিল। তিনি মনে করিয়েছেন মুসলমান শাসকরা ব্রিটিশদের মতোই রক্ত সম্পর্ক বা ধর্মের দিক থেকে ভারতে বহিরাগত আগন্তুক। এবং তারা ব্রিটিশদের চেয়ে ঢের বেশি অত্যাচারী ছিল।[৫৮]

হিন্দু সমাজপতিদের কাছে প্রতিভাত হলো ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ হচ্ছে হিন্দুদের জন্য এক দুঃসহ কালো অধ্যায়। তারা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে নিষ্পেষিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে (যা কম বেশি প্রসারিত বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত) রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভূদেব, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রসহ আরো সব অনেক বিশাল ব্যক্তিত্ব এক নতুন যুগের সূচনা করেন। এদের মধ্যে মতের ভিন্নতা ছিল। কিন্তু অতি বড় বিদ্যাসাগর—তিনিও বেদ-বাক্যের ভিত্তিতে সনাতন ধর্মের সংস্কার করতে চাইলেন। এবং এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ইংরেজ শাসকরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছে।

এক দিকে কিছু কিছু শোভন সমালোচনাসহ দ্বিধাহীন চিত্তে ব্রিটিশ শাসন, শাসন কাঠামোর অধঃস্তন অংশীদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আন্তরিক সমর্থন এবং অন্যদিকে ভারতের অতীত ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মর্মবেদনাকে টেনে নিয়ে

চলল একজাতি তত্ত্বের দিকে। তারা একটি অখণ্ড একজাতি তত্ত্ব খাড়া করলেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতা একটি মতাদর্শ হিসেবে সু-প্রতিষ্ঠিত হলো।

আমাদের বুঝতে হবে যে, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের প্রায় কিছুই দিতে পারে না। এর ফলে যে প্রচণ্ড ক্ষতি শুধু ভারত-ইতিহাস চর্চার প্রশ্নে হয়ে গেছে তাই নয়, ভবিষ্যতেও আরো অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। যেমন, মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রণয়নের ঢের আগেই ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা তার একটি পূর্বতন সংস্করণ খাড়া করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে একজাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতির মানে হলো হিন্দু জাতি, ভারতীয় জনগণ বললে হিন্দু জনগণকে বোঝায়, মুসলমান শাসন ছিল বিদেশি শাসন সুতরাং ভারতীয় মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশি মাত্র ছিলেন, ইত্যাদি।[৫৯]

তবুও বিষয়টি দু'এক কথায় আরো একটু খোলসা করা দরকার। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উৎসমূলে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করা যাবে না—মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর হিন্দু নেতারা হুমকির ভাষায় একটি কথা বার বার নানাভাবে বলতে চেয়েছেন।—ভারত হিন্দুদের দেশ অর্থাৎ দেশের মালিকানার প্রশ্নটিকে তারা তীক্ষ্ণভাবে সামনে আনলেন। মুসলমানদের সামনে-পিছনে যদি ক্রমাগত এই চীৎকার উঠতে থাকে তবে তারাও আত্মরক্ষামূলক বর্ম খুঁজতে থাকবেন। তারা জানে ভারতের মাটিতেই উদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম একপ্রকার নির্বাসিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সুযোগ ঘটে যায় রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষে এ কথা বলার—তাহলে আমাদের ধর্মের লোকেদের দেশটা কোথায়। ভারতের বাইরের বৌদ্ধরা স্বদেশভূমিতে কিভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু তবুও একথা উল্লেখ থাকা দরকার ইসলাম অনেকগুলি দেশেই প্রধান ধর্ম হিসেবে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কিন্তু বর্ণিত সমস্যাটির উদ্ভব ঘটে নি।

এই সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় গোঁড়া ও রক্ষণশীল মুসলমানরা তখন থেকেই অত্যন্ত অন্যায্যভাবে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের পরিচয়ের উৎস মূলে রয়েছে মক্কা-মদিনা এমন কী আরবে। যা অদ্যাবধি আমাদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। এরা বুঝতে চান না ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম উভয়েই বহিরাগত। তাছাড়া ধর্ম হিসেবে ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এমন কি হিন্দু ধর্মও অনেকটা বিশ্ব চরিত্র অর্জন করেছে। প্রায় কোন ধর্মের পক্ষেই যে দেশ থেকে ওই ধর্মটির উৎপত্তি সেই দেশের ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকা বা সেই দেশের সবকিছুকেই নিজ দেশে (অর্থাৎ যে দেশে তিনি বংশপরম্পরায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন) চালু করা অসম্ভব। ভারতের মাটি থেকে উদ্ভূত একমাত্র প্রধান ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বৌদ্ধ ধর্মকে। অথচ তারা ভারতের মাটি থেকে একপ্রকার বিতা-ড়িত। যা হোক, আমরা স্পষ্টতই জানি তুরস্ক, ইরান বা ইন্দোনেশিয়া—এখানকার মানুষের নাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি আরব বা বাংলাদেশের মতো

না হলে তারা মুসলমান হবে না—এই ধরনের আবদার নিতান্তই অবান্তর। কিন্তু বিষয়টি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যখন ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর জোর করে সাম্প্রদায়িকতা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এবং অনেক সময়েই সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্পর্শকাতর উপাসনালয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয়, চাকরিসহ বিভিন্ন পেশা থেকে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবেই তাকে হঠে যেতে হয়। হয় নতজানু হয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থাকুক, ধর্মান্তরিত হোক, নতুবা দেশ ত্যাগ করুক। নিজ জন্মভূমিতেই এক ঘৃণ্য মানবেতর জীবনযাপনে তারা বাধ্য হয়।

১৮৫৭ পূর্বকালীন সময়ে দিল্লীর অতন্দ্র প্রহরী গালিব সাম্প্রদায়িকতাকে কোনো গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখেননি। কিন্তু এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইকবাল যখন বলেন, এই হিন্দুস্তান আমার; তখন একে কোন ব্যাঘ্র গর্জন বলা যায় না—মনে হয় কোন একপক্ষের হম্বি-তম্বির সামনে নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে আত্মপরিচয় নতুন করে প্রমাণসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র—সকলের লক্ষ্যই মূলত এক। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র জাতীয় মেলা স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে তৃতীয় সভা থেকে এর নাম করা হয় হিন্দু মেলা। এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, হিন্দু মেলায় যে জাতীয়ভাবের প্রকাশ তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সভায় মনোমহন বসু বলেন, যবন শাসনে হিন্দু স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বন বিলুপ্ত হয়েছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু বলেন, মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম বিনাশের যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে কৃতকার্য হয় নি।[৬০]

কিন্তু তবুও ভারতবর্ষে মুসলিমদের অস্তিত্ব বাস্তবে অস্বীকার করা যাচ্ছিলো না—এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে ভূদেব ১৮৬৭ সালে একটা সমাধান দিলেন : ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপনবক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান। এক মাতার-ই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ—নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।[৬১,৬২] অদ্যাবধি ভূদেব সমাধানের মধ্যেই ভারতের প্রায় সব ফ্রন্টের হিন্দু নেতৃত্ব ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন।

১৯০১ থেকে ১৯০৬ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক রাজনৈতিক রচনাবলিতে স্পষ্ট পুনরুত্থানবাদী অভিমত প্রকাশ পেল, ১৮৮২-৮৫তেও এটা ঘটেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে প্রাচ্য সভ্যতার পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বললেন, রাষ্ট্র

নয়, ঐতিহ্যবাহী সমাজই ভারতীয় জীবনের প্রকৃত কেন্দ্র বলে অভিহিত হল। হিন্দু অতীতকে কাব্যময় ভাষায় জাগিয়ে তোলা হল, বাল্যবিবাহকে, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণকে হিন্দু সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অযৌক্তিক বলা হল না। জাতি বর্ণ, এমনকি সতীদাহর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যথার্থ্য দেখতে পেলেন। ১৯০৪-এয মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ একটি প্রোগ্রামের রূপ পেতে লাগল। মেলা, বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সমাজের পুনর্জীবনের জন্য তিনি বললেন। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজই ভারতীয় ঐক্যকে বিধৃত করবে।[৬৩]

বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র—সোজাসুজি বক্তব্য হলো ভারত হিন্দুদের, মুসলমানরা বিদেশি। এরা বিদ্বেষ ছড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

সিরাজ হত্যার দু'শো বৎসর পর সমস্ত কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করে পথিকৃৎ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ : ক. পলাশীর রক্তাক্ত যুদ্ধের ময়দান পিছনে ফেলে সূর্য যখন গঙ্গায় অস্ত গেল সেই সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটল এবং আধুনিক যুগের শুরু হলো; খ. পলাশী আদতেই জন্ম দিল সত্যিকারের এক রেনেসাঁ যা ছিল কনস্তান্তিনোপল পতনের পর ইউরোপীয় রেনেসাঁর চেয়ে ব্যাপক, গভীর এবং আরো বেশি বৈপ্লবিক; গ. দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন বাঙালিদের একটি 'জাতি'তে পরিণত করেছে। জুন, ১৭৫৭-র কারণেই আমরা ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় প্রবেশ করলাম মহান এক নতুন বিশ্বে।[৬৪]

১০

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুও অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িক হবে। সংখ্যাগুরুর মানসিকতা সর্বদাই নিশ্চিত রূপে নির্ধারণ করবে সংখ্যাগুরু মানসিকতাকে এবং সংখ্যাগুরুর অসহিষ্ণুতাই সংখ্যালঘুকে অসহিষ্ণু করবে।[৬৫]

এমনভাবেও দেখা যায়, এটা হলো আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মরক্ষামূলক সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু আত্মরক্ষামূলক হলে তা সব ক্ষেত্রে নিবীর্য এবং নিতান্তই প্রতিবন্ধী রূপে প্রকাশ পাবে তা নাও হতে পারে।

আমাদের এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হলো ঔপনিবেশিক আমলে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার তত্ত্বটি খতিয়ে দেখা। এবং এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ যথাযথভাবে অনুধাবন করা। আগেও বলেছি তবু বিষয়টি আর একটু তলিয়ে দেখা দরকার। যদিও সারসংক্ষেপেরও কম ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মোটা দাগে বলতে গেলে তিতুমীর জমিদার ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে শহীদ হন। ঐতিহাসিকরা যদি এখনো বায়না ধরে এই যুদ্ধটি ছিল কালের বার্তা উপেক্ষা করে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার একটি দৃষ্টান্ত, তাহলে বলতেই হবে ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চার কাঠামোটি যথেষ্ট মজবুত রয়েছে। কেউ

কেউ দু'কূল রক্ষা করেন। এক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার কৌশলী যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। সরাসরি এ প্রশ্নটার মীমাংসা দরকার। ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধ, যা চললো প্রায় শত বছর ধরে এবং যে পর্বে ব্রিটিশ বিরোধী এই সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বা বিরোধিতা করে আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে নি, সেই প্রক্রিয়া প্রগতিশীল ছিল না একটি প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতা।

১৭৬০ সালে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দিয়ে জনগণের পর্যায়ে ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের শুরু। এরপর রংপুর কৃষক বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ, যশোর-খুলনা প্রজা বিদ্রোহ, তুষখালীর কৃষক বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ইত্যাদি।

সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সীমানা ছিল অনেক বড়। ১৮০২ সালে দিল্লীতে শাহ্ আব্দুল আজিজ ঘোষণা দিলেন 'দারুল হার্ব'—ভারত এখন শত্রু অধিকৃত দেশ। অতএব সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ শাসন উৎখাত করতে হবে। তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া স্থাপিত হল। সৈয়দ আহমেদ শহীদ হলেন ১৮৩১ সালে। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা আসেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। বারাসাতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে জমিদার ও রাজশক্তির পরাজয়। এবং শেষে ব্রিটিশ সৈন্য ১৮৩১ সালে সরাসরি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। তিতুমীরের লাশ পাওয়া যায় নি।

গোলাম মাসুমের সমাধি গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হয়। আর 'ভারতপথিক' রামমোহন রায়ের সমাধিস্তম্ভ তৈরি হয় ইংলন্ডের ব্রিস্টলে। আরো পরে ১৮৫৭ সালের অগ্নিমুহূর্তে বারাসতের ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাদরদী জেলাশাসক ইডেন প্রথমে যে কাজটা করেন তা হল তিতুমীরের গ্রামের আর পরিবারের উপর খবর নেওয়া আর নজরদারি রাখা, কারণ তিতুমীরের ছেলেকে লোকে শাহজাদা বলছে, তার নামে নানা গুজব রটছে। ঐতিহাসিকরা ভুল করেন কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে চরম সঙ্কটের সময় কে তার সম্ভাব্য শত্রু বা মিত্র তাকে চিনতে রাষ্ট্রক্ষমতা ভুল করে নি।[৬৬]

নবাবী আমলের সঙ্গে লাটের শাসনের ফারাক অনেক। এই তফাৎকে বুঝতে, ধরতে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে লোকদের কেটে গেছে গত দুশ বা তারও চেয়ে বেশি সময়ের ইতিহাস। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির হদ্দ ছাড়িয়ে লোকায়ত রাজনীতির ডাঙায় পা দিয়ে দিলে বোঝা যায় যে সমূহে আর সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার যুগ্ম সম্পর্কে টান দিয়েছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চাপ। ...

স্বদেশে যারা উদারনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের কথা বলতেন উপনিবেশে তাদের তত্ত্ব জন্ম দেয় কর্তৃত্ববাদ ও আমলাতান্ত্রিক বিধিবদ্ধ শাসনের।

এই দ্বিচারিতার অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে দেশজ বুদ্ধিজীবীদের দাবি। বার বার 'সভ্যতা' ও 'প্রগতির' দোহাই দিয়ে, পূর্বতন শাসনতন্ত্র অপেক্ষা

নিজেদের শাসনতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করে ইংরাজ শাসকরা যে ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন, ঊনিশ শতকে তার জের তুলে, তার মধ্য থেকে সংবিধান ও নাগরিকত্বের দাবি জানাবার পথ খুঁজেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা, মুখর হয়ে উঠেছিলেন ইংরাজ শাসকদের 'অ-ইংরাজ সুলভ আচরণে'।[৬৭]

সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভীর মৃত্যুর পর বাংলা পর্যন্ত তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়ার বিস্তৃতি ঘটে। ব্রিটিশ সরকার নাজেহাল। হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী ১৮৫০-১৮৫৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ষোল বার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়। ১৮৬৩ পর্যন্ত এর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ মোকাবেলা করতে ইংরেজদের প্রয়োজন পড়ে ৬০ হাজার নিয়মিত সৈন্যের এক বাহিনীর। ১৮৬৩ সালে আম্বালায় ব্রিটিশ বিপর্যয়ের পর তারা কতগুলি বিচারের প্রহসন করে। শত শত মুসলিম মুজাহিদকে ফাঁসি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো বহু সংখ্যক মুজাহিদদের। যুদ্ধের এই দীর্ঘ সময়কালে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধিতা বা সাম্প্রদায়িক হানাহানি হয়েছে এর কোনো প্রমাণ নেই।

ফরায়েজি আন্দোলনও ছিল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন থেকে উদ্ভূত। হাজী শরিয়তুল্লাহ নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফরায়েজি শব্দের অর্থ হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। এই সময় মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র দেখা যায় ইসলামী আন্দোলন। এসবের প্রবক্তাগণ ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ফরায়েজি আন্দোলন দেশি-বিদেশি অত্যাচারী শোষককূলের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের আহ্বান জানান। হিন্দু জমিদার ও কোম্পানির শোষণের ফলে সর্বস্ব হারানো প্রজারা সহজেই ফরায়েজি আন্দোলনে শরিক হন। বাংলায় নেতৃত্বহারা নির্যাতিত মুসলমানরা তথাকথিত এগিয়ে চলার অন্যতম বাহন ইংরেজি শিক্ষার এলাকার বাইরে অবস্থান করেও নিজেদের মধ্য থেকেই নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটায়। ১৮৬৩ থেকে ৭০ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নির্মমভাবে এই জেহাদি আন্দোলনকে দমন করে। এই সময়কালে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার জোয়ারও এই দীর্ঘ মেয়াদি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা তো ছিলই কিন্তু ঢাকার জমিদার শ্রেণী রক্ষণশীল মুসলমানদের সহযোগিতায় ইংরেজ সরকার ও তার পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে হাজী শরিয়তুল্লাহকে ১৮৩১ সালে রামনগর ও নয়াবাড়ি থেকে বহিষ্কার করে। হাজী শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কেঁপে উঠে জমিদার ও ইংরেজরা। তিতুমীর ও শরিয়তুল্লাহ এক ধরনের শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয় যুদ্ধের সমন্বয়মূলক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটান। তাঁরা বুঝেই গিয়েছিলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তাঁরা পিছ পা হন নি, যতো ত্রুটিই থাক সাহসের এই গৌরবগাথা তাদের প্রাপ্য।

হিন্দু জমিদারদের সঙ্গেই তো সংঘর্ষ হবে এবং হলেই তা যদি সাম্প্রদায়িক হয় তবে বলতে হবে ঐতিহাসিকরা তখন আসলে নিজেরাই একটা সাম্প্রদায়িক

অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কেননা, সমস্ত প্রেক্ষাপটের মূলে আছে বিদেশি ইংরেজ শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। যারা সেই সময়কালে ইংরেজ আশ্রয়ে পুষ্ট তাদের উত্তর পুরুষদের একটা দায় থেকে যায় ইংরেজ আনুগত্যকে যেন-তেন প্রকারে একটা প্রগতিশীল চরিত্র দান করা। ইতিহাস চর্চার এই ডিসিপ্লিনটা ভেঙ্গে দিতে হবে। পুরনো গবেষণা এবং সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখায় (যথা রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস রচনা) ইসলাম ছাড়া ভারতবর্ষে আর যত জাতি-ধর্মের মানুষ এসেছেন, তাঁরা সবাই এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতায় মিশে গেছেন। ভারতীয় ইসলাম যে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান ঐতিহ্য থেকে যথেষ্ট আলাদা, সে প্রসঙ্গটি এঁরা সযত্নে এড়িয়ে যান। এছাড়া মধ্যযুগীয় মুসলমান রাজাদের প্রসঙ্গ নিয়ে শোষণের যে-ছবিটি এঁরা আঁকেন তা আদ্যিকালের গবেষণা-রসদ নির্ভর। দুটি সম্প্রদায়ের পৃথক সত্তার ছবিটি বর্তমানে জোরদার হয়েছে পোস্ট-মডার্ন চিন্তাধারায়।[৬৮]

১৮৪০ সালে শরিয়তুল্লাহর মৃত্যু হয়। এর পর অল্প বয়সেই তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিয়া দু'জন জমিদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত জমিদারদের কোণঠাসা করে ফেললে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকবৃন্দ, জমিদার ও নীলকররা একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে ধ্বংস করতে যাবতীয় ব্যবস্থা করে। দুদু মিয়া ছিলেন একজন অসামান্য বিচক্ষণ ব্যক্তি। শহীদ তিতুমীরের অভিজ্ঞতা খেয়ালে রেখে তিনি সুকৌশলে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। গ্রেফতার ও কারাবরণ প্রক্রিয়ায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করনে।

কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন নয়া মিয়া। নবীনচন্দ্র সেনের মন্তব্য : এই সময় কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়া মিয়ার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে তিনি নিজের একটি আলাদা রাজ্য গঠন করেন। দেখা যাচ্ছে, শত বছর ধরে জমিদার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি বেশ গভীরভাবে জড়িত ছিল।

বঙ্গভঙ্গ রদ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতার খোঁজ পাওয়া যায়। ১৮৪৭'র আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীনে ফরায়েজিরা জুমা ও ঈদের নামাজ পড়ত না। আসলে শত্রু অধিকৃত দেশের ধারণা বজায় ছিল।[৬৯]

ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে নতুন ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে তাঁরা কৃষক-কারিগর-উপজাতি-বিদ্রোহগুলি সমর্থন করেন নি। এমনকি তাঁরা ফরায়েজি-ওয়াহাবি আন্দোলনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেন নি। ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহেও

তাঁরা দূরত্ব বজায় রেখে বিরোধিতাই করেন। অবশ্য তার কারণও ছিল। ব্রিটিশ শাসনের উপর নির্ভরশীল এই শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনকে মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের তুলনায় একটি অগ্রসর অবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করেন। তাই শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে তাঁরা বিদ্রোহগুলির প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজসংস্কারের মাধ্যমেই জাতীয় চেতনার ধারাটিকে উজ্জীবিত করেন। সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে দুটো ধারা প্রবাহিত হয়, আর তাদের শ্রেণীগত অবস্থানও ছিল পৃথক। এই দুটো ধারার অর্থাৎ কৃষক কারিগর-উপজাতি-নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের আর ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত সমাজসংস্কারের আন্দোলনের ক্ষণিক মিলন লক্ষ করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলচাষীদের বিদ্রোহের সময়...এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার ফলে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কোন ঝুঁকি নিতে হয় নি।[৭০]

পরবর্তীকালে চরমপন্থী পর্বের আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি 'জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী' তাঁদেরই বলছি যাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং বিদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংস করে জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য প্রয়াসী হন।...এদের মধ্যে বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে, প্রমথনাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সূর্য সেন, ভগৎ সিং ও সুভাষচন্দ্র বসু যে ধারাটির প্রতিনিধিত্ব করেন তাকেই জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী ধারা হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়।[৭১]

তিনি ফরায়েজি আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরো বলেন, যেভাবে ফরাজি মতবাদ রূপায়িত করার চেষ্টা হয় তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফরাজিরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে। হিন্দুদের ও সাবেকি মুসলমানদের ধারণা হয় যে, ফরাজিরা ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তাই।

ফরাজি মতবাদ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রসারিত হবার ফলে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা হয়। জমিদার ও নীলকরদের পক্ষে অবাধে কৃষকদের নিপীড়ন করা কষ্টকর হয়, তেমনি ফরাজি প্রভাবিত অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। স্বভাবতই তাদের সঙ্গে ফরাজিদের বিরোধ ছিল অনিবার্য।

ফরাজি আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হয় সেইসব অঞ্চলেই যেখানে অগণিত মুসলমান কৃষকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিল হিন্দু জমিদারেরা। লক্ষণীয় এই যে, কোন অর্থবান মুসলমান ফরাজি মতবাদ গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া অনেক গোঁড়া মুসলমানও ফরাজিদের দ্বারা প্রচারিত আচরণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন নি। আর যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে ফরাজি আন্দোলন পরিচালিত হয় তার সঙ্গে অর্থবান ও শহরবাসী মুসলমানদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকায় তাঁরা

ফরাজিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আকৃষ্ট হন নি। সুতরাং ফরাজি মতবাদ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেরই উদ্বুদ্ধ করে এবং পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ মুসলিম সমাজে প্রসারিত হয়।[৭২] আমরা জানি ফরায়েজি এবং তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া আন্দোলন সম্পর্কে অমলেন্দু দে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ওয়াহাবিদের সংগ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৮০০ থেকে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল তাতে সমাজের বিভিন্ন শক্তিগুলোর একটা সাময়িক বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা চলল। সমাজের মধ্যে একটা আর্তবাহী অসন্তোষ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে থাকল। এর পর ভারতের জনসাধারণের এই অসন্তোষকে সংগঠিত করতে কৃতসংকল্প হলেন ভারতীয় ওয়াহাবিগণ। ওয়াহাবিগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন এক অধ্যায় সংযোজন করলেন। ওয়াহাবিদের লড়াই ভারতের আদিতম এবং সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইগুলোর মধ্যে অন্যতম। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় ওয়াহাবিদের ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ঐতিহাসিক রচনাতেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী এই মহান সংগ্রামকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নি।[৭৩]

কিন্তু লক্ষণীয় অমলেন্দু দে, 'জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী' বলে যাদের মনে করেছেন তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাদের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তারা 'জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী' হিসেবে ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে বিখ্যাত হতে পারলেন। কিন্তু তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবিদের অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ বিরোধী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রায় একশ' বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া ফরায়েজি আন্দোলনের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা যথাযথ মূল্যায়ন করতে অদ্যাবধি কোন ভূমিকা পালন করেন নি।

তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া ও ফরায়েজিদের সংগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১৮৫৭-৫৮ সালের এই মহান মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো। ব্রিটিশদের ভয়াবহ অত্যাচার নেমে এলো হিন্দু মুসলমান সকলের ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ করে কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন। তাদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই এবং নেতৃত্বও এসেছে তাদের কাছ থেকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে বিদ্রোহের সময় ও বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে শুধু দিল্লীতেই অন্তত ২৭,০০০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। পরেও বহু দিন ধরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের দেখত গভীর সন্দেহের চোখে।[৭৪]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন সময়ে বিদ্রোহের নেতারা প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের বিশ্বাস করত না। কয়েক বছর আগের একটি রচনায় রজতকান্ত রায় দেখিয়েছেন : পার্শি এবং বাঙালিরা শ্বেতাঙ্গ বা খ্রিস্টান ছিল না, তথাপি বিদ্রোহীরা তাদের উপেক্ষা করতে পারেনি এ জন্য যে, দিল্লির বাইরে থেকে তারা ইংরেজ শিবিরে মদ্যাদি সরবরাহ করত। নানাসাহেব এই মর্মে আদেশ জারি করেছিলেন যে, 'শহরের বাবুদের এবং ইংরেজি লিখতে পড়তে পারে এমন লোকেদের ডান হাত এবং নাক কেটে দেওয়া হোক।' কিন্তু সময়মত ব্রিটিশ বাহিনী এসে পড়ায় তারা রক্ষা পেয়েছিল। গভীরভাবে জনমানসে এই ধারণা স্থান পেয়েছিল যে, যে-সমস্ত দেশীয় লোক ইংরেজদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল তাদের খ্রিস্টান ও পারিহা বলে বর্জন করা হয়।[৭৫]

কেন বখৎ খাঁ ক্রোধে ফেটে পড়েছিল যখন রিসলার সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের জনৈক কেরানি বেরিলির বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাজ করার জন্য হাজার টাকার চাকরি নিতে অস্বীকার করে? "নমকহারাম! বেইমান! হাজার রূপেয়া তংখা ভী কবুল নহী করতে?" "আংরেজ আউর বঙালি সব এক হ্যায়, তুমকো নহী মালুম হ্যায়, কি হম্ অভি তুম্হারা গর্দন কাটনে কা হুকুম দে সক্তা হ্যায়...খুব মালুম হ্যায় কী আংরেজ কে সাথ তুম্হারী সাজিস্ হ্যায়!"—ইংরেজ এবং বাঙালি সব এক। তুমি জান না যে, আমি এখনই তোমার গর্দানটা কেটে ফেলার হুকুম দিতে পারি... বেশ ভালভাবেই জানি যে, ইংরেজের সঙ্গে তোমার যোগসাজস্ আছে।[৭৬] মোটাদাগে একথা কথা বলা যাবে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। একেবারেই ব্যতিক্রম ছিল না এটা বলা সঙ্গত হবে না।

সরাসরি যুদ্ধে ভারতীয়রা হেরে গেল বটে কিন্তু তার থেকে বড়ো হার হলো এদেশের মানুষ ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য একশো বছর ধরে যে একটি মাত্র রাস্তা অর্থাৎ বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথ শত নির্যাতন উপেক্ষা করে বহাল রাখতে পেরেছিল তা বরবাদ হয়ে গেল। এর অর্থ এটা নয় যে বিদ্রোহ-সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা হলো তা হচ্ছে ইংরেজদের দালাল ও সহযোগী-রাই এবার ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে কিভাবে সুযোগ-সুবিধা নেয়া যায় ও সে জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার আন্দোলন চালানো যায় সেই লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অর্থাৎ তোয়াজ-তদ্বিরের নতুন মাধ্যমের সূচনা করলেন। কয়েক দশক ধরে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলো। সে ধারা এক অর্থে বর্তমান কাল অবধিও চালু আছে।[৭৭]

শুরু হল মুসলমানদের তথাকথিত এগিয়ে চলার কাফেলায় যোগদান পর্ব।

মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরি করবেন—ওকালতি, মোক্তারি ধরনের পেশাতেও যোগ দেবেন। মোট কথা ইংরেজদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বিপরীতে দেখা গেল স্যার সৈয়দ আহমদকে। বাংলায় প্রথম যে তিনজন ব্যক্তি সমাজের অগ্রগতি অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন এরা হলেন, নবাব আমির আলী, আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী। উত্তর প্রদেশের মৌলানা মুহম্মদ কাশিম ননৌতভীর পরিচালনায় দেওবন্দে শোভন ইসলাম চর্চা শুরু হলো। এই উভয় গ্রুপই ওয়াহাবি-ফরাজিদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাগ পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের সহযোগিতায় তাঁদের নির্ধারিত পথে অগ্রসর হন।

তিনটি কেন্দ্র হলো : আলিগড়, কলকাতা ও দেওবন্দ।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখলে চলবে : বাংলার মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ইংরেজি শিক্ষা ও চাকরির প্রশ্নে হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। ইংরেজদের প্রশ্রয়ের আলোকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার একটা চেহারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সুযোগ এই নিয়েই বিরোধ এবং ক্রমাগত তা উত্তপ্ত হতে থেকেছে।

শিক্ষা নিয়ে যে তিক্ত বিতর্ক এবং বলতে গেলে এখান থেকেই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্রতার মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রামে জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান—জমিদার বিরোধী লড়াইয়ে কৃষকরা ভূমিকা নিতে গেলে কলকাতায় থাকা জমিদাররা আওয়াজ তোলে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও দাঙ্গা শুরু করেছে। আসলে ১৯০৫ ও স্বদেশী আন্দোলন পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যের ঐতিহাসিক সূত্রপাত ও বিস্তারের লক্ষণ দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-গঞ্জ থেকে যারা 'এগিয়ে যেতে' কলকাতায় যাচ্ছিলেন তারা দু' ধরনের হিন্দু-মুসলমান বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের কথা কেউ সম্ভবত ঘুণাক্ষরেও ভেবে দেখেননি। ১৯৩৭ এর নির্বাচনের পরও মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমির কথা ভাবে নি। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মুসলমানরা কংগ্রেসকে হিন্দু স্বার্থের সংগঠন মনে করছে।

৪০'র দশক পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে রক্ষণশীল মুসলিম নেতারা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আচরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে থাকেন। তাছাড়া মুসলিম প্রজাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল—অত্যন্ত অপমানজনক ও তিক্ত, ফলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত আবেদন বিফলে যায় নি—একটা অংশের মধ্যে এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৪০-এর আগে বাঙালি মুসলমানরা সম্ভবত বিশ্বাসই করতেন না—একহাজার মাইল দূরের মুসলিম প্রধান একটি বেশ বড় অঞ্চলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভবিষ্যতে একটা মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করবেন। ভারতের মুসলমানরা এক জটিল

রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। অস্তিত্ব সংকটের উদ্ভব ঘটে ঔপনিবেশিক কূটকৌশল ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির কংগ্রেসে দৃঢ় অবস্থান এবং কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমান ও অন্যান্য অ-হিন্দুদের প্রতি ঐতিহাসিক উদাসীনতা ও অবজ্ঞার ফলে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে বাঙলা বাদে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ফলাফল সুবিধাজনক ছিল না। অথচ ১৯৪৬-এ দেখা গেলো এমন কি ভারতের দক্ষিণের প্রদেশগুলিতেও মুসলিম আসনগুলিতে মুসলিম লীগের বিরাট বিজয় হলো। অর্থাৎ কংগ্রেসকে অবিশ্বাস, কিন্তু ভারত ভাগ হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা মুসলমানদের অবস্থা যে আগত অনেক অনেক দশক পর্যন্ত চরম হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে সেটা তারা বুঝেও রায়টা দিল মুসলিম লীগের পক্ষে।

মুসলমানদের সমস্যাকে আলাদাভাবে কেন গুরুত্ব দিতে হবে সে প্রসঙ্গে কংগ্রেস সময়সময় বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এসেছে। তাৎপর্যপূর্ণ কোন গুরুত্বই কংগ্রেস দিতে রাজি হয় নি।

সুতরাং বাঙালি মুসলমানদের সমস্যা তখন ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান ও ভারতীয় মুসলমান। বিরাট এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এক জাতিতত্ত্ব'র প্রতিক্রিয়া হিসাবে দ্বি-জাতিতত্ত্বে'র যে উদ্ভব-বিষয়টিকে সেভাবে ভাবতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবিত কংগ্রেসী ঐতিহাসিকরা না দেখার ভান করে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে চলেছেন একজন বিখ্যাত বিতাড়িত কংগ্রেস নেতা জিন্নাহর উপর—ভাবখানা একজন ব্যক্তি জিন্নাহ ভারত ভাগের জন্য দায়ী। অবশ্য গত দুই-তিন দশক ধরে ভারতের ঐতিহাসিকদের অনেক মধ্যে আগের চিন্তা বর্জনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি মুসলমানরা ৩০-৪০ দশকে এটা বুঝে গিয়েছিল বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু শত শত বছর ধরে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে অগ্রসরমান ছিল তাকে খতম করা হয়েছে। বাঙালি হিন্দুরা আর শুধু মাত্র বাঙালি হিন্দু নেই তারা ভারতীয় হিন্দুর স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। হঠাৎ করে যেন বাঙালি মুসলমানরা তাদের কাছে এক বিদেশি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো—যা ছিল সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ও চরম বেদনাদায়ক এক মর্মান্তিক ঘটনা।

যখন একই ভাষাভাষী হলেও ভারতের অনেকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালি হিন্দুরা 'ভারতীয় হিন্দু এক জাতি'-তত্ত্বের মধ্যে বিলীন হতে থাকে তখন বাঙালি মুসলমানদের উপলব্ধির জগৎ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। হিন্দু মুসলমান দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় শত শত বছর একসঙ্গে বসবাস করার পর যখন ধর্মীয় পরিচয়কে (শ্রেণি সমস্যা ও সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে) প্রাধান্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের উস্কানির মুখে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার ভূমিকায় যেতে থাকে

তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘৃণার পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। সাম্প্রদায়িকতা নিজেই তখন একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা।

পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হল। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় নোয়াখালিসহ দু' একটি স্থান ছাড়া কোন বড় ধরনের দাঙ্গা হয় নি। এখনো দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ বিলুপ্ত না হলেও দাঙ্গা করবে, হত্যা করবে তা বোধ হয় তারা ভাবে না। তবে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি নাজুক। এই বাংলাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছুই হয়েছে। আমার ধারণা কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলরা যদি বাংলাদেশে একটা অর্থহীন শক্তিতে পরিণত না হতো তবে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার এক অদৃশ্য চাপ দৃশ্যমান হতে পারার পরিস্থিতিকে ঠেকিয়ে দিতে পারত। বাংলাদেশে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগত সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক শক্তি কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারে ভারতের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তির ভূমিকাই শেষ ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িয়ে ছিল তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে। ঠিক তেমনি বাংলার কৃষক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মুসলমানদের অস্তিত্ব যায় যায় হিন্দু জমিদারদের কারণে। এজন্য দেখা যায় ইংরেজরা ভারত দখলের পর ইংরেজের বিরুদ্ধে শত বছরের সশস্ত্র যুদ্ধে মুসলমান বাঙালিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকছে। একদিকে শ্রেণি, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা। এবং এর সমাধান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া সম্ভব নয়, এ বিষয়টি তাদের বোধগম্য হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্বে সব মুসলমানদের স্বার্থ এক—এই আওয়াজে গরিব মুসলমানরা বড়লোক মুসলমানদের সঙ্গে একপ্রকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রকৃত অর্থে শ্রেণি, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে নেতাদের প্রধান অংশ আপোষের পথেই থাকলেন।

পূর্ববঙ্গে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থনেই হাজার মাইলের ব্যবধান নিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হলো। গরিব মুসলমানরা ক্ষমতার প্রশ্নে নেতৃত্বের কথা ভাবেন নি। ধনিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তরা সে সুযোগ তাদের দেয়নি। ফলে এবার দিতে হলো রক্ত, সম্পদ, ইজ্জত ও জীবন। বাংলাদেশ কায়েম হলো।

আজকের দিনে ভাষা বা ধর্মীয়ভিত্তিতে গঠিত জাতিরাষ্ট্র নিপীড়িত মানুষের কোন মুক্তি দিতে পারে না। অভিজ্ঞতা বলে দিচ্ছে—নিজেদের অবস্থা বদলে নিতে হলে শ্রেণি, সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই। শরীয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের নামে গরিব মুসলমানদের আবারও শ্রেণি সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টার ত্রুটি নেই। অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রের নামে চলছে জঘন্য শক্তি প্রয়োগ

ও ভাঁওতা।

বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয় সংকট একটি আরোপিত বিষয় মাত্র। জন্মভূমি, ভাষা, উৎপাদন-অর্থনীতি, ইহলৌকিকতা, দেহবাদিতা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, রাজনীতি, শ্রেণী সমস্যা ইত্যাদি নিয়েই তার আত্মপরিচয়। সংস্কৃতির ফরমাইশি কাঠামো দলীয় কারখানায় তৈরি করা যায় না। বাঙালি মুসলমান বলে কোন একক স্বতন্ত্র সত্তা কখনো ছিল না, আজও নেই। বরং এই ধরনের ধারণা সৃষ্টি ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার পক্ষেই যাবে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না রেখে বিচ্ছিন্নভাবে এর যে কোন মূল্যায়ন আমাদের প্রতারিত করবে।

গ্রন্থনির্দেশ

১. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, পৃ. ২৫, অবসর, ঢাকা
২. তপন রায় চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২০০৯, পৃ. ১৯৪, আনন্দ, কলকাতা
৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ১৯৯৫, পৃ. ৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৪. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ১৯৯৯, পৃ. ৩১, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা
৫. আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, ২০০১, পৃ. ৪২, অনন্যা, ঢাকা
৬. তরফদার, ঐ, পৃ. ৪
৭. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ১৯৯৮, পৃ. ১৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
৮. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ১৬
৯. কাজী রফিকুল হক, সংকলন ও সম্পাদনা, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু* শব্দের অভিধান, ২০০৪, পৃ. ৬,৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১০. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৯৬-৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১১. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, ২০০৯, পৃ. ১২৭, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
১২. ঐ, পৃ. ১২৮
১৩. ঐ, পৃ. ১৩৮
১৪. ঐ, পৃ. ২৪৩
১৫. Carter Vaughn Findley, *The Turks in the World History*, 2005, p. 97, Oxford University Press, New York.
১৬. এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ, *ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ১২০৬-১২৯০*, অনুবাদ ও ভূমিকা-অনিরুদ্ধ রায়, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৭, পৃ. ৩২, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
১৭. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Forntier (1204-1760)*, 2002, pp. 23-28, Oxford University Press, New Delhi.
১৮. হবিবুল্লাহ, ঐ, পৃ. ৩২
১৯. ঐ, পৃ. ৭৯
২০. করিম, ১৯৯৯, পৃ. ৮০
২১. হবিবুল্লাহ, ঐ, পৃ. ৩৩
২২. করিম, ১৯৯৯, পৃ. ৯৪
২৩. করিম, ১৯৯৪, পৃ. ২১২

২৪. Richard M. Eaton, ঐ, p. 28
২৫. হবিবুল্লাহ, ঐ, পৃ. ৮৬
২৬. করিম, ঐ, পৃ. ২১৪-১৫
২৭. মাহমুদ মামদানি, *ভাল মুসলমান মন্দ মুসলমান*, ২০০৬, পৃ. ১১৫, ছাতিম বুকস, কলকাতা
২৮. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৪৯৪-৫০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২৭. ডক্টর এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩০. ঐ
৩১. আহমদ শরীফ, *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, ২০০৩, পৃ. ১৩-১৪,১৬,২৬, সময়, ঢাকা
৩২. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ৭২-৭৩
৩৩. করিম, ঐ, পৃ. ১৮৬-৮৭
৩৪. রহিম, ঐ, পৃ. ৮৬
৩৫. রহিম, ঐ, পৃ. ১৫০
৩৬. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ২৯,৬৯
৩৭. *বাংলা বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫০, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
৩৮. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ৮৩
৩৯. মুরশিদ, ঐ, পৃ. ৬৫
৪০. তরফদার, ১৯৯৫, পৃ. ৬৩-৬৪
৪১. ঐ, পৃ. ৬২-৬৩
৪২. করিম, ঐ, পৃ. ১৭৩
৪৩. ঐ, পৃ. ১৮৪-৮৫
৪৪. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৮৮, পৃ. ৫৮, কলিকাতা
৪৫. ঐ, পৃ. ২০১
৪৬. করিম, ঐ, পৃ. ২৭৫
৪৭. ঐ, পৃ. ৩০৩
৪৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮*, ২০০১, পৃ. ২০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৪৯. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ১৯৯৫, পৃ. ১০-১১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৫০. তরফদার, ২০০১, পৃ. ১৬৩, ১৯৮, ১৯৯
৫১. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন*, ১৯৯৮, পৃ. ১৩, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা
৫২. সুশীল চৌধুরী, *পলাশীর অজানা কাহিনী*, ২০০৪, পৃ. ৬২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৫৩. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, পৃ. ৪৬, অবসর, ঢাকা
৫৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার কথাচিত্র*, ১৯৭৯, পৃ. ৩৫৭-৫৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫৫. দেবেশ রায়, *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, ১৯৯০, পৃ. ৭১-৭২, প্যাপিরাস, কলকাতা
৫৬. গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য*, বৈশাখ-১৩৯৯, পৃ. ১৮৭, ১৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৫৭. অমলেন্দু দে, সম্পাদনা, অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর, *ভারতের ইতিহাস—নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫, পৃ. ১২০, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৫৮. মুশিরুল হাসান, দি মিথ অব ইউনিটি, কলোনিয়াল অ্যান্ড ন্যাশনাল ন্যারেটিভস, ডেভিড লাডেন সম্পাদিত *মেকিং ইন্ডিয়া হিন্দু* গ্রন্থে সংকলিত, ২০০৭, পৃ. ১৮৬, ২০৮, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী
৫৯. রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্র, *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা*, ১৯৭৬, পৃ. ৭১, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা
৬০. কমলকুমার ঘটক, *হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ও রাজনারায়ণ বসু*, সম্পাদনা অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর, ভারতের ইতিহাস নির্বাচিত প্রবন্ধ, ২০০৫, পৃ ১৪২-৪, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৬১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, ২০০৯, পৃ. ১৬৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৬২. তপন রায় চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০৯, পৃ. ১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৬৩. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ*, ২০১০, পৃ. ১১৪-১৫, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
৬৪. যদুনাথ সরকার, *The History of Bengal,* vol. II, Dacca University, ১৯৭৬, পৃ ১৯৭-৯, ঢাকা
৬৫. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, *ভারতীয় মুসলমানদের সংকট*, পৌষ-১৪০৯, পৃ. ১১১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা
৬৬. গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান*, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৯, সুবর্ণরেখা, কলকাতা
৬৭. ভদ্র, ঐ, পৃ. ৩০২, ৩০৭
৬৮. রায় চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৬৪
৬৯. ড. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, *ফরায়েজি আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি*, সম্পাদনা ফাহমিদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ৪১-৫৭, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা
৭০. অমলেন্দু দে, *শ্রী অরবিন্দ ও ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন (১৮৭৬-১৯৪৭)*, ২০০৬, পৃ. ১০-১১, *রক্তকরবী*, কলকাতা
৭১. অমলেন্দু, ঐ, পৃ. ৮-৯
৭২. অমলেন্দু দে, *ফরায়েজি আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি*, সম্পাদনা ফাহমিদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ৪১-৫৭, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা পৃ ১০৯-১১০
৭৩. শান্তিময় রায়, *ফরায়েজি আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি*, সম্পাদনা ফাহমিদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ৪১-৫৭, বাংলাদেশ সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা পৃ ১০৯-১১০
৭৪. বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (অনুবাদ: ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়), ২০০০, পৃ. ২৯, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া
৭৫. রজতকান্তি রায়, *'শাহী হিন্দুস্তানী জেহাদ'-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ১৮৫৭*, সম্পাদনা, অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর, *ভারতের ইতিহাস—নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫, পৃ. ১৫৮, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা
৭৬. ঐ, পৃ. ১৭০-৭১
৭৭. নূর মোহাম্মদ, *পলাশী যুদ্ধের কারণ : ইতিহাসের পুনর্পাঠ*, ২০১৪, পৃ. ১৫৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
